জগদীশে চ রাজ্যেশে মাতৃভূমৌ তথাত্মনি।
নিধাতব্যং সদা সর্ব্বৈঃ শাশ্বতং প্রেম নির্ম্মলম্॥
Be true to your God,
true to your Emperor,
true to your Country,
and true to Yourselves.
Lord Hardinge.

JAYANTI PRESS.

দয়াবীর-জীমূতবাহন।—পৃঃ ১৪৫।
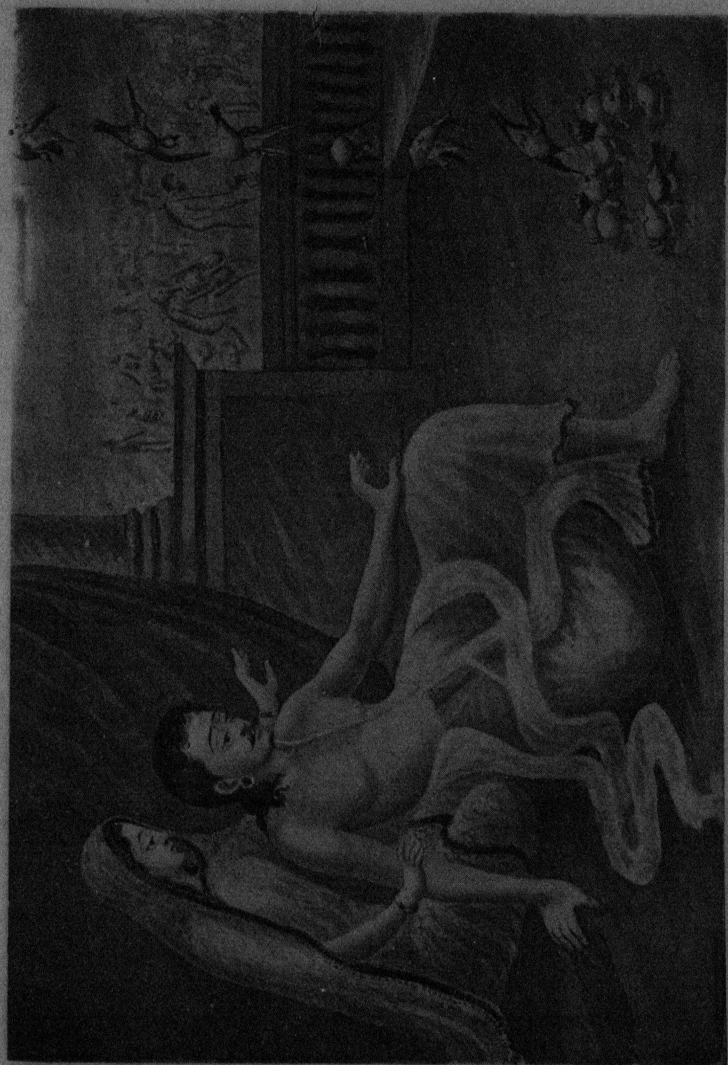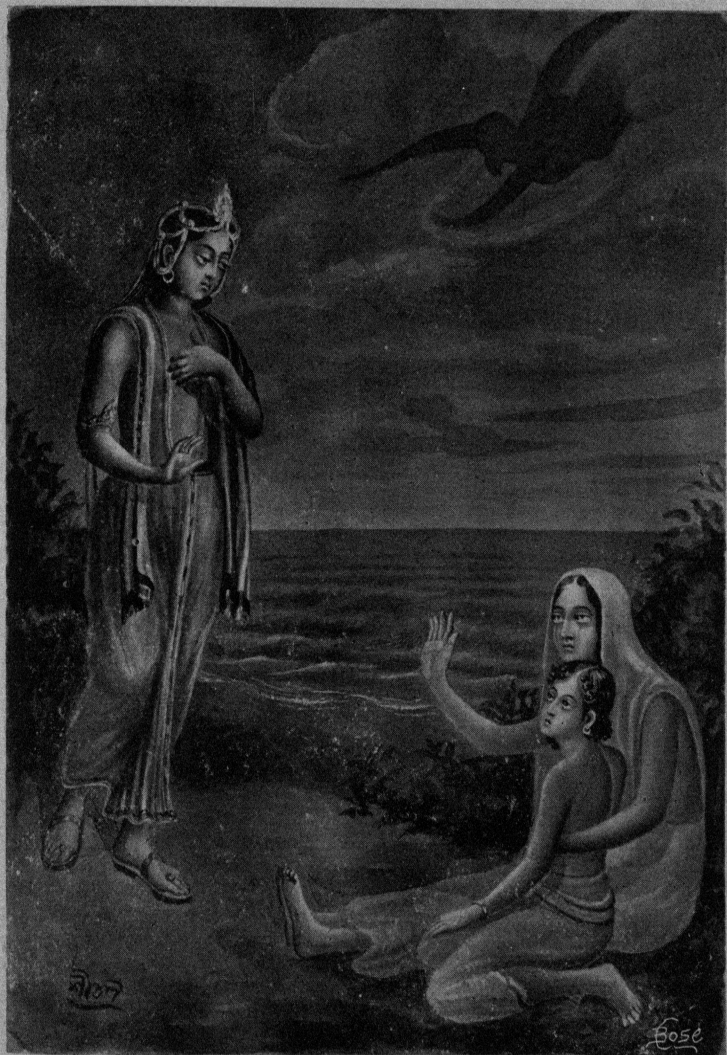
ভূমিকা।

শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক, সমঞ্জসভাবে এই ত্রিবিধ শিক্ষাই মানবের পূর্ণ শিক্ষা। পূর্ণ শিক্ষাই পূর্ণ মঙ্গলের নিদান। দেশীয় ছাত্রগণই দেশের উন্নতির আশা-ভরসা। এজন্য পবিত্র ছাত্রজীবনের সর্ব্বাঙ্গীণ উৎকর্ষসাধন এ গ্রন্থের মুখ্য উদ্দেশ্য। উদীয়মান ছাত্রগণের সুকুমার হৃদয়ে এই পূর্ণ শিক্ষার বীজ বপন, এবং অতি সাবধানে ও সন্তর্পণে সেই বীজের পরিপোষণ পূর্ব্বক, সাধনা দ্বারা তাহাকে ক্রমশঃ অঙ্কুরিত, পল্লবিত ও অমৃতময় বিশ্ব-কল্যাণ-ফলে পরিণত করাই শিক্ষাদান। এক কথায়, সাধুসঙ্গই সর্ব্ব শিক্ষার ও সর্ব্বোন্নতির মূলাধার। সাধুসঙ্গ বলিলে, কেবল কোনও ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গ বুঝায় না। বস্তুই হউক, ব্যক্তিই হউক, চেতন, অচেতন, দেশ, কাল, পাত্র হউক, যাহার সংস্রবে আসিলে, স্বভাব ধৃতপাপ হয়, অরুণোদয়ে নৈশ-তিমির-রাশির ন্যায় মনের মলিনতা দূরে যায়, হৃদয়ে অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বাচ্য সত্ত্বগুণের উদ্রেকে সর্ব্বভূতে প্রেমানন্দ উচ্ছলিত হয়, কৃপাপীয়ূষসাগর বিশ্বেশ্বরে ও লোকরক্ষক রাজ্যেশ্বরে ভক্তিরসে আত্মা দ্রবীভূত হয়, নিরন্তর ভূতদয়া ও পরোপকার ভিন্ন অন্য বিষয়ে মতি-গতি ধাবিত হয় না, প্রকৃতপক্ষে তাহাই সাধুসঙ্গ। পুণ্যশ্লোক, বিশ্বহিতৈষী, মহাত্মা সাধুগণের পুণ্যময়, পতিতপাবন

JAYANTI PRESS.

রত্নাকর-চরিত।—পৃঃ ১৫০।

চরিত্রকলাপ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন, আলাপন ও অনুকরণ চরিত্রশুদ্ধির উৎকৃষ্ট ও অমোঘ উপায়। এজন্য,—"মহাত্মনাং হি চরিতং শ্রোতব্যং সর্ব্বদা জনৈঃ"—সর্ব্বদা সংযত ভাবে পুণ্য-শ্লোক মহাজনগণের চরিত্র সকলের শ্রোতব্য, মহাভারতকর্ত্তার এই মহাবাক্য উদ্‌ঘোষিত।

শিক্ষাদানপদ্ধতি দ্বিবিধ। নীরস-কঠোর-প্রকৃতিক, বেত্রহস্ত গুরুমহাশয়ের প্রদত্ত শিক্ষা, এবং কোমল-মধুর-প্রকৃতিক, প্রাণা-রাম প্রেমিকের প্রেমার্দ্র-হৃদয়-নির্গলিত অমৃতায়মান উপদেশ। প্রথমটী শিষ্যের মস্তিষ্কমাত্র স্পর্শ করিয়া ক্ষান্ত হয়। দ্বিতীয়টা শ্রবণ-দ্বার দিয়া অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া, আত্মাকে গাঢ়রূপে অধি কার করে, শিষ্যের হৃদয়, মন, প্রাণ, আত্মা, সকলি তাহার প্রভায় উদ্ভাসিত হয়। এ উভয় প্রণালীর শিক্ষার উদ্দেশ্য অভিন্ন হইলেও, শেষোক্ত প্রণালী হৃদয়হারিণী ও আশুফলদায়িনী। দুই প্রখ্যাত আলঙ্কারিক এ বিষয়ে দুইটা অতি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন, যথা,—কাব্যপ্রকাশকার মম্মটাচার্য্য বলিতেছেন,—"কান্তাসম্মিত-তয়োপদেশযুজে"—সুকবিপ্রণীতা কাব্যময়ী পুণ্যশ্লোক-কথা, মধুর-ভাষিণী প্রিয়তমা পত্নীর ন্যায় সরল-সুন্দর-মধুর-কোমল-ভাবে পাঠকের মন-প্রাণ হরণ করে, সে সকল উপদেশ পাঠকহৃদয়ে চিরনিখাত হইয়া যায়। পক্ষান্তরে কঠোরপ্রকৃতিক নীতিশাস্ত্র কারের নীরস উপদেশের নৈতিক মূল্য যতই অধিক হউক, সে উপদেশ হৃদয়কে স্পর্শ করে না বলিয়া তাহা স্থায়ী ফলে পরিণত হয় না। এ জগতে কোনও সভ্যজাতির মধ্যেই ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশাসন বা নীতিশাস্ত্রের প্রবচন বিরলপ্রচার নহে।

"মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি।"

"সত্যং ব্রূয়াৎ"

ইত্যাকার গীতা, গাথা, প্রবচন, আপ্তবাক্য, বেদবাক্য প্রভৃতির সংখ্যা নাই। সে সকল দ্বারা যে মানবসমাজ উপকৃত হয় নাই, ইহা বলা আমার অভিপ্রেত নহে। কার্য্যক্ষেত্রে পুণ্যশ্লোক-গণের বিচিত্রঘটনাপূর্ণ প্রাণস্পর্শী চরিত্রের প্রত্যক্ষবৎ প্রদর্শন দ্বারা সেই সকল অনর্ঘ্য চরিতরত্নের দিব্য জ্যোতিঃ লোকহৃদয়ে অতি শীঘ্র ও সহজে স্ফুরিত হয়, এবং তাহা আর সহজে অপনীত হয় না। ইহা বলাই আমার অভিপ্রেত।

দুইটী উদাহরণের দ্বিতীয়টী সাহিত্যদর্পণকারের কথা। তিনি বলিয়াছেন,—নীরস, কঠোর ও জটিল তর্ক-মীমাংসাদি দর্শনশাস্ত্র দ্বারা যদিও ফললাভ হইতে পারে, কিন্তু তাহা বহুকালব্যাপিনী কঠোর সাধনা ও তদনুরূপ পাত্রবিশেষ দ্বারা সাধ্য। সে কঠোরতা এ কালের ছাত্রদের অসাধ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না। পক্ষান্তরে, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ প্রভৃতির মনোহর ও লোকপাবন, বিচিত্র চরিত্রাবলীর সুচারু চিত্রসকল সহৃদয়-হৃদয়রূপ সম্মোহন তূলিকা দ্বারা উন্মীলিত হইলে, তাহা সকলেরি সুখসেব্য ও সুখবোধ্য হয়, এবং লোকহৃদয়ে অম্লান বর্ণে চিরদীপ্ত থাকে। অতএব, এ সরস ও মধুর উপায় ত্যাগ করিয়া, কাহার চিত্ত পূর্ব্বোক্ত জটিল ও কঠোরমার্গে প্রবৃত্ত হইবে? যে রোগ (দাহ-জ্বরাদি ব্যাধি) কটু-তিক্ত-কষায়াদি উৎকট বিস্বাদ ঔষধ দ্বারা প্রশমিত হয়, সেই রোগ যদি সুবাসিত, নীহারশীতল, সুমধুর পানীয় দ্বারাও প্রশমিত হয়, তবে কোন্ রোগীর সেই মধুর

পানীয় ঔষধে প্রবৃত্তি বলবতী না হয় ? (১) এই জন্যই সুগভীর-তত্ত্বদর্শী, শিক্ষাতত্ত্বে নিষ্ণাত, মনীষিবর, কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্যতম ভাইস্ চ্যান্সেলার, মহামান্য জষ্টিস্ শ্রীমান্ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় সরস্বতী তদীয় কনভোকেসন্-বক্তৃতায় শেষোক্ত সর্ব্বজনমনোহর ও আশুফলপ্রদ পন্থাকেই অবলম্বনীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (২)। বর্ত্তমান কালে, ছাত্রশিক্ষোপযোগী

(১) "চতুর্বর্গফলপ্রাপ্তির্হি বেদশাস্ত্রেভ্যো নীরসতয়া দুঃখাদেব জায়তে। পরমানন্দসন্দোহজনকতয়া সুখাদেব সুকুমারবুদ্ধীনামপি পুনঃ কাব্যাদেব। ননু তর্হি পরিণতবুদ্ধিভিঃ সৎসু বেদশাস্ত্রেষু, কাব্যেষু কিমিতি যত্নঃ করণীয়ঃ ? ইত্যপি ন বক্তব্যম্। কটুকৌষধোপশমনীয়স্য রোগস্য সিতশর্করোপশমনীয়ত্বে কস্য বা রোগিণঃ সিতশর্করাপ্রবৃত্তিঃ সাধীয়সী ন স্যাৎ ?"

(২) "I have no faith in the efficacy of abstract religious maxims solemnly inculcated by grave teachers upon faithful minds which receive no impression from the process. But I believe, it would be far more profitable to illustrate the fundamental principles of every system of morals and religion by examples of truth, purity, charity, humility, self-sacrifice, gratitude, reverence for the teacher, devotion to duty, womanly chastity, filial piety, loyalty to the King and of other virtues appropriately selected from the great national books of Hindus and Mahomedans These cameos of character, these ideals of our past, portrayed with surpassing loveliness in the immortal writings of our poets and sages, would necessarily captivate the imagination and strengthen the moral fibre of our youngmen, who would thus acquire genuine respect

উপাদান-সম্ভার সংগ্রহ করিবার জন্য, তিনি স্বদেশের অক্ষয় জ্ঞানভাণ্ডার রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত প্রভৃতি এ দেশের চিরোপজীব্য শাস্ত্রসকলের দিকেই লক্ষ্য রাখিতে বলিয়াছেন। রোগীর প্রকৃতির ও ধাতুর দিকে যাঁহার বিশেষ দৃষ্টি আছে, ব্যাধির তত্ত্বপরিজ্ঞানে যিনি সুদক্ষ, তিনি সুচিকিৎসক। সুচিকিৎসকের ব্যবস্থাই গ্রাহ্য। তাই আমি উক্ত অকপট ছাত্র-হিতৈষী, বহুদর্শী মনীষীর উপদেশকেই শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ জ্ঞানে পূর্ণভাবে আশ্রয় করিয়াছি।

এ গ্রন্থে, ছাত্রগণের প্রাণারাম উপাদানে সজ্জিত করিয়া, কতিপয় ক্ষণজন্মা স্বদেশীয় পুণ্যশ্লোকের পুণ্য-চরিত্র মহিমা মাতৃভাষায় কীর্ত্তন করিয়াছি। স্বগৃহে মাতৃহস্তের অন্ন-পানের ন্যায় সবল মাতৃভাষায় রচিত স্বদেশের পুণ্যশ্লোকগণের সুচরিতাবলী যে কি মধুর! কি হৃদয়গ্রাহী ও আশুফলপ্রদ! তাহা বলিয়া জানাইবার নহে। এ গ্রন্থের উপাদানসম্ভার-সঙ্কলনের জন্য আমাকে দূরে গমন করিতে হয় নাই। আমাদের অনন্তকোটি পিতৃলোকপরম্পরায় চিরনিষেবিত,—এদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার উপজীব্যতম,—মানববংশপরম্পরা কর্ত্তৃক যুগযুগান্ত-অধীত ও শ্রুত হইয়াও নিত্য নব-নব সৌন্দর্য্যে ও মাধুর্য্যে এবং নিত্য নব-নব জ্ঞানগাম্ভীর্য্যে দেদীপ্যমান,—অক্ষয় রত্নভাণ্ডার—'রামায়ণ,' 'মহাভারত' ও 'ভাগবত' হইতে ইহার উপাদান সংগ্রহ

for those principles of life and conduct which have guided in the past countless generations of noble men and women in this historic continent."

করিয়াছি (১)। যে স্থানে যে নীতি যে ভাবে দিলে ছাত্র-হৃদয়ের ঠিক উপযোগী হইবে বোধ করিয়াছি, সেই স্থানে সেই নীতি ঠিক্ সেই ভাবে দিবার চেষ্টা করিয়াছি, তজ্জন্য নূতনের প্রবর্ত্তন বা পুরাতনের পরিবর্ত্তন, যাহা কিছু আবশ্যক হইয়াছে, করিয়াছি। হৃদয়ের শিক্ষাই প্রকৃত মনুষ্যত্বলাভের শিক্ষা। আজি কালি বিদ্যালয়ে সেই শিক্ষার যে কিরূপ প্রয়োজন, তাহা চিন্তাশীল সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেই অনুভব করিতে পারেন। সেই প্রয়োজনসিদ্ধির যদি অণুমাত্র সাহায্য হয়, এই অভিপ্রায়ে আমি এই গ্রন্থ প্রকাশিত করিলাম। বর্ণনীয় বিষয়বিশেষে প্রাণের কথা যে স্থলে যে আকারে হৃদয় হইতে স্বতই উত্থিত হইয়াছে, তাহাই অক্ষত রাখিয়াছি। যোগভ্রষ্ট হইয়া একটী কথাও লিখিতে চেষ্টা করি নাই।

ঈশ্বর তাঁহার এ ক্ষুদ্রতম সন্তানকে যতটুকু ভক্তি ও শক্তি দিয়াছেন, তন্মাত্র সম্বল করিয়া, স্বদেশীয় কতিপয় দুর্লভজন্মা নরদেবতার পুণ্যকথা ইহাতে বিবৃত করিলাম। ফলাফল সেই মঙ্গলময় বিশ্বনিয়ন্তার ইচ্ছাধীন। যাঁহারা ইহার কোনও স্থানে ভ্রম, প্রমাদ বা ত্রুটি দেখিবেন, অনুগ্রহ করিয়া এ অধীনকে জানাইলে, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সংশোধন করিব। ইতি।

কলিকাতা
৭৭ নং পটলডাঙ্গা ষ্ট্রীট,
১৫ই বৈশাখ, ১৩১৮ সাল।

বিনয়াবনত
শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা

(১) যে যে মূল গ্রন্থ হইতে ইহার যে যে বিষয় সঙ্কলিত, তাহা সূচীপত্রে উল্লিখিত আছে।

সূচীপত্র।

চরিতামৃত।

"মহাত্মনাং হি চরিতং শ্রোতব্যং সর্ব্বদা জনৈঃ"

—মহাত্মার পুণ্যচরিত্র লোকের নিত্যই শ্রোতব্য।

কর্ণ।

কথিত আছে, পাণ্ডবমাতা মহাপ্রভাবা কুন্তীদেবীর গর্ভে সূর্য্যাংশে মহাত্মা কর্ণের উৎপত্তি। পশ্চাৎ তিনি অধিরথ নামক কোনও সূতজাতীয় কর্তৃক প্রতিপালিত। সূর্য্যাংশে উৎপন্ন বলিয়া, তিনি 'বৈবস্বত' (সূর্য্যপুত্র), এবং সূতপালিত বলিয়া তিনি 'সূত-নন্দন' নামে খ্যাত। একদা অশ্বত্থামার সহিত কর্ণের বিবাদপ্রসঙ্গে, অশ্বত্থামা কর্ণকে 'সূতপুত্র' বলিয়া উপহাস করায়, কর্ণ মহাতেজে বলিয়াছিলেন,—

"সূতো বা সূতপুত্রো বা যো বা কো বা ভবাম্যহম্।
দৈবায়ত্তং কুলে জন্ম মমায়ত্তং হি পৌরুষম্॥"

—আমি সূতই হই, বা সূতপুত্রই হই, যে কেহ হই না কেন, আমার জাতি-কুলের পরিচয়ে কি হইবে? বংশবিশেষে জন্মলাভ দৈবাধীন, পৌরুষই মানবের প্রকৃত পরিচয়। এ কথাটা সার সত্য। যাঁহারা অলৌকিকী প্রজ্ঞা, প্রতিভা ও বিশ্বজনীন চরিত্রের প্রভাবে জগতে চিরস্মরণীয়, তাঁহাদের নাম-ধাম-বংশ প্রভৃতির পরিচয় না পাইলেও, লোকসমাজের ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। তাঁহাদের লোককল্যাণকর, উপজীব্য চরিত্রকলাপই অনন্তকাল

জীবলোকের মহোপকার সাধন করিয়া, তাঁহাদের মহত্ত্বের পরিচয় প্রদান করিবে।

মহাবীর কর্ণ একটী জ্বলন্ত পুরুষকারের মূর্ত্তি। কর্ণ বাল্যেই বুঝিয়াছিলেন,—বিধিনির্বন্ধে আমি জননী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত। সূতজাতীয় অধিরথ ও তৎপত্নী রাধা আমার পালক ও পালিকা পিতা-মাতা। লোকে মহাবংশে জন্মাধীন যে সকল সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করে, আমার ভাগ্যে তাহা নাই। একমাত্র পুরুষকারই আমার সহায়, সাধন ও সর্ব্বস্ব। দুস্তর সমুদ্রের ন্যায় সম্মুখে সঙ্কটাকীর্ণ বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তীর্ণ। একমাত্র পৌরুষকেই সহায় করিয়া এবং অটল অধ্যবসায় ও অদম্য উদ্যোগের বর্ম্ম ধারণ করিয়া, এ কর্ম্মক্ষেত্র উত্তীর্ণ হইতে হইবে। দৈবের দোহাই দিয়া নিজের অস্তিত্ব লোপ করা নিতান্ত কাপুরুষতা। দৈবও প্রাক্তন পুরুষকার ভিন্ন আর কিছুই নহে। (১)

(১) "পূর্ব্বজন্মকৃতং কর্ম্ম তদ্দৈবমিতি কথ্যতে।
তস্মাৎ পুরুষকারেণ যত্নং কুর্য্যাদতন্দ্রিতঃ॥"
-পূর্ব্ব জনমের কার্য্য দৈব তারি নাম,
কার্য্যে তবে পৌরুষ দেখাও অবিরাম।
"যথা মৃৎপিণ্ডতঃ কর্ত্তা কুরুতে যদ্যদিচ্ছতি।
এবমাত্মকৃতং কর্ম্ম মানবঃ প্রতিপদ্যতে॥"
-যেমতি মৃত্তিকাপিণ্ড লয়ে কুম্ভকার—
ইচ্ছামত গড়ে কত বিচিত্র আকার,
তেমতি করিয়া লোক আপন ইচ্ছায়
আপন কার্য্যের ফল আপনিই পায়।

এস্থলে, আমার কোনও বন্ধুর কথা মনে হইল। তিনি পিতৃবিয়োগে নিঃস্ব ও হতাশ হইয়া নিরন্তর 'হা হতোঽস্মি' করিতেন। জীবনে তাঁহার একান্ত নির্বেদ। কোনও কাজ-কর্ম্মের চেষ্টা-চরিত্র করিতেন না, কেবল উদাস ও হতাশভাবে কালযাপন করিতেন। সে অবস্থায় তাঁহার জীবন দুঃসহ ভারবহনমাত্র হইল। এ সময় একদা কোনও কর্ম্মবীর ইংরাজের সহিত তাঁহার আলাপ হয়। মহানুভব সাহেব তাঁহাকে তাদৃশ ম্রিয়মাণ দেখিয়া, তিরস্কার পূর্ব্বক বলিলেন, "আপনি যুবা-পুরুষ, ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ জীব-মনুষ্যজাতি। কি ঘৃণার কথা, আপনি নিষ্কর্ম্মা জড়পিণ্ডবৎ বসিয়া কেবল ভাগ্যনিন্দা করিতেছেন।" শুভক্ষণে তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া তিনি তদবধি মহোদ্যমে কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবৃত্ত হইয়া, শেষে অতুল সম্পদের অধিকারী হইয়াছিলেন। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন,—

সুবর্ণপুষ্পাং পৃথিবীং বিচিনোতি স [illegible] হি।
যঃ শূরঃ কৃতবিদ্যশ্চ বেত্তি সম্যক্ চ সেবিতুম্॥"

এ ধরণী সুবর্ণময় পুষ্পসমূহে মণ্ডিতা। যিনি কৃতবিদ্য ও কর্ম্মবীর, এবং অর্থের প্রকৃত ব্যবহার জানেন, তিনিই ইহার অধিকারী। কথাটী সম্পূর্ণ সত্য, অর্থের উপার্জ্জন অপেক্ষা সদব্যবহার অধিকতর প্রয়োজনীয়। অর্থের গুণাগুণ, ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। কৃপণতায় অর্থের অস্তিত্বই থাকে না। অপব্যয়ে উহা বিষের ন্যায় এবং সদ্ব্যয়ে অমৃতের ন্যায় কার্য্য করে।

ভগবান বিবস্বানের প্রসাদে কর্ণ জন্মাবধি অভেদ্য দিব্য

বর্ম্মে ও তেজোময় দিব্য কুণ্ডলদ্বয়ে অলঙ্কৃত ছিলেন। যাবৎ সে কবচ ও কুণ্ডল তাঁহার দেহে থাকিবে, তাবৎ তিনি অজেয় ও অমর। এ বিষয়ে তদীয় অলৌকিক ও অশ্রুতপূর্ব্ব মহিমার কথা পশ্চাৎ বর্ণিত হইবে।

কর্ণ সূতভবনে নবসূর্য্যের ন্যায় দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। শৈশবেই তিনি ভাবিতেন, ভাগ্যদোষে আমি জন্মমাত্র জননী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত ও সূতালয়ে পরিপালিত। দৈবাধীন এ হীনতাকে আমি নিজ পুরুষকার দ্বারা বিলুপ্ত করিব। চন্দ্রেও কলঙ্ক আছে। তাহা বলিয়া কি লোকান্ধকারহারী সুধাময় চন্দ্রমা জগতের পূজ্য নহে? মানবের মহত্ত্ব কর্ম্মাধীন। এক্ষণে সেই কর্ম্মই আমার সাধন ও ভজন, কর্ম্মই আমার সহায় ও সম্পত্তি, কর্ম্মই আমার গতি ও মুক্তি। কর্ম্মেই আমার অধিকার, ফল সেই ন্যায়কারী, সমদর্শী, সর্ব্বসাক্ষী, মঙ্গলময়েরই অধীন। তিনি এইরূপ চিন্তা করিয়া, অকলিত ধৈর্য্য ও উৎসাহে প্রদীপ্ত হইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি প্রথমতঃ অচিন্ত্য অবলম্বনে যতদূর সাধ্য নানা শাস্ত্র ও আয়ুধবিদ্যা অভ্যাস করিলেন। কিন্তু দেখিলেন, উপযুক্ত সদ্‌গুরু বিনা সিদ্ধিলাভ সম্ভাবিত নহে। এজন্য তিনি সুযোগ্য গুরুদেবের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ভগবান জমদগ্নিতনয় পরশুরাম অস্ত্রবিদ্যায় ত্রিলোক-বিজয়ী, তদীয় খ্যাতি সর্ব্বত্র বিশ্রুত। এ জন্য কর্ণ প্রথমতঃ তাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিলেন। অসাধারণ ধীশক্তি অবিচলিত অধ্যবসায় ও অত্যদ্ভুত ধৈর্য্যের প্রভাবে তিনি

পরশুরামের নিকট অচিরেই নানা দিব্যাস্ত্রে সম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ করিলেন। এস্থলে তাঁহার একটী অতুলনীয় ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইতেছে। একদা তদীয় গুরুদেব পরশুরাম সুদূরপর্য্যটনে ক্লান্ত হইয়া, আশ্রমে আসিয়া গুরুভক্ত শিষ্য কর্ণের উরুদেশে মস্তক স্থাপনপূর্ব্বক গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ইত্যবসরে একটা অস্থিভেদী, রক্তপায়ী, বজ্রদন্ত ভীষণ কীট আসিয়া, কর্ণের উরুদেশে দংশন করিল। সে ক্রমশঃ ত্বগ্‌ভেদ করিয়া, উরুদেশের অস্থি বিদীর্ণ করিতে লাগিল। সেই দারুণ কীটকে বাধা দিতে হইলে, তাঁহার উরুদেশ বিচলিত এবং তাহাতে আচার্য্যদেবের নিদ্রাভঙ্গের আশঙ্কা। পরিশ্রান্ত নিদ্রিত গুরুদেবের বিশ্রামভঙ্গ অপেক্ষা এস্থলে সহিষ্ণুতাই আমার শ্রেয়। ইহা ভাবিয়া তিনি বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া, স্থিরভাবে গুরুমস্তক ধারণ পূর্ব্বক বসিয়া রহিলেন। সেই নিদারুণ কীট ক্রমশঃ তাঁহার উরুদেশের অস্থিভেদ পূর্ব্বক অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদীর্ণ করিল, দরদর ধারায় শোণিতস্রোত বহিল। শিষ্যের তথাপি তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। তাঁহার দেহের একটী শিরাও বিচলিত হইল না, বদনমণ্ডলে অণুমাত্র বিকার লক্ষিত হইল না। ক্রমে শোণিতস্পর্শে পরশুরামের নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি জাগরিত হইয়া, সেই শোণিতস্রাব দর্শনে চমকিত হইয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন,—বৎস কর্ণ! এ শোণিতস্রাব কিসের? সত্য করিয়া বল! কর্ণ কৃতাঞ্জলিপুটে বিনীতভাবে প্রকৃত ঘটনা নিবেদন করিলেন।

জামদগ্ন্যের নিকট নানা অস্ত্রবিদ্যা লাভ করিয়াও কর্ণের জ্ঞানতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত হইল না। বিশেষতঃ তাঁহাকে সূতপুত্র জানিতে পারিয়া, জামদগ্ন্য তাঁহার প্রতি বীতরাগ হইলেন। এজন্য কর্ণকে পুনরায় উপযুক্ত গুরুর অন্বেষণ করিতে হইল। তৎকালে পরশুরামের অন্যতম শিষ্য দ্রোণাচার্য্যের অস্ত্রবিদ্যার অতুল খ্যাতি সর্ব্বত্র প্রথিত। পরশুরাম প্রব্রজ্যাগ্রহণকালে সৎপাত্র জানিযা দ্রোণকে নিজের অলৌকিকী দিব্যাস্ত্রবিদ্যা দান করায়, দ্রোণ ধরাতলে আয়ুধবেদে অদ্বিতীয় হইয়াছিলেন। দ্রোণাচার্য্য অতিমাত্র দরিদ্র। তাঁহার পরিবারের মধ্যে একমাত্র জীবনসর্ব্বস্ব মাতৃহীন পুত্র অশ্বত্থামা। তিনি দারিদ্র্যে নিপীড়িত হইয়া, জীবিকাব জন্য নানা স্থান ভ্রমণ করিতে-ছিলেন। অনন্তর ভগবান্ ভীষ্মদেব কর্ত্তৃক তিনি যুধিষ্ঠির-দুর্য্যোধনাদি রাজকুমারগণের অস্ত্রবিদ্যাব আচার্য্যপদে নিয়োজিত হন। দ্রোণেব নিকট কৌরবগণের অস্ত্রশিক্ষা যথাবিধি সমাপ্ত হইলে, দ্রোণগুরু কুমারগণের বিদ্যাপরীক্ষার্থে এক বিশাল রঙ্গ-ভূমি নির্ম্মাণ করাইলেন। উহা সর্ব্বাঙ্গে সুসম্পন্ন ও সর্ব্বোপ-করণে সুসজ্জিত হইল। সমস্ত কুরুপরিবার সহ স্বয়ং ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর প্রভৃতি কুরুবৃদ্ধেরা তথায় উপস্থিত হইলেন; নানা দেশেব রাজা ও রাজকুমারগণ এবং অন্যান্য বীরমণ্ডলী ও কুতূহলী দর্শকবৃন্দ তথায় সমবেত হইলেন। তথায় সকলকেই নিজ নিজ অস্ত্রবিদ্যার নৈপুণ্যপ্রদর্শনের অবসর প্রদত্ত হইয়া-ছিল। কথিত আছে, অর্জ্জুনই সেই মহাপরীক্ষাসভায় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। সমবেত বীরমণ্ডলীকে একবাক্যে অর্জ্জুনের

অবদান গান করিতে শুনিয়া, ঘোর ঈর্ষ্যানলে দুর্য্যোধন ও দুঃশাসনাদির চিত্ত দগ্ধ হইতে লাগিল। অনন্তর দ্রোণগুরু উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন,—কুরুকুমারগণ ভিন্ন, নানা দেশাগত অন্যান্য শূরগণও এ সভায় নিজ নিজ অস্ত্রবিদ্যা প্রদর্শন করুন। গুণপক্ষপাতী আচার্য্য কর্ত্তৃক এইরূপে তথায় সকলেরি পরীক্ষাবসর প্রদত্ত হইলে, তথায় অকস্মাৎ এক অপূর্ব্ব বীরমূর্ত্তি প্রাদুর্ভূত হইল। যেন তথায় অরুণোদয় হইল। সেই অপরূপ যুবার দেহ হইতে বালসূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জ নিষ্ঠ্যূত হইতেছিল। তাঁহার লোচনদ্বয় প্রফুল্ল ইন্দীবরতুল্য, আকর্ণ-বিশ্রান্ত, সমুন্নত ও দিব্য লক্ষণে অলঙ্কৃত সুপ্রশস্ত ললাট; দেহ কনকতালনিভ সমুন্নত ও অপূর্ব্ব দীপ্তি-কান্তি-দ্যুতিগুণে বালসূর্য্য বা জ্বলনের ন্যায় ভাস্বর। তদীয় ভুজযুগল কনকস্তম্ভ-সদৃশ বিশাল ও সুঘটিত। তিনি সিংহের ন্যায় ধীরোদ্ধত পদ-সঞ্চারে তথায় উপস্থিত হইয়া, রঙ্গমণ্ডল নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, অনন্তর দ্রোণ ও কৃপাচার্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া প্রণাম করিলেন। রঙ্গমণ্ডলস্থ সমস্ত লোক নির্ণিমেষ লোচনে তাহাকে দর্শন করিয়া, পরস্পর বলিতে লাগিলেন,—অহো! কে এ মহাপুরুষ! এ কি গগনভ্রষ্ট স্বয়ং প্রভাকর! এমন তেজঃপুঞ্জ তরুণমূর্ত্তি ত কখনও দেখি নাই। কর্ণ কাহারও দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া অর্জ্জুনকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—হে পার্থ! এ সভায় তুমি যে অস্ত্রবিদ্যা দেখাইয়াছ, সে সকল বিদ্যা ও অন্যান্য নব নব বিদ্যাকৌশল তোমা অপেক্ষা অধিকতর নৈপুণ্যের সহিত সর্ব্বসমক্ষে আমি দেখাইব। অতএব তুমি নিজ বিদ্যাগর্ব্ব

পরিত্যাগ কর। তাঁহার সেই সদর্প বাক্যের অবসান না হইতেই সমবেত জনমণ্ডলী বিস্ময়ে যন্ত্রোৎক্ষিপ্তের ন্যায উঠিয়া দাঁড়াইল। সকলেবি দৃষ্টি তাঁহাতে নিবদ্ধ. সকলেই নিঃশব্দ ও নিস্পন্দ। যুগপৎ দুর্য্যোধনের মনে হর্ষ এবং অর্জ্জুনের মনে লজ্জা ও ক্রোধেব উদয় হইল।

ধনঞ্জয় কর্ণেব তাদৃশ প্রগল্ভ বাক্যে আপনাকে অবমানিত জ্ঞান কবিযা, উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন, রে পামর! যে ব্যক্তি সাধুজনসভায অনাহূত ও অপরিচিতভাবে প্রবেশ করিয়া, আত্মশ্লাঘা প্রকাশ করে, সে যে নিবয়ে গমন করে, অদ্য আমা কর্ত্তৃক নিহত হইযা, তুমি সেই লোকে গমন কর। কর্ণ সক্রোধে উত্তব করিলেন,--বীর্য্যই মানবের শ্রেষ্ঠ পবিচয়। বাজগণের বাজশ্রীও বীর্য্যমূলক। বিশেষতঃ এ রঙ্গভূমি সর্ব্বসাধাবণের বীরত্বপরীক্ষার স্থান। অতএব এ স্থানে অন্য পবিচযে কি প্রয়োজন? এরূপ দম্ভপ্রকাশেই বা কি পুরুষত্ব? যদি আপনাকে বীর বলিয়া অভিমান থাকে, তবে ধনু গ্রহণ কব, আমি বীর্য্যদ্বারা আত্মপবিচয দিব। বাহুবলই বীরের প্রকৃত পরিচয়।

অনন্তর দ্রোণগুরুব আদেশে কর্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয়েরই বিচিত্র শক্তি কৌশলে ও অস্ত্রবিদ্যানৈপুণ্যে দর্শকমণ্ডলী স্তম্ভিত হইলেন সেই অসংখ্যজনতাপূর্ণ রঙ্গভূমি নির্ব্বাক্ ও চিত্রার্পিতের ন্যায় অবস্থিত। যে দিকে কর্ণ, নিজ দলবল সহ দুর্য্যোধন সেই দিকে দণ্ডায়মান, এবং যে দিকে ধনঞ্জয়, ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-বিদুর

প্রভৃতি সেই দিকে অবস্থিত। এইরূপে সেই বিশাল রঙ্গভূমি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া, একপক্ষ গাণ্ডীবীর ও অন্য পক্ষ কর্ণের সাধুবাদ করিতে লাগিলেন।

যখন উভয়পক্ষ পরস্পর ঘোরতর কলহে প্রবৃত্ত, সে সময় পাণ্ডবজননী কুন্তীদেবী, অদূরে নারীগণমধ্যে বসিয়াছিলেন। তিনি কর্ণকে দেখিয়াই আপন পুত্র বলিয়া চিনিলেন। বিশেষতঃ তদীয় দেহে আজন্মসিদ্ধ কবচ-কুণ্ডল দর্শনে তাঁহার চিত্তে বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না। তিনি কলঙ্কভয়ে প্রসবমাত্র কর্ণকে পরিত্যাগ করিলেও, সে মাতৃহৃদয়ে স্বাভাবিক অপত্য-স্নেহ জাজ্বল্যমান ছিল। আজি বহুকাল পরে সেই পুত্রের মুখচন্দ্র দর্শন করিয়া তাহার হৃদয়ে অপত্যপ্রেম উচ্ছলিত হইল। তিনি মনে মনে দৈবকে ধিক্কার দিয়া নিঃশব্দে অশ্রুমোচন করিতে করিতে সংজ্ঞাশূন্যা হইলেন। সর্ব্বদর্শী মহাত্মা বিদুর তৎক্ষণাৎ গিয়া পরম যত্নে কুন্তীর সংজ্ঞা সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। দাসীগণ সুস্নিগ্ধ চন্দনোদক ও আর্দ্র ব্যজনবায়ুদ্বারা তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। তিনি সংজ্ঞা লাভ করিয়া নিদারুণ মনস্তাপে মৃতকল্পা হইলেন।

যখন কর্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে মহাচাপ ও প্রদীপ্ত আয়ুধ উদ্যত করিয়া দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত, তখন কৌরবগণের অন্যতর গুরু কৃপাচার্য্য উচ্চৈঃস্বরে কর্ণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,— মহাকুলপ্রসূত কৌরবরাজকুমারের সহিত এরূপ দ্বন্দ্বযুদ্ধস্থলে, চিরন্তন নিয়ম এই যে, যুদ্ধপ্রবৃত্ত উভয়কে সর্ব্বসমক্ষে আত্ম-

পরিচয় দিতে হয়। এই অর্জ্জুন মহারাজ কুরুকুলেশ্বর লোক-পূজিত মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্র এবং মহাকুলীনা রাজনন্দিনী ও রাজ-দুহিতা কুন্তীদেবী ইহার মাতা। অতএব হে কর্ণ! বল। তুমি কোন্ কুলে প্রসূত? তোমার পিতা ও মাতা কে? রাজ-কুমার অর্জ্জুন অজ্ঞাতকুলশীলের সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। অগ্রে তোমার কুলশীল জানিয়া, অর্জ্জুন পশ্চাৎ তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবেন। এই কথা শুনিয়া কর্ণের মুখকমল ব্রীড়াবনত ও তদীয় লোচনযুগল বর্ষাজলক্লিন্ন কমলের ন্যায় ম্লান হইল। তিনি যুক্ত করে লোকসাক্ষী ভগবান সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন তখন দুর্য্যোধন রোষভরে কহিলেন, —হে আচার্য্যদেব! মানবের দ্বিবিধ আত্মপরিচয়,—কৌলীন্য ও পুরুষকার। এই বীরত্বপরীক্ষাসভায় পুরুষকারই ইহাঁর আত্ম-পরিচয়। আর যদি ইহাই আপনাদের ব্যবস্থা হয় যে, অর্জ্জুন রাজা বা রাজপুত্র ভিন্ন অন্যের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবেন না। তবে আমি এই মুহূর্ত্তেই কর্ণকে অঙ্গদেশের রাজপদে অভিষিক্ত করি-তেছি। ইহা বলিয়াই দুর্য্যোধন তৎক্ষণাৎ সেই স্থানেই রাজ্যাভি-ষেকের উপযোগী সমস্ত দ্রব্যসম্ভার আনাইলেন, এবং জয়শব্দ ও শঙ্খ-ভেরি-জয়ঢক্কাদি বাদ্যের সহিত মহাসমারোহে কর্ণকে অঙ্গরাজ্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া, তদীয় মস্তকে মুক্তা-মণিসমলঙ্কৃত, শশিশুভ্র রাজচ্ছত্র স্বয়ং ধারণ করিলেন। তদীয় অনুজ ও পরিচারকেরা তৎক্ষণাৎ বালব্যজন ও অন্যান্য রাজোচিত পরিবর্হ দ্বারা তাঁহার সেবা ও সম্মান করিতে লাগিলেন। বৈতালিকগণ তারস্বরে তদীয় যশোগানে নিযুক্ত হইল। এইরূপে

দীনহীন, পিতামাতার পরিত্যক্ত, সহায়সাধনশূন্য কর্ণ অত্যুন্নত, লোকপূজিত রাজপদে অধিরোহণ করিয়া, সংসারে পুরুষকারের জয় ঘোষণা করিলেন।

কর্ণ রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া, কৃতজ্ঞহৃদয়ে দুর্য্যোধনকে কহিলেন,—হে সখে! হে মহারাজ! কুরুকুলেশ্বর! বলুন! আপনার এ মহোপকারের কি প্রতিদান করিব? সুযোধন পুলকিত চিত্তে বলিলেন,—আমি আর কিছুই চাহি না, আপনার সহিত অচ্ছেদ্য সখ্যবন্ধনে যাবজ্জীবন বদ্ধ হই, ইহাই আমার একমাত্র কামনা। কর্ণ তাঁহাকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, তাহাই অঙ্গীকার করিলেন। অনন্তর পরস্পরে হর্ষভরে বারংবার প্রেমালিঙ্গনপূর্ব্বক অসীম আনন্দসাগরে মগ্ন হইলেন। ঠিক্ এই সময়, কর্ণের পালক পিতা সূতজাতীয় বৃদ্ধ অধিরথ হাঁপাইতে হাঁপাইতে তথায় আসিয়া উপস্থিত। তিনি পুত্রের রাজ্যাভিষেকবার্ত্তা শ্রবণে আহ্লাদে বিহ্বল হইয়া, নিজ জরাজনিত বৈক্লব্য গণনা না করিয়া, যষ্টিধারণপূর্ব্বক স্খলিতপদে তথায় আসিয়াছেন। সিংহাসনারূঢ় কর্ণ দূর হইতে পিতাকে দর্শনমাত্র রাজসিংহাসন ত্যাগ করিয়া সসম্ভ্রমে গিয়া পিতৃচরণে নিপতিত হইলেন। তাঁহাকে বারংবার সাষ্টাঙ্গপ্রণাম করিলেন। অধিরথ সামন্তবৃন্দপরিবেষ্টিত, ঐশ্বর্য্যোদ্ভাসিত সেই রাজসভা-মণ্ডপে নিজ ধূলিধূসরিত পদদ্বয় পটান্তে আচ্ছাদিত করিতে চেষ্টা করায়, মহাত্মা কর্ণ স্বয়ং নিজ মস্তক ও উত্তরীয় দ্বারা তাঁহার চরণ মুছাইয়া তাঁহাকে সিংহাসনে বসাইয়া স্বয়ং কৃতাঞ্জলিপুটে তদীয় চরণতলে উপবেশনপূর্ব্বক, পরিশ্রান্ত বৃদ্ধ

পিতাকে স্বহস্তে বীজন করিতে লাগিলেন। অধিরথ স্নেহ-নির্ভরে ও পুত্রৈশ্বর্য্যজনিত আনন্দে বিহ্বল হইয়া পুত্রকে বারংবার বক্ষে গাঢ়রূপে ধারণ করেন ও হর্ষাশ্রুধারায় তদীয় সর্ব্বাঙ্গ অভিষিক্ত করেন। অনন্তর—"হে পুত্র! হে বৎস! হে সর্ব্বস্ব ধন আমার! বলিতে বলিতে অন্তর্বাষ্পে রুদ্ধকণ্ঠ হইয়া আর কিছুই বলিতে পারেন না। সভাস্থ জনমণ্ডলী স্তম্ভিত হইয়া সেই ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন।

কর্ণকে সূতপুত্র জানিয়া ভীমসেন উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া বলিলেন,—অরে সূতপুত্র! অর্জ্জুনের সহ তোমার যুদ্ধ ও অর্জ্জুনের হস্তে তোমার বধ, চন্দ্রবংশাবতংস, লোকপূজিত অর্জ্জুনের পক্ষে বড়ই লজ্জার কথা! তুমি রাজচিহ্ন ত্যাগ করিয়া, তোমার কুলোচিত প্রতোদ গ্রহণ কর! নরাধম! অঙ্গরাজ্যের সিংহাসনে উপবেশনের যোগ্য কি তুমি? কুক্কুর কি দেবভোগ্য যজ্ঞিয় হবির্ভাগের অধিকারী?

ভীমের তাদৃশ কঠোর বাক্যে কর্ণ মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহার অধর স্ফুরিত হইতে লাগিল। তিনি দীর্ঘনিশ্বাস মোচন করত, ঊর্দ্ধমুখে ও যুক্ত করে ভগবান্ সূর্য্যদেবকে দর্শন করিলেন। দুর্য্যোধন প্রিয়বন্ধুর তাদৃশ অবমানে ক্রোধে অগ্নিতুল্য হইয়া, মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় মহাবেগে আসন হইতে উত্থিত হইলেন, এবং ভীমকর্ম্মা ভীমসেনকে পরুষবাক্যে তিরস্কারপূর্ব্বক কহিলেন,—রে দুরাত্মন্! বৃকোদর! এ বীরসমাজে তোর এরূপ বাক্য প্রয়োগ নিতান্ত বর্ব্বরের কার্য্য। এ জগতে বাহু-বলই বীরের প্রকৃত পরিচয়। শূরগণের ও নদীগণের প্রভব

দুজ্ঞেয়। দেখ! কোন্ অজ্ঞাত, অন্ধকারাচ্ছন্ন গিরিকন্দর হইতে উদ্ভূত হইয়া, কল্লোলিনীকুল সুবিমল সলিলধারায় দিগ্‌দিগন্ত প্লাবিত করিতেছে। তাহাদের সুধামধুর বারিধারায় শত শত ক্ষেত্র সিক্ত হইয়া, বিবিধ শাক-শস্য-ফল-মূলাদি উৎপাদন পূর্ব্বক অসংখ্য জীবের যুগপৎ ক্ষুৎপিপাসা-শ্রান্তি-ক্লান্তি হরণ করিতেছে! পতিতপাবনী সর্ব্বলোকজীবনী সুরধুনীর উৎপত্তি কোন্ অজ্ঞেয় গিরিদরীর ধ্বান্তাচ্ছন্ন গর্ভে নিহিত। তাই বলিয়া কি ভাগীরথী ত্রিলোকীর আরাধ্যা নহেন? ক্ষুদ্র দারুখণ্ড-মন্থনোত্থ বহ্নি বর্দ্ধিত হইয়া নিজ তেজে কি বিশ্বদাহ করিতে পারে না? দেখ! দধীচির দেহাস্থিখণ্ড বজ্রে পরিণত হইয়া, ত্রিলোকজয়ী বৃত্রাদি দানবকুলকে সংহার করিয়াছে। দেবসেনানী কার্ত্তিকেয়ের উদ্ভব রুদ্র অগ্নিকুণ্ড হইতে। বিশ্বমহিত বিশ্বামিত্র প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিরা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মলাভ করিয়া, নিজ পৌরুষেই সুরপূজিত ব্রহ্মর্ষিপদ লাভ করিয়াছেন। মহাপ্রভাব ঋষিকুলপতি ভগবান অগস্ত্য কুম্ভ হইতে উৎপন্ন। মহাত্মা কৃপাচার্য্য ও দ্রোণাচার্য্যের জন্মকথাও লোকের অজ্ঞাত নহে। রে দুরাত্মন্! বৃকোদর! তোমাদের পঞ্চ ভ্রাতার জন্মকথাও লোকের অবিদিত নহে। ওরে মূর্খ! স্বাভাবিক দিব্য-কবচ-কুণ্ডল-মণ্ডিত, দিব্যলক্ষণান্বিত, সাক্ষাৎ দিবাকরতুল্য এ প্রদীপ্ত তেজোরাশি কর্ণ কি হীন আকর হইতে উৎপন্ন হইতে পারেন? মৃগী কি সিংহকে প্রসব করে? ইনি শুধু অঙ্গরাজ্যের নহেন, সসাগরা বসুন্ধরার সম্রাট্‌-সিংহাসনে বসিবার যোগ্য। এই

মহাবীর কর্ণ দণ্ডায়মান, আমি ইহাঁর আজ্ঞানুবর্ত্তী সহায়। এ সভায় কর্ণের প্রাধান্য ও উচ্চ সম্মান যাঁহার অসহ্য হয়, তিনি এই দণ্ডে শরাসন ধারণ পূর্ব্বক রথে বা পদচারে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হউন, আমি এই দণ্ডেই তাঁহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিব। রোষোন্মত্ত দুর্য্যোধনের ভয়ানক কথা শ্রবণ করিয়া রঙ্গমধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। সেই সময় দিবাকর অস্তাচলগামী হইলেন।

সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া, দুর্য্যোধন সাদরে কর্ণের হস্তধারণ পূর্ব্বক রঙ্গ হইতে প্রস্থান করিলেন। সহস্র সহস্র আলোক-ধারী পরিচারক ও সূত-মাগধ-বন্দিগণ তদীয় যশোগান করত তাহার অনুগমন করিল। দ্রোণ-কৃপাদির সহিত পাণ্ডবেরাও স্বস্থানে গমন করিলেন। জনসঙ্ঘ, কেহ অর্জ্জুনের, কেহ কর্ণের, কেহ বা ভীমের বীর্য্য প্রশংসা করিতে করিতে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। তদবধি দুর্য্যোধনের অর্জ্জুনজনিত ভীতি তিরোহিত হইল। যুধিষ্ঠিরও ভাবিলেন,—কর্ণের তুল্য ধনুর্দ্ধর দ্বিতীয় নাই। এইরূপে সহায়সাধনহীন কর্ণ স্বপৌরুষে সর্ব্বত্র কীর্ত্তিপতাকা উড্ডাসিত করিয়া, দিন দিন অলৌকিক বদান্যতায় ও পণ্যশীলতায়, জগতে পুণ্যশ্লোক 'দাতাকর্ণ' নামে খ্যাতি লাভ করিলেন। বিধিনির্বন্ধে তাঁহাকে অধার্ম্মিক দুর্য্যোধনের পক্ষ অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। কিন্তু সেই দৃঢ়ব্রত সত্যপ্রাণ বীর যখন ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া শপথ পূর্ব্বক অসময়ের মহোপকারী বন্ধু সুযোধনের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছেন, তখন মহাপ্রলয়েও আর তিনি সত্য হইতে বিচলিত হইতে

পারেন না। ইহাতে দৃষ্ট হয়, সত্যনিষ্ঠা ও আত্মত্যাগ কর্ণ-চরিত্রের প্রধান উপাদান। বিশেষতঃ কৃতজ্ঞতা গুণটী মহাত্মার চরিত্রের শীর্ষস্থানীয়।

পাণ্ডবগণের অজ্ঞাতবাসের সময় উপস্থিত হইলে, ভগবান্ মঘবা পাণ্ডবগণের প্রিয়চিকীর্ষু হইয়া চিন্তা করিলেন,—সূর্য্যতেজসম্ভূত, মহাপ্রভাব কর্ণই পাণ্ডবগণের অজেয় শত্রু। যাবৎ ইহার দেহে সূর্য্যদত্ত কবচ-কুণ্ডল থাকিবে, তাবৎ এ বীর ত্রিলোকীর অজেয় ও অবধ্য। অতএব কৌশলে ইহার কবচ-কুণ্ডল হরণ করিতে হইবে। সুরনাথ এইরূপ অভিসন্ধি করিয়া, একদা ছদ্মবেশে কর্ণের নিকট ভিক্ষার্থে গমন করিতে প্রস্তুত হইলেন। সূর্য্যদেব ত্রিদশপতির তাদৃশ অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, পূর্ব্বাহ্ণে কর্ণকে সতর্ক করিতে ইচ্ছা করিলেন। একদা কর্ণ নিশাশেষে জাগরিত হইয়া নিজ শয্যায় শয়ান আছেন, এমন সময় ভগবান্ প্রভাকর তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া, স্বরূপ প্রকটিত করিয়া, স্নেহমধুর বাক্যে কহিলেন,—বৎস কর্ণ! হে সত্যব্রত! বদান্যবর! তোমার হিত-কামনায় যাহা বলিতেছি, সাবধানে শ্রবণ কর। প্রাণান্তেও আমার কথার অন্যথাচরণ করিও না। পাণ্ডবহিতার্থী স্বয়ং সুরেশ্বর ত্বদীয় সর্ব্বনাশকামনায়, তোমার অবধ্যতাসাধন অভেদ্য কবচ-কুণ্ডল হরণ করিবার জন্য, ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণের বেশে তোমার নিকট উপস্থিত হইবেন। তিনি জানেন যে তুমি প্রাণান্তেও অন্যের নিকট ভিক্ষা কর না। কিন্তু তোমার নিকট আসিয়া যে ব্রাহ্মণ যাহা প্রার্থনা করেন, তুমি তাঁহাকে

তাহাই দান কর, যাচককে প্রত্যাখ্যান তোমার ধর্ম্ম নহে। তোমার এই অলঙ্ঘ্য সনাতন ব্রত সর্ব্বলোকবিদিত। তিনি তোমার নিকট আসিলে, তাহাকে আর সকলি দিও, কেবল তোমার জীবনস্বরূপ বর্ম্ম-কুণ্ডল দিও না। তুমি সুরেশ্বরকে অশেষ অনুনয় বিনয় করিয়া, সকলপ্রযত্নে আমার এই নিষেধবাক্য পালন করিও। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ সকলি প্রাণমূলেই অধিষ্ঠিত। এজন্য শাস্ত্রকারেরা সর্ব্বত্যাগ স্বীকার পূর্ব্বক আত্মাকে রক্ষা করিতে ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ করিয়াছেন। সঙ্কট-ঘটনার পূর্ব্বে হিতৈষী বন্ধুর বাক্য পালন করিলে, আর বিনষ্ট হইতে হয় না। দেখিও বৎস! সাবধান সাবধান! মহাগুরুর হিতবাণী লঙ্ঘন করিতে নাই। ভক্ত্যোপ্লাবিত কর্ণ সেই বাণী শ্রবণ করিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, হে ভগবন্! আপনি নিশ্চয় দ্বিজরূপী কোনও দেবতা হইবেন। কে আপনি? কৃপা করিয়া এ দাসকে বলুন।

ব্রাহ্মণবেশী সূর্য্য কহিলেন, বৎস! আমি লোকসাক্ষী স্বয়ং সূর্য্যদেব, তোমার জনক। অপত্যস্নেহে আকৃষ্ট হইয়া তোমার কল্যাণার্থে যাহা বলিলাম, তাহা কদাচ লঙ্ঘন করিও না। কর্ণ কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—অহো! আমার কি সৌভাগ্য! ভূতভাবন জগৎপ্রভু আপনি এ দাসের হিতান্বেষী হইয়া স্বয়ং আসিয়া আমার প্রাণরক্ষার উপায় বলিয়া দিলেন। হে বরদ! হে সর্ব্বসাক্ষিন! পরমারাধ্য পিতঃ! আমি কৃতাঞ্জলিপুটে কাতরভাবে শ্রীচরণে নিবেদন করিতেছি, আমি প্রাণান্তেও আমার ব্রত হইতে স্খলিত হইব না। আপনিও

কৃপা করিয়া এ দাসের ব্রতভঙ্গের চেষ্টা করিবেন না। সর্ব্বলোক-সুবিদিত আমার এ ব্রত আপনি অবশ্যই জানেন যে, আমি প্রাণান্তেও অর্থী ব্রাহ্মণকে প্রত্যাখ্যান করি না। কোনও ব্রাহ্মণ আসিয়া আমার জীবন লইতে চাহিলে,, আমি তদ্দণ্ডেই স্বহস্তে নিজ মুণ্ড ছেদন করিয়া দিতে কুণ্ঠিত নহি। আমি আপনার চরণ ধরিয়া অনুনয় করিতেছি, যদি এ সন্তানে আপনার যথার্থ স্নেহ থাকে, তবে এ বিষয়ে আর অনুরোধ করিবেন না। পুত্রের অনিত্য ভৌতিক দেহে নিরপেক্ষ হইয়া, তাহার অনশ্বর, পুণ্যময় যশঃশরীরে দয়াপ্রদর্শনই পিতার কর্ত্তব্য। সত্যভ্রষ্টের অক্ষয় পরমায়ু ও অনন্ত ঐশ্বর্য্যকে আমি অপদার্থ জ্ঞান করি। সত্যই আমার প্রাণ, সত্যপালনই আমার জীবনের মূলগ্রন্থি। সূর্য্যদেব কর্ণকে সত্যরক্ষায় অবিচলিত জানিয়া হতাশ হইয়া প্রস্থান করিলেন।

কর্ণের দৈনিক নিয়ম ছিল, তিনি প্রত্যহ প্রাতে নদীতে গিয়া স্নান করিতেন। স্নানান্তে উঠিয়া উর্দ্ধমুখে দণ্ডায়মান হইয়া, সূর্য্যমণ্ডলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তন্ময়হৃদয়ে সূর্যদেবের উপাসনা করিতেন। সেই সময় অসংখ্য যাচক ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষার্থী অন্যান্য দীন-দরিদ্রগণ আসিয়া উপস্থিত হইত। উপাসনান্তে তাঁহার যাচককে অদেয় কিছুই ছিল না। এইরূপে অহরহঃ তদীয় দান-পুণ্যের স্রোত অজস্র ধারায় প্রবাহিত হইয়া, অগণিত দীনদরিদ্রের দুঃখদারিদ্র্য বিদূরিত করিত। কোটি কোটি দীনহীনের কৃতজ্ঞ-হৃদয়োত্থিত জয়শব্দে দিগ্দিগন্ত মুখরিত হইত। অহো! এ নশ্বর জগতে ইহাই কি মানবের চরম সৌভাগ্য নহে?

নানাপ্রলোভনপূর্ণ ও অশেষবিঘ্নসঙ্কুল এ সংসারে ধর্ম্মরক্ষার জন্য—সনাতন কর্ত্তব্যপালনের জন্য যিনি যে পরিমাণে আত্ম-ত্যাগী, তাঁহার প্রকৃত মাহাত্ম্যও সেই পরিমাণে গণনা করা যায়। শ্রীকৃষ্ণ সন্ধিপ্রার্থনায় শেষবার কুরুসভায় গিয়া ভগ্ন-মনোরথ হইয়া প্রস্থানকালে, কর্ণের হস্তধারণ পূর্ব্বক নিজরথে তাঁহাকে বসাইলেন, এবং জনসম্বাধ হইতে দূরে তাঁহাকে লইয়া গিয়া গোপনে প্রীতিপূর্ণবচনে বলিলেন,—ভ্রাতঃ! রাধেয়! তুমি সুবিজ্ঞ ও বহুদর্শী। তুমি তত্ত্বদর্শী মনীষিগণের সেবা করিয়াছ। অসূয়াপরিশূন্য চিত্তে তুমি তত্ত্বার্থ শ্রবণ ও ধারণ করিয়াছ। সনাতন বেদবাদে ও সূক্ষ্ম ধর্ম্মতত্ত্বে তুমি পরিনিষ্ঠিত। দেখ। পুত্র কানীন বা সহোঢ় (১) হইলেও, সে ধর্ম্মতঃ তদীয় প্রসূতির পরিণেতারই পুত্র। ইহাই শাস্ত্রকারগণের মত। অতএব তুমি ধর্ম্মতঃ মহারাজ পাণ্ডুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। এস ভাই! তুমি এ সুবিশাল কুরুরাজ্যের সিংহাসনে অভিষিক্ত হও। দেখ! তোমার পিতৃপক্ষে মহাপ্রভাব পাণ্ডবগণ, এবং তোমার মাতৃপক্ষে পরাক্রান্ত যদুকুল। যুগপৎ এ দুই পক্ষই তোমার আজ্ঞাবহ হইবে। তাহা হইলে, প্রকৃতপক্ষে তুমিই অনন্ত-রত্নধরা সসাগরা বসুন্ধরার অদ্বিতীয় অধীশ্বর। আমি এখনি

---

(১) 'কানীন'—কন্যাবস্থার পুত্র। 'সহোঢ়'—গর্ভাবস্থায় পরিণীতার পুত্র। এ দুই পুত্রে পরিণেতার অধিকার।

"পিতৃবেশ্মনি কন্যা তু যং পুত্রং জনয়েদ্রহঃ।
তং কানীনং বদেন্নাম্না বোঢ়ুঃ কন্যাসমুদ্ভবম্॥"—(মনু)

তোমাকে সঙ্গে লইয়া গিয়া, তুমি যে ধর্ম্মরাজের জ্যেষ্ঠ সহোদর, এ কথা পাণ্ডবদিগকে জানাইব। এ কথা জানিবামাত্র ধর্ম্মভীরু, অজাতশত্রু, মহাত্মা যুধিষ্ঠির অনুজচতুষ্টয়ের সহিত তোমার পদানত হইবেন। কুমার অভিমন্যু, দ্রৌপদের পঞ্চ ভ্রাতা, পাণ্ডবপক্ষীয় সমস্ত রাজমণ্ডল ও রাজপুত্রগণ এবং অন্ধক-বৃষ্ণিকুলের সমস্ত বীরগণ কিঙ্করের ন্যায় সসম্ভ্রমে তোমার সেবায় নিযুক্ত হইবে। রাজন্যগণ ও রাজকন্যাগণ, সর্ব্বৌষধি-সর্ব্বতীর্থ-সলিলে ও সর্ব্বরত্নসম্ভারে তোমাকে সম্রাট্-সিংহাসনে অভিষিক্ত করিবে। আমি স্বয়ং তোমার মস্তকে রাজছত্র ধারণ করিব। স্বয়ং যুধিষ্ঠির তোমার আজ্ঞাবহ হইয়া তোমাকে হেমমণ্ডিত চামরদ্বারা বীজন করিবেন। ভীমবল ভীমসেন ক্রীতদাসের ন্যায় তোমার সেবায় নিযুক্ত থাকিবেন। স্বয়ং সর্ব্বাস্ত্রবজয়ী ধনঞ্জয় মণিকাঞ্চনোদ্ভাসিত, শ্বেতবাহনযুক্ত, স্বর্ণকিঙ্কিণীজালগ্রথিত দিব্য রথে তোমাকে বসাইয়া, স্বয়ং তোমার সারথ্য করিবেন। সমস্ত পাণ্ডব-পাঞ্চাল-যদুকুল প্রভৃতির ন্যায় আমি স্বয়ং তোমার সেবক হইব। অতএব হে মহাবাহো! তোমার অশেষকল্যাণপূর্ণ মদীয় উপদেশ গ্রহণ কর। এ ত্রিদিবদুর্লভ, সুরেশ্বরেরও কাঙ্ক্ষণীয় মহৈশ্বর্য্যে উপেক্ষা করিও না। সোদর পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হইয়া নিষ্কণ্টকে বসুধা-সাম্রাজ্য শাসন কর। পৃথিবীর সমন্তাৎ সমস্ত ভূপালবৃন্দ আজি সার্ব্বভৌম কর্ণের বিজয় ঘোষণা করুন। হে পৃথানন্দন! তুমি পাণ্ডবপরিবৃত হইয়া, নক্ষত্রপরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় মহাসাম্রাজ্য শাসন কর। তোমার জননী কুন্তীদেবীর হৃদয়ে পরমানন্দধারা

বর্ষণ কর। সোদরগণের সহিত মিলিত হও। সৌভ্রাত্রের ন্যায় অমূল্য ঐশ্বর্য্য ত্রিজগতে আর নাই। পাণ্ডবগণের সহিত কর্ণের সম্মিলন যে কর্ণের অতুলনীয় মহৈশ্বর্য্যলাভের একমাত্র পথ, এ কথা কর্ণকে তিনি সর্ব্বতোভাবে বুঝাইলেন। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণ অন্যায় বা অসত্য বলেন নাই। কর্ণ পাণ্ডবগণের সোদরও বটেন, এবং সর্ব্বজ্যেষ্ঠ বলিয়া তিনিই কৌরবরাজলক্ষ্মীর প্রকৃত অধিকারীও বটেন। কিন্তু সত্যবক্ষা-প্রতিজ্ঞাপালন কর্ণচরিত্রের অচ্ছেদ্য ও অভেদ্য বন্ধন। মহাপ্রলয়েও কর্ণ সত্য হইতে বিচলিত হইবার পাত্র নহেন। ধর্ম্মবীরেরা ধর্ম্মরক্ষার নিকট ত্রিলোকীর ঐশ্বর্য্যকেও তৃণজ্ঞান করেন, নিজের বা প্রাণাধিক স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের প্রাণও তাঁহাদের সত্যের তুলনায় অগণ্য। এজন্য অমেয়শক্তি স্বয়ং বাসুদেব নিজের সমগ্রশক্তি প্রয়োগ করিয়াও সে সত্যবীরকে দুর্য্যোধন-সখ্যরূপ প্রতিজ্ঞা-বন্ধ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে পারেন নাই।

যুধিষ্ঠির, ভীম ও সহদেবের সহিত কুরুক্ষেত্রে কর্ণের বারংবা ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। যুধিষ্ঠির, ভীম ও সহদেবকে কর্ণ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ক্ষমতাসত্ত্বেও তিনি তাঁহাদিগকে প্রাণে মারেন নাই। তাঁহাদিগকে বন্ধন পূর্ব্বক তিরস্কার করিয়াই ছাড়িয়া দেন। কর্ণ যদিও জানিতেন,— পঞ্চ পাণ্ডবের একটীর প্রাণসংহার করিলেই, আর চারিটী ভ্রাতা প্রাণত্যাগ করিবেন। কেননা, পঞ্চপাণ্ডব ভিন্ন দেহে একই প্রাণ। তথাপি অসমকক্ষ অর্থাৎ আপনা অপেক্ষা হীনবীর্য্যে প্রাণসংহারে নিজ বীরত্বে কলঙ্ক স্পর্শিবে, বলিয়াই তিনি বারংবা

উঁহাদিগকে হাতে পাইয়াও ছাড়িয়া দেন। পঞ্চ পাণ্ডবমধ্যে বীরশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুনকেই তিনি আপনার একমাত্র তুল্যকক্ষ জ্ঞান করিতেন, এজন্য অর্জ্জুন ভিন্ন আর কেহই তাঁহার বধ্য ছিল না।

মহাবীর রাধেয় সমরে অজেয় ও অবধ্য। এজন্য পঞ্চ পাণ্ডবের বিপদাশঙ্কার প্রধান স্থল কর্ণ। কুন্তী ও যুধিষ্ঠির ইহা জানিতেন। এজন্য উভয়েরি হৃদয়ে কর্ণজনিত আতঙ্ক সদাই দীপ্যমান। কর্ণভয়ে তাঁহারা অনুক্ষণ ঘোর অশান্তি অনুভব করিতেন। কুন্তী ভাবিতেন,—অর্জ্জুন কর্ণ হস্তে হত হইলে, আমার আর চারি পুত্রও সেই শোকে প্রাণত্যাগ করিবে। কারণ, পঞ্চ-পাণ্ডব ভিন্নদেহ হইয়াও একাত্মা ও একপ্রাণ। একের অভাবে অন্যের জীবনধারণ অসম্ভব। এই সকল বিবেচনা করিয়া, কুরু-ক্ষেত্র-মহাসমরের পূর্ব্বে কুন্তীদেবী কর্ণের সহিত গোপনে স্বয়ং দেখা করিয়া, তাঁহাকে স্বপক্ষে আনিতে সঙ্কল্প করিলেন। একদা কুন্তীদেবী একাকিনী অতি সঙ্গোপনে কর্ণের নিকট গমন করিলেন। মহাত্মা কর্ণ তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া সসম্ভ্রমে গিয়া তদীয় চরণতলে পতিত হইলেন, এবং তাঁহাকে প্রগাঢ় ভক্তিভরে যথাবিধি পূজা করিয়া, বরাসনে উপবেশন করাইয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন,—এ কি মা! আপনি স্বয়ং কষ্ট করিয়া এ দাসাধম সন্তানের নিকট আসিয়াছেন! অহো! আজি আমার জন্ম সার্থক! জানি না কত পুণ্য করিয়াছিলাম, তাই আজি মা! আপনার শ্রীচরণকমল দর্শন করিলাম। এক্ষণে কৃপা করিয়া বলুন—এ সন্তানকে আপনার কি প্রিয়কার্য্য করিতে হইবে। কর্ণকে দেখিয়া এবং তাঁহার

অমৃতায়মান ভক্তিসম্ভাষণ শুনিয়া, কুন্তীদেবীর অন্তরের চির-নিরুদ্ধ স্নেহ ও শোকাবেগ উচ্ছলিত হইল। তিনি আজন্ম-পরিত্যক্ত সেই বালারুণকান্তি, অপূর্ব্ব তেজঃপুঞ্জ, নিজগর্ভজাত তনয়রত্নকে দর্শন করিয়া, শোকে ও অনুতাপে উন্মাদিনী হইয়া, কর্ণের জন্মবৃত্তান্ত ও যে কারণে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাহা আদ্যোপান্ত বলিতে লাগিলেন। বলিবার সময় তিনি বারংবার সংজ্ঞা হারাইতে লাগিলেন, কর্ণও পরমযত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন। অনন্তর কুন্তী প্রকৃতিস্থা হইয়া কর্ণকে ক্রোড়ে লইয়া সাশ্রু-লোচনে কহিলেন,—বৎস! তোমার জননীর অপরাধ ক্ষমা কর! আমি তোমার জননী। হায়! অলঙ্ঘ্য দৈবনির্ব্বন্ধেই তোমাকে সে অশরণ দশায় ত্যাগ করিয়াছিলাম। তদবধি গভীর শোকানলে নিরবধি দগ্ধ হইতেছি। তোমার বালারুণ-তুল্য দেহলাবণ্য ও ফুল্লকমলতুল্য বদনমণ্ডল এ হতভাগিনীর অন্তরে অহর্নিশ জ্বলিতেছে। বৎস জীবনসর্ব্বস্ব! কন্যকা-বস্থায় সঙ্কটে পড়িয়াই তোমাকে ত্যাগ করিয়াছিলাম। তদবধি আমার মনের সুখশান্তি অন্তর্হিত। বৎস! অভাগিনী মার অপরাধ ক্ষমা কর! বলিতে বলিতে তিনি সংজ্ঞা হারাইলেন। কর্ণ বহু যত্নে তাঁহাকে তুলিয়া বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে বলিলেন—মা! সকলি বিধাতার লীলা। বিধিনিয়োগ দেবগণেরও অলঙ্ঘ্য। কি সাধ্য, ক্ষুদ্র নর মানব তাহার অন্যথাচরণ করে। এক্ষণে আমি আপনার কি কার্য্য করিব, আজ্ঞা করুন। নিজ সত্যধর্ম্মে অস্খলিত থাকিয়া আমি আপনার আজ্ঞাপালন করিব।

তখন কুন্তী বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে কহিলেন, বৎস! আমি অকালে পতিহীনা হইয়া ও নানা ভীষণ সঙ্কটে পতিত হইয়া, পাঁচটী পুত্রকে লইয়া প্রাণধারণ করিতেছি। আমার জীবদ্দশায় তাহাদের কাহারও অত্যাহিত ঘটিলে, বড় যাতনায় আমার প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইবে। বৎস! তাই আজি তোমার নিকট আমার পঞ্চ পুত্রের প্রাণভিক্ষা চাহিতেছি। হে বৎস! দানবীর! তোমার নিকট প্রার্থনা করিয়া কেহ কখনও ভগ্নমনোরথ হয় না। তুমি কি আজি তোমার এ দুঃখিনী জননীর করুণাপূর্ণ প্রার্থনা ভগ্ন করিবে? ইহা বলিয়া তিনি অজস্র অশ্রু মোচন করিতে লাগিলেন। মহাত্মা কর্ণ তৎক্ষণাৎ জননীর নয়ন মার্জ্জনা করত করযোড়ে বলিলেন, মাতঃ! এ দাসের নিবেদন শ্রবণ করুন। আপনার অনুরোধে আমি অর্জ্জুন ভিন্ন আপনার আর চারি পুত্রের বিষয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ অভয় দিতেছি। আমার প্রতিজ্ঞা অলঙ্ঘ্য। সমরে হয় অর্জ্জুনকে নিপাতিত করিব, না হয় অর্জ্জুনহস্তে নিহত হইব। ইহাতে আপনার পঞ্চপুত্রই জীবিত থাকিবে। সে পঞ্চ, হয় আমাকে লইয়া, না হয় অর্জ্জুনকে লইয়া। যুদ্ধে আমার হস্তে অর্জ্জুনের, বা অর্জ্জুনের হস্তে আমার নিধন অবশ্যম্ভাবী। মাতঃ! এ বিষয়ে এ দাসকে আর আপনি কোনও অনুরোধ করিবেন না। আমি মহাপ্রলয়েও সত্য হইতে চলিত হই না। ইহা বলিয়া সেই সত্যব্রত নরবীর জননীর চরণে বার বার প্রণাম করিয়া তাঁহাকে স্বগৃহে পাঠাইলেন।

কর্ণচরিতে এরূপ ও অন্যরূপ অসংখ্য ঘটনা দৃষ্ট হয়, যাহাতে তিনি অশেষ প্রলোভনে ও গুরুজনানুরোধে অণুমাত্র বিচলিত না

হইয়া অকুতোভয়ে ও অকুণ্ঠিত চিত্তে সত্যধর্ম্মের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছেন। শ্রেয়ই যাঁহার প্রেয়, কঠোর সত্যতেজ যাঁহার নিকট সুধামধুর, তিনিই পুরুষসিংহ। সত্যে, দানে, কৃতজ্ঞতায়, পরোপকারে, এক কথায় ধর্ম্মার্থে আত্মোৎসর্গে এ মহাপুরুষ অতুলনীয়। মহাদ্রিসকলকে উন্মূলিত করিয়া, সপ্তসিন্ধুকে উদ্বেলিত করিয়া, চতুর্দ্দশ ভুবনকে বিচূর্ণিত করিয়া মহাপ্রলয়-মারুত সমুত্থিত হইলেও, সত্যব্রত মহাপুরুষেরা নিজ নিজ ব্রতে অবিচলিত থাকেন।

অপ্রমেয়জ্ঞানমহোদধি, অকলিত শৌর্য্য-বীর্য্য-গাম্ভীর্য্য-ধৈর্য্য-তিতিক্ষা-সংযম-দয়াদি অশেষ গুণের অতুলনীয় আধার, মহাত্মা ভীষ্মদেবের নিকট দুর্য্যোধনাদি ও যুধিষ্ঠিরাদি সম্বন্ধতঃ তুল্য প্রেমাস্পদ হইলেও, তিনি মনে মনে ধর্ম্মপ্রাণ পঞ্চপাণ্ডবের পক্ষপাতী ছিলেন। কর্ণই দুর্য্যোধনের সমস্ত দুর্ম্মন্ত্রণার ও দুষ্কর্ম্মের সহায়, কর্ণের বাহুবীর্য্যেই দুর্য্যোধনের এত দূর স্পর্দ্ধা। অতএব কর্ণের তেজোবধ বা দর্পচূর্ণ করিতে পারিলেই, ধর্ম্মরাজের জয় হইবে। ইহা ভাবিয়া ভীষ্মদেব সর্ব্বদাই সর্ব্বসমক্ষে কর্ণের নিন্দা ও অর্জ্জুনের যশোগান করিতেন। কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের প্রারম্ভে ভীষ্ম সেনাপতিপদে অধিষ্ঠিত হইয়া কর্ণের নিন্দা করায়, কর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমার পরম শত্রু এই বৃদ্ধ কুরুক্ষেত্রে যাবৎ যুদ্ধ করিবে, তাবৎ আমি যুদ্ধ করিব না, বলিয়া তিনি আপন সৈন্য-সামন্ত লইয়া প্রস্থান করেন। প্রাণাধিক সখা দুর্য্যোধনের সহস্র সঙ্কটেও তিনি তদীয় সাহায্যে অগ্রসর হন নাই। কিন্তু প্রকৃত বীরমাত্রেই বীরের মর্য্যাদা জানেন ও সহস্র

শত্রুতা-সত্ত্বেও সে মর্য্যাদারক্ষণে পরাঙ্মুখ হয়েন না। কর্ণ যখন শুনিলেন,—সেই ভীষ্মরূপী মহাসূর্য্য, জগৎ আঁধার করিয়া শর-শয্যারূপ অস্তাচল আশ্রয় করিয়াছেন। তখন তিনি পূর্ব্ববৈর ও মনোমালিন্য বিস্মৃত হইয়া, হাহাকার করিতে করিতে দ্রুতবেগে আসিয়া সেই শরশয্যাশায়ী বীরবরের পদতলে পতিত হইয়া, করুণস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সাক্ষাৎ দেবসেনানী কার্ত্তিকেয়ের ন্যায় সেই মাহাত্মাকে তাদৃশ লোমহর্ষণ শোচনীয় দশায় পতিত দেখিয়া, শোকানলে কর্ণের অন্তরাত্মা দগ্ধ হইতে লাগিল। তিনি বালকের ন্যায় মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন, বারংবার তদীয় পদতলে পতিত হইতে লাগিলেন। বলিতে লাগিলেন,—হে মহাত্মন্! হে বীরকুলগৌরব! হে ক্ষমার ও ধৈর্য্যের মহার্ণব। হে জ্ঞানকল্পবৃক্ষ! হে সত্যধর্ম্মের আদর্শ! হে কুরুকুলের রক্ষক ও আশ্রয়! হে সর্ব্বত্যাগিন্ যোগীশ্বর! আপনি দেবদুর্লভ বীর্য্যমহিমায়, যশে ও নিজ অপূর্ব্ব পুণ্যতেজে দশদিক্ আলোকিত করিয়া, অস্তাচলে চলিলেন! হে বীরচূড়া-মণে! একবার নয়ন উন্মীলন করুন! আপনার চিরদ্বেষ্য হতভাগ্য কর্ণ আপনার পদতলে পতিত হইয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছে।

কর্ণের সেই কথা শ্রবণ করিয়া ভীষ্ম নিজ বলীসংবৃত লোচন-দ্বয় শনৈঃ শনৈঃ উন্মীলন করিয়া, তত্রত্য রক্ষিগণ ও অন্যান্য লোকদিগকে সে স্থান হইতে বিদায় দিয়া, প্রেমার্দ্রহৃদয় পিতা যেরূপ প্রাণাধিক পুত্রকে স্নেহনির্ভরে আলিঙ্গন করে, সেইরূপে কর্ণকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, পার্শ্বে বসাইয়া বলিলেন,—এস-এস! বৎস! এস! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি চিরদিন

আমার প্রতিকূলাচরণ করিয়াছ, আমার নিকট নিজ বীর্য্যের স্পর্দ্ধা করিয়াছ ; কিন্তু এ সময় যদি বৎস ! তুমি আমার নিকট না আসিতে, তবে নিশ্চয় তোমার অমঙ্গল হইত। বৎস ! তুমি কুন্তীদেবীর গর্ভজাত পুত্র। রাধা তোমার প্রসূতি নহেন, অধিরথও তোমার জনক নহেন। হে মহাবাহো ! আমি যোগীশ্বর দেবর্ষি নারদের ও সর্ব্বদর্শী ভগবান্ ব্যাসের নিকট তোমার আমূল জন্মবৃত্তান্ত শ্রবণ কবিয়াছি। এ কথা সম্পূর্ণ সত্য জানিও। আমি কেবল ধর্ম্মপ্রাণ পাণ্ডবগণের মঙ্গলকামনায় তোমার তেজোহানি করিবার জন্য তোমাকে পরুষবাক্য বলিতাম। হা বৎস ! তুমি অকৃতাপরাধ, ধর্ম্মৈকশরণ পাণ্ডবগণের প্রতি দুর্য্যোধনের লোমহর্ষণ অত্যাচারপরম্পরার প্রধান সহায়। এই জন্য কুরুসভায় তোমার প্রতি বিস্তর পরুষবাক্য প্রয়োগ করিয়াছি। তুমিই বৎস ! দুর্য্যোধনের সর্ব্বপ্রধান মিত্র, তুমিই তাহার বলবুদ্ধি ও ভরসা। সর্ব্বান্তঃকরণে তুমি চেষ্টা করিলে, তাহাকে সুপথে আনিতে পারিতে। তাহা হইলে, আজি এ ধনধান্যপূর্ণা, হৃষ্টপুষ্টজনাকীর্ণা, সুখশান্তিময়ী, সুষমাশালিনী বসুন্ধরা এ বীভৎস, মর্ম্মবিদারী ভ্রাতৃরুধিরে প্লাবিতা হইত না। অহহ ! বৎস ! বলিতে কি, এ দৃশ্যদর্শনে আমার প্রাণে যে বেদনা উপস্থিত, তাহার তুলনায় আমার এ রুধিরার্দ্রা শরশয্যাকে এবং আমার সর্ব্বাঙ্গে ও হৃদয়ে গাঢ়নিখাত শত শত অশনিতুল্য গাণ্ডীবীর এ শরপরম্পরাকেও আমি শিশিরবিন্দু জ্ঞান করি। হা বৎস ! এখনও যদি তোমরা এ সর্ব্বনাশকর ভ্রাতৃবিরোধে ক্ষান্ত হও, ধর্ম্মরাজকে যথোচিত রাজ্যভাগ দিয়া সন্ধি স্থাপন কর, আমার

প্রাণান্তের সঙ্গেই যদি এ বিরোধানল নির্ব্বাণ হয়, তবে এ শরশয্যায় এ যাতনায় আমাব প্রাণবিসর্জ্জন, আমার পরম সৌভাগ্য জানিও। হে বৎস! আমি তোমার অতুলনীয় ধৈর্য্য, বীর্য্য, সত্যনিষ্ঠা, ব্রহ্মনিষ্ঠা এবং অলৌকিকী বদান্যতার ও উদারতার বিষয় সম্পূর্ণ জ্ঞাত আছি। হে দেবোপম পুরুষরত্ন! তোমার তুল্যকক্ষ মহাত্মা বীরপুরুষ ভূলোকে নাই। তুমি একাকী পৃথিবীর সমস্ত বাজমণ্ডলকে পরাজয় পূর্ব্বক দুর্য্যোধনের অধীনস্থ করিয়া দুর্য্যোধনের মহাযজ্ঞের সহাযতা কবিয়াছ (১)। তোমার প্রতি আমার চিরনিরূঢ় বৈর আজি তিরোহিত হইল। তুমি একাধারে শ্রীকৃষ্ণ ও ধনঞ্জয়ের সমান। হে বৎস! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মপ্রাণ ও পরিণামদর্শী। তুমি যথাবিধি আচার্য্যের ও বেদ-ব্রহ্মের উপাসনা করিযাছ। এ ভ্রাতৃবৈরের পরিণাম কিরূপ হৃদয়বিদারক শোকাবহ, তাহা বুঝিতেছ। হে অরিসূদন! পাণ্ডবেরা তোমারি সহোদর। এ মুমূর্ষু হিতৈষী বৃদ্ধের অন্তিম বাক্য বক্ষা

(১) রাজসূযে পাণ্ডবৈশ্বর্য্যে অসূয়াপরবশ দুর্য্যোধন, পাণ্ডবগণের বনবাসকালে গন্ধর্ব্বহস্তে সসৈন্যে পরাভূত ও বন্দীভূত হইয়া যৎপরোনাস্তি নির্বেদপ্রাপ্ত হন। অনন্তর তিনি কর্ণের পরামর্শে এক মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। প্রিয়বন্ধুর মনোরথসিদ্ধির জন্য কর্ণ একাকী একরথে দিগ্বিজয় পূর্ব্বক, পাঞ্চাল, কাম্বোজ, অম্বোষ্ঠ, কৈকয়, গান্ধাব, বিদেহ প্রভৃতি নানা দেশের ভূপালগণকে দুর্য্যোধনের অধীনস্থ করিয়াছিলেন, এবং সেই দিগ্বিজয়ে প্রভূত অর্থ আনয়নপূর্ব্বক দুর্য্যোধনকে দিয়াছিলেন, স্বয়ং এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। দুর্য্যোধন সেই অর্থেও প্রভূতে মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন।

কর! যদি এ সময় আমার প্রিয়কার্য্য করিতে চাও, তবে আজি এ পুণ্যতীর্থ কুরুক্ষেত্র, শ্রবণভৈরব সমর-রবের পরিবর্ত্তে ভ্রাতৃ-সদ্ভাবের আনন্দরবে উচ্ছলিত হউক। অসংখ্য মহাপ্রাণীর এ ভীষণ শোণিতস্রোত, রাজমণ্ডলের ও প্রজামণ্ডলের মহোৎসব-ধারায় পর্য্যবসিত হউক। এইরূপ বলিতে বলিতে সেই অস্তোন্মুখ বীরকুলসূর্য্য নীরব হইলেন।

কর্ণ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, হে মহাত্মন্! হে সর্ব্বলোকপূজিত বীররত্ন! হে ত্রিকালদর্শিন্! প্রজ্ঞানসিন্ধো! মহাভাগা কুন্তীদেবী আমার জননী, ইহা জ্ঞাত আছি। ইহাতে সংশয় নাই। কিন্তু আমি জন্মমাত্র জননী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া সূতদম্পতী কর্ত্তৃক পালিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছি। আমি নিতান্ত অসহায় ও নিরাশ্রয় অবস্থায় যাহার বন্ধুত্বলাভ করিয়া যাহার অবিচ্ছিন্ন মহোপকারপরম্পরায় বর্দ্ধিত হইয়াছি; যাহার কল্যাণে রাজপদ, ধন-জন-সহায়-সাধন-খ্যাতি-প্রতিপত্তি-প্রভাব, আমার সকলি; আমি সপরিবার এত দিন যাহার ঐশ্বর্য্য ভোগ করিলাম; আমার সেই মহোপকারী, প্রাণাধিক বন্ধুকে এই ঘোরতর সঙ্কটকালে পরিত্যাগ করিলে, লোকে আমাকে নিরতিশয় ভীরু, কৃতঘ্ন ও কাপুরুষ বলিবে। হে মহাভাগ! আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া, আমার দেহ-মন-প্রাণ-পুত্র-কলত্র-যশ সকলি সুযোধনের কার্য্যে উৎসর্গ করিয়াছি। হে জ্ঞাননিধে! ব্যাধিজনিত মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের শ্লাঘার কথা নহে। রণক্ষেত্রে শত্রুহস্তে প্রাণবিসর্জ্জন ক্ষত্রিয়ের শ্লাঘার কথা। সুযোধনকে আশ্রয় করিয়া আমি অহরহঃ পাণ্ডবগণের চিত্তে বিষম বৈরানল প্রজ্বলিত করিয়াছি। অতএব আর আমার সুযোধনকে

ত্যাগ করিয়া পাণ্ডবপক্ষে ফিরিবার সম্ভাবনা নাই। হে সর্ব্বদর্শিন্ মহাভাগ! এ বিধিনির্ব্বন্ধকে পুরুষকার দ্বারা নিবর্ত্তিত করা কাহারও সাধ্য নহে। আপনি সভামধ্যে বলিয়াছিলেন, এ সময় চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর অসংখ্য লোকক্ষয়সূচক ঘোর দুর্নিমিত্তসকল যুগপৎ উপস্থিত। নিশ্চয় এ জ্ঞাতিবৈরে মহামারি সংঘটিত হইবে। ভবাদৃশ সিদ্ধপুরুষের বাণীব অন্যথা নাই। আমি ভগবান্ বাসুদেবের ও পাণ্ডবগণের প্রভাব জ্ঞাত আছি। তাঁহারা অজেয় বলিয়াই, তাঁহাদের বিজয়ার্থ আমাব অধিকতর উৎসাহ। এ বৈর পরিহাব কবিবার শক্তি আমার নাই। আমাকে যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় জানিয়া, আপনি প্রসন্নচিত্তে ধনঞ্জয়েব সহিত আমাব যুদ্ধে অনুজ্ঞা দান করুন। আপনার প্রসাদ লাভ কবিলে, আমি অবশ্যই জয়ী হইব, আমার বিশ্বাস। হে দয়াবীব! ক্ষমানিধে! আমি ভবাদৃশ ভুবনপূজিত মহাগুরুর প্রতি যে সকল পরুষবাক্য প্রয়োগ করিযাছি, তাহা কৃপা করিয়া ক্ষমা করুন।

ভীষ্ম কহিলেন, বৎস! তুমি যদি একান্তই এ সুদারুণ বৈর ত্যাগ করিতে না পাব, তবে অনুজ্ঞা কবিতেছি, তুমি স্বর্গকামনায় যুদ্ধ কর। শুদ্ধ বাজার প্রতি কর্ত্তব্যবোধেই যুদ্ধ করিও। দ্বেষ-হিংসাদি দ্বারা প্রণোদিত না হইয়া এবং কোনও অন্যায্য বা অবৈধ উপায় আশ্রয় না করিয়া, ধর্ম্মযুদ্ধে যত দূর যোগ্যতা দেখাইতে পার, তাহা করিও। বৎস! তুমি যুদ্ধে নিহত হইলেও, ক্ষত্রধর্ম্মোচিত পুণ্যলোকে গমন করিবে। নিরহঙ্কারচিত্তে, নিজ বলবীর্য্যকেই আশ্রয় করিয়া, জয়-পরাজয়ে সমবুদ্ধি হইয়া যুদ্ধ কর। ধর্ম্মযুদ্ধেই ক্ষত্রিয়ের অধিকার। দেখ!

বৎস! আমি উভয় পক্ষে শান্তিস্থাপনের জন্য, যত দূর সাধ্য, চেষ্টা করিলাম। হায়! কিছুতেই আমার এ প্রয়াস সফল হইল না!

মহামতি গাঙ্গেয় এই কথা বলিয়া মৌনাবলম্বন করিলে, কর্ণ রোদন করিতে করিতে বারংবার তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন। অনন্তর রথারোহণে দুর্য্যোধনশিবিরে গমন করিলেন।

অলৌকিক মহাপুরুষগণের জন্ম হইতে মরণ পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাই অলৌকিক। সকল কার্য্যই অপূর্ব্ব মহিমায় উদ্ভাসিত। এই অদ্ভুত তেজোরাশির নির্ব্বাণ যেরূপে সাধিত হইয়াছিল, তন্মাত্র উল্লেখ করিয়াই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে, কর্ণবীর একমাত্র অর্জ্জুনকেই নিজ সমকক্ষ জ্ঞান করিতেন। বস্তুতঃ বলে, বীর্য্যে ও পরাক্রমে, সাধনায় ও দিব্য শক্তির উপার্জ্জনে উভয়েই প্রায় তুল্য ভাগ্যবান্। একপক্ষে, অর্জ্জুন কঠোরতপস্যালব্ধ শিবদত্ত পাশুপত, দ্রোণদত্ত ব্রহ্মশির, খাণ্ডবদাহতর্পিত অগ্নিদেবের প্রসাদীকৃত অক্ষয় তূণ সহ অপ্রমেয়-শক্তিশালী গাণ্ডীব শরাসন, ইন্দ্রাদি-প্রদত্ত অলৌকিক দিব্যাস্ত্র-সম্প্রদায় লাভ করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে, মহাবীর কর্ণও স্বকীয় কঠোর সাধনাবলে ভগবান্ ভার্গবের নিকট 'বিজয়' নামক দিব্য শরাসন (১) ও অসংখ্য দিব্যাস্ত্রজাল লাভ করিয়াছিলেন। অর্জ্জুন

(১) কর্ণের ধনুর নাম 'বিজয়।' উহা বিশ্বকর্ম্মা ইন্দ্রের জন্য নির্ম্মাণ করেন। উহা সর্ব্বদৈত্যবিজয়ী। ইন্দ্র উহা পরশুরামকে দান করেন। উহার সাহায্যেই পরশুরাম বারংবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করেন। পরশুরাম উহা ভক্ত শিষ্য কর্ণকে দিয়াছিলেন।

সুরপতি ইন্দ্রের নিকট দিব্যজ্যোতির্ম্ময় কিরীট (১), বর্ম্ম, কুণ্ডল প্রভৃতি সুদুর্লভ বস্তু লাভ করেন। কর্ণও তাঁহার জনক সূর্য্যদেবের প্রসাদে অক্ষয় কবচে ও দিব্য কুণ্ডলদ্বয়ে দেদীপ্যমান। গাণ্ডীবীর পাশুপতের ন্যায় কর্ণের নিকটেও অর্জ্জুনসংহারার্থ অমোঘ 'একঘ্নী' শক্তি রক্ষিত ছিল (২)। অর্জ্জুন যেমন দিগ্বিজয় পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ ধর্ম্মরাজের রাজসূয় যজ্ঞের সহায়তা করেন। বীরবর কর্ণও সেইরূপ, দিগ্বিজয় পূর্ব্বক নানা দেশের রাজমণ্ডলকে দুর্য্যোধনের অধীনস্থ করিয়াছিলেন। এইরূপ কর্ণ ও অর্জ্জুন উভয় বীরের বলবীর্য্য-শিক্ষাদি-বিষয়ে অনেকটা সমকক্ষতা থাকিলেও, একটা সর্ব্বপ্রধান ও মৌলিক বিষয়ে উভয়ে স্বর্গ-মর্ত্ত্য-প্রভেদ। তাহা এই যে, একজন অধর্ম্মপক্ষ, অপর ধর্ম্মপক্ষ। যুদ্ধারম্ভের অব্যবহিত পূর্ব্বে এ পার্থক্য, সর্ব্বার্থদর্শী, প্রাজ্ঞতম আচার্য্যগণ কর্ত্তৃক সূচিত হইয়াছিল। যখন কুরুক্ষেত্রে উভয় পক্ষের বীরমণ্ডলী চতুরঙ্গিণী

---

(১) এ কিরীট মস্তকে থাকিলে সর্ব্বত্র বিজয় লাভ হয়। ইহা ধারণ করায় অর্জ্জুন কিরীটী নামে প্রখ্যাত।

(২) এই 'একঘ্নী' শক্তি যাহার উদ্দেশে নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহাকেই তৎক্ষণাৎ সংহার করিবে। কর্ণ অর্জ্জুনবধের জন্যই এ অমোঘ অস্ত্র যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রসমরে একদিন হিড়িম্বাগর্ভ-জাত ভীমসেন-তনয় ঘটোৎকচ এরূপ ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, যে, সে যুদ্ধে কৌরবপক্ষের একটীরও প্রাণরক্ষার আশা ছিল না। তাই, কর্ণকে সেই অমোঘা একঘ্নী শক্তি ঘটোৎকচের প্রতি নিক্ষেপ করিতে হইয়াছিল। কৌরবপক্ষে এ সঙ্কট না ঘটলে, নিশ্চয় কর্ণহস্তে অর্জ্জুনের নিধন হইত।

সেনায় সুসজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান; ক্ষণকাল সকলেই নিঃশব্দ ও স্তম্ভিত; যুদ্ধারম্ভসূচক সঙ্কেতধ্বনি উত্থিত হইবামাত্র, এককালে কোটি বজ্র ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ক্ষণমাত্রেই সেই সুবিশাল পুণ্যক্ষেত্র নররুধিরধারায় প্লাবিত হইবে। এই সুজলা, সুফলা, হৃষ্টপুষ্টজনাকুলা ভারতভূমি বীভৎসদর্শন, অশিব শবকঙ্কালে সমাচ্ছন্না হইবে। কোটি কোটি গৃহে পতি-পুত্র-ভ্রাতৃ-বন্ধু প্রভৃতি প্রাণাধিক স্বজনগণের বিয়োগ-শোকে আকাশভেদী হাহাকার সমুত্থিত হইবে। যে সময় সকলেই তথায় নিরুদ্ধশ্বাসে ও স্ফীতবক্ষে দণ্ডায়মান। সেই ঘোর রৌদ্র মুহূর্ত্তে দৃষ্ট হইল, ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির রথ হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি গললগ্নীকৃতবাসে নতশিরে ও কৃতাঞ্জলিপুটে শনৈঃ শনৈঃ শত্রুসেনাভিমুখে চলিয়াছেন। তাঁহার আর কোনও দিকে দৃক্‌পাত নাই। যথায় ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য রথোপরি বিরাজমান, তিনি নিঃশব্দে তথায় গমন করিলেন। ধর্ম্মরাজকে তখন সে ভাবে আসিতে দেখিয়া, বীরমণ্ডলী বিতর্ক করিতে লাগিলেন, নিশ্চয় যুধিষ্ঠির অভেদ্য রিপুবাহিনীদর্শনে ভীত হইয়াছেন এবং রাজ্যকামনা ত্যাগ করিয়া, সমর-পরিহার-প্রার্থনায় আগমন করিতেছেন। তাঁহাকে সমাগত দেখিয়া ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপ রথ হইতে অবতরণ করিলেন। তিনি যথাক্রমে ঐ তিন গুরুর পদতলে পতিত হইয়া যুক্তকরে ও সাশ্রুনয়নে তাঁহাদের চরণে যুদ্ধানুমতি প্রার্থনা করিলেন। যথাক্রমে তাঁহারাও যুধিষ্ঠিরকে স্নেহভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া, বলিলেন, এস! এস! কুরুকুলসর্ব্বস্ব! এস! এস! আমাদের প্রাণাধিক! ধর্ম্মরাজ! তোমার মঙ্গল হউক। তুমি যদি এ সময় এ ভাবে

আমাদের নিকট না আসিতে, নিশ্চয় তোমার অমঙ্গল হইত। পূজ্যপূজার ব্যতিক্রমে মানবের শ্রেয় বিঘ্নিত হয় (১)। হে গুরুভক্ত! ধর্ম্মপ্রাণ! ধর্ম্মরাজ! তোমার জয় হউক, এ পুণ্য-শ্লোক কুরুকুলে ধর্ম্মের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হউক। "যতোধর্ম্ম স্তুতো জয়ঃ"।—যে পক্ষে ধর্ম্ম, সেই পক্ষে ঈশ্বর; যে পক্ষে ঈশ্বর, সেই পক্ষেই জয়, ইহা অনন্তকাল অবিকারী সত্য (২)।

অতএব কোনও কোনও বিষয়ে অর্জ্জুনাপেক্ষা কর্ণোৎকর্ষ অধিক হইলেও, দৈবনির্বন্ধে কর্ণ অধর্ম্মপক্ষরূপ অদৃঢ় ও অস্থায়ী ভিত্তির উপর দণ্ডায়মান। কূলঙ্কষা স্রোতস্বতীর কূলে প্রদীপ্য-মানা, রত্নজালোদ্ভাসিতা সৌধাবলীর ন্যায় অধর্ম্মমূলে প্রতিষ্ঠিতা লক্ষ্মী, আপাতরম্যা হইলেও, শেষে সমূলে বিনষ্ট হয়। পক্ষান্তরে, ধর্ম্মের আলোক শান্ত, স্নিগ্ধ, মধুর ও পাবন। উহা স্তিমিতভাবে জ্বলে, অথচ নির্ব্বাণ হয় না। উহা যে গৃহে জ্বলে, শুধু তাহাকেই আলোকিত করে না, উহার প্রভাবে শুচি-অশুচি, আব্রহ্ম-চণ্ডাল সকল মানব, সকল জীব, সকল পদার্থ ধূতপাপ ও নির্ম্মলীকৃত হয়। এই জন্যই, অজেয় ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপ-কর্ণাদি অপার্থিব শক্তি-শাল বীরগণের সহায়তাসত্ত্বেও, দুর্য্যোধন নির্ম্মূল হইয়াছিলেন।

(১) "প্রতিবধ্নাতি হি শ্রেয়ঃ পূজ্যপূজাব্যতিক্রমঃ"—(রঘুবংশ)—পূজনীয়ের পূজার ব্যতিক্রম হইলে, লোকের অমঙ্গল ঘটে।

(২) "যতো ধর্ম্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততোজয়ঃ।
জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ॥"
(মহাভারত)—

অহো! যেরূপ শোচনীয় ভাবে কর্ণের নিধন হয়! সে অনলকে নির্ব্বাণ করিতে পাণ্ডবগণকে যেরূপ বিসদৃশ, নৃশংস উপায অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে অতীব পাষাণ-চিত্তকেও দ্রব হইতে হয়।

রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত প্রাচীন কালের যুদ্ধে দেখা যায়, রথীর অপেক্ষা সারথির প্রাধান্য অধিক। কেন না, প্রকৃত পক্ষে সারথিহস্তেই রথীর জয়-পরাজয় ও জীবন-মরণ। দেশ-কাল-পাত্র-ভেদে সারথির রথচালনাবৈচিত্র্য বিজয়লাভের প্রধান সহায়। এ জন্য লঙ্কা-সমরে ও অন্যান্য দেবাসুরসংগ্রামে স্বয়ং মহেন্দ্রসারথি দিব্যপ্রভাব মাতলি সারথ্যে নিযুক্ত। এই জন্যই স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনরথের সারথি। ভীষ্ম-দ্রোণের পতনের পর দুর্য্যোধন এককালে হতাশ হইয়াছিলেন। তাঁহার মিত্ররত্ন কর্ণ তাঁহাকে সান্ত্বনা ও অভয় দানে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন, পরদিন তিনি সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইয়া এরূপ যুদ্ধ করিবেন যে, সে মহাপ্রলয়ে অরাতিকুল নির্ম্মূল হইবে। কিন্তু উপযুক্ত সারথির প্রয়োজন। নরপতি শল্য, রথীর ও সারথির উভয় কার্য্যেই সুদক্ষ এবং বীরগণনায় প্রধান বলিয়া পূজিত। কিন্তু তাঁহাতে একটা বিশেষ আশঙ্কার কথা; তাহা এই যে, শল্য মনে মনে পাণ্ডবপক্ষ তিনি প্রথমে পাণ্ডবপক্ষ গ্রহণ করিতেই গিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার অসহ্য দাম্ভিকতায় বিরক্ত হইয়া পাণ্ডবেরা তাঁহাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তাই তিনি কৌরবপক্ষে নিযুক্ত হইয়া অস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। কিন্তু এখন আর সে সকল বিচারের অবসর নাই। নিশাশেষেই যখন সারথি চাই, তখন শল্য ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই।

কিন্তু শল্য ঘোর কর্ণদ্বেষী। তাহা সত্ত্বেও অগত্যা তাঁহাকেই সারথি করিতে হইল। যথাবিধি সুসজ্জিত হইয়া উভয়ের যুদ্ধযাত্রাকালে পরস্পর তুমুল কলহ উত্থিত হইল। শল্য কর্ণের তেজোবধ করিবার জন্য অতি বীভৎস ভাষায় কর্ণকে লাঞ্ছনা করিতে লাগিলেন ও বিভীষিকা দেখাইতে লাগিলেন। ঠিক যে মুহূর্ত্তে পরস্পরের একপ্রাণতা আবশ্যক, ঠিক সেই সময়েই উভয়ে পরস্পরের মরণাকাঙ্ক্ষী। অগত্যা সেই অবস্থায় কর্ণকে যুদ্ধ করিতে হয়। কর্ণের শেষ যুদ্ধের দিন তাঁহার সারথি শল্য তাঁহাকে যমালয়ে পাঠাইতে একপ্রকার কৃতনিশ্চয় হইয়াই, তাঁহাব প্রতি প্রতিকূলতার পবাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু কর্ণ অটল অচল, তিনি তখন তাদৃশ সারথিব সাহায্যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ হইয়া নিজ বীর্য্য ও দৈবের উপর নির্ভর করিলেন। তিনি বজ্রনাদে শল্যকে বলিলেন,—

"ন হি কর্ণঃ সমুদ্ভূতো ভয়ার্থমিহ মদ্রক।

বিক্রমার্থমহং জাতো যশোঽর্থঞ্চ তথাত্মনঃ॥" (মহাভারত)

—হে মদ্ররাজ! এ ধরাতলে কর্ণ ভীত হইবাব জন্য জন্মগ্রহণ করে নাই। আমি বিক্রমপ্রকাশেব জন্য এবং যশোরক্ষাব জন্যই জন্মিয়াছি। তিনি রণক্ষেত্রে অভেদ্য ব্যূহ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক যে কয় দিবস যুদ্ধ করেন, সেই কয় দিন কুরুক্ষেত্রে মহামারী উপস্থিত হয়, এবং শত্রুপক্ষে অগণিত সেনা ও সেনানী নিপতিত হয়। যে দিন কর্ণার্জ্জুনের শেষ যুদ্ধ, সে দিন কর্ণ যুদ্ধারম্ভে প্রতিজ্ঞা করিলেন,—আজি হয় ধরণী কর্ণহীনা, না হয় অর্জ্জুনহীনা হইবে। ফলতঃ, তদীয় অদ্ভুত শস্ত্রজালে দশদিক্ সমাচ্ছন্না ও ত্রিলোকী

কম্পমানা হইয়াছিল। সে দিন পাণ্ডবপক্ষে প্রধান প্রধান বীর-মণ্ডলী সহ অগণিত হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, ধূলিসাৎ হইয়াছিল। কর্ণ ও ধনঞ্জয় উভয়ের অবিচ্ছিন্ন সাংঘাতিক শস্ত্রধারাবর্ষণে জগৎ প্রলয় গণনা করিল। শেষে উভয়েই হতসৈন্য হইয়া দ্বৈরথ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। উভয় পক্ষেরই হতাবশিষ্ট সৈন্যেরা স্তম্ভিত হইয়া সে যুদ্ধ দেখিতে লাগিল। কর্ণ যখন দেখিলেন, তাঁহার সৈন্য-সামন্ত সকলেই পলাযমান, সে সময তাঁহার সারথি শল্যও তাঁহার প্রতি বিলক্ষণ প্রতিকূলতা করিতেছেন, তখন তিনি একটী অমোঘ সাংঘাতিক দিব্য অস্ত্র গ্রহণ করিলেন। উহা দানব, মানব, যাহারই উপর নিক্ষিপ্ত হইবে, তাহারই প্রাণ সংহার করিবে। সে সঙ্কটে তিনি অর্জ্জুনবধের নিমিত্ত মন্ত্রপূত করিয়া সেই বাণ কার্ম্মুকে যোজনা করিলেন। অলক্ষ্যে একটা ভীষণ আশীবিষ সেই বাণে আসিয়া আবির্ভূত হইল। অর্জ্জুন খাণ্ডবদাহকালে সেই সর্পের পরিবারবর্গকে ভস্মসাৎ করিয়াছিলেন। সর্প এক্ষণে পূর্ব্ববৈর স্মরণ করিয়া অর্জ্জুনের প্রাণসংহার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া, সেই বাণমধ্যে আবির্ভূত হইল। সন্ধানমাত্র সেই শর হইতে লোমহর্ষণ বিষাগ্নির জ্বালা উত্থিত হইতে লাগিল। যুগপৎ কৌরবপক্ষে তুমুল আনন্দের রোল ও পাণ্ডবপক্ষে হাহাকার পড়িয়া গেল। কিন্তু "ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকং"—জয়রূপী ধর্ম্ম ধর্ম্মরাজেরই পক্ষে। অর্জ্জুনসারথি শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বনাশ দেখিয়া, দুই হস্তে রথ চাপিয়া ধরিয়া, সচক্র রথের কিয়দংশ ভূগর্ভে নিমজ্জিত করিলেন। রথ আজানু-পরিমাণ ভূগর্ভে নিহিত হওয়ায়, সেই অব্যর্থ বাণ অর্জ্জুনের দেহে না লাগিয়া, তদীয় ইন্দ্রদত্ত, ত্রিলোকীদুর্লভ, অমূল্য কিরীট ও

শিরস্ত্রাণ ছিন্ন করিয়া ভূপাতিত করিল। সেই দিব্য-ভাস্বর কিরীটরত্ন ভূতলে পতিত হইয়া খণ্ডীকৃত সূর্য্যের ন্যায় রণভূমিকে প্রদীপ্ত করিল। অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভূতলে নামিয়া দুই হস্তে ধরিয়া ভূগর্ভপ্রোথিত রথচক্র উদ্ধার করিলেন। সেই ভীষণ আশী-বিষ-বাণ এইরূপে প্রথমোদ্যমে শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে ব্যর্থপ্রযত্ন হইয়া, পুনরপি কর্ণসমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিল, আপনি আমাকে পুনরায় অনুমন্ত্রিত করিয়া শরাসনে যোজিত করুন। এবার কিরীটীর প্রাণসংহার না করিয়া নিবৃত্ত হইব না। কিন্তু কর্ণ ঘৃণা-সহকারে বলিলেন,-- "কর্ণ যে বাণ শরাসন হইতে একবার নিক্ষেপ করিয়াছে, সে উচ্ছিষ্ট বাণ, সে দ্বিতীয়বার স্পর্শ করে না।" অনন্তর প্রবলতম বেগে সর্ব্বশক্তি-সহকারে দুই পক্ষে লোমহর্ষণ অস্ত্রসংঘর্ষণ হইতে লাগিল। সেই অদৃষ্টচর ভয়ঙ্কর সমর দর্শনার্থ সমাগত ভূচর, অন্তরীক্ষচর, মানব-দানব-গন্ধর্ব্ব, দেবগণ ও তত্রত্য বীরমণ্ডলী হইতে বারংবার "ধন্য ধন্য ধনঞ্জয়! ধন্য বীর বৈকর্ত্তন!" ইত্যাদি গগনভেদী কোলাহল উত্থিত হইল। স্বয়ং কৃষ্ণই অর্জ্জুনকে বলিলেন,—"এ ধরণীতলে একমাত্র কর্ণই তোমার তুল্যকক্ষ অথবা তোমা হইতেও শ্রেষ্ঠ।" ঠিক্ সেই লোমহর্ষণ সঙ্কট-মুহূর্ত্তে ব্রহ্ম-শাপে কর্ণের গুরুদত্ত দিব্যাস্ত্রসকল অদৃশ্য হইল। "ছিদ্রেষনর্থা বহুলীভবন্তি"—অবশ্যম্ভাবী ব্যসনে অনর্থের উপর অনর্থ, এরূপে অনর্থপরম্পরাই বর্দ্ধিত হয়। আবার ঠিক্ সেই সময়ে ধরণীদেবী কর্ণের রথচক্র পূর্ণ গ্রাস করিলেন। কর্ণ সেই অভাবনীয় ঘোর সঙ্কটে অর্জ্জুনকে অনুনয় করিয়া কহিলেন,—হে বীর! আমি বিষমাবস্থায় পতিত, ক্ষণকাল যুদ্ধে বিরত হউন, আমি রথচক্র

উদ্ধার করিয়া যুদ্ধ করিতেছি। যুদ্ধকালে বিষমে পতিত প্রতিদ্বন্দ্বীর উপর শস্ত্রক্ষেপ করা বীরধর্ম্ম নহে। আপনি ত্রিলোকীবিদিত ধার্ম্মিক বীরপুরুষ, প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি এ বীরধর্ম্ম রক্ষা করুন, বলিতে বলিতে অকস্মাৎ মহাশব্দে কর্ণের সমস্ত রথ ভূগর্ভে নিমগ্ন হইল। তখন কর্ণের নয়নে অশ্রু দৃষ্ট হইল! তিনি পুনরায় কৃষ্ণার্জ্জুন উভয়কে নিজ আকস্মিক সঙ্কটাবস্থা জানাইয়া, কিয়ৎক্ষণের জন্য যুদ্ধের বিরাম প্রার্থনা করিলেন। বলিলেন, দেখুন! দৈবযোগে আমার রথ মহীগ্রস্ত। হে পার্থ! এ সময় আমাকে শরপ্রহাররূপ কাপুরুষোচিত অভিসন্ধি বিসর্জ্জন করুন। হে পার্থ! যুদ্ধে যে ব্যক্তি বিস্রস্তকেশবেশ, ধনুর্ব্বাণবিরহিত, ভ্রষ্টকবচ, ত্যক্তশস্ত্র, শরণাগত, যাচমান, কৃতাঞ্জলি ও যুদ্ধবিমুখ হয়, বীরেরা সেরূপ বৈরীর উপর প্রাণান্তেও শস্ত্রমোচন করেন না। আপনি জগতে অপ্রতিম ধর্ম্মবীর বলিয়া খ্যাত। আপনি সমরধর্ম্মসকলে অভিজ্ঞ। হে বীর! যাবৎ আমি ভূগর্ভ হইতে রথ না উদ্ধার করিতেছি, তাবৎ অপেক্ষা করুন। আমাকে ক্ষণমাত্র ক্ষমা করুন। রথস্থ হইয়া ভূমিষ্ঠকে বধ করা ভবাদৃশ বীরের অযোগ্য। হে পাণ্ডবেয়! আমি বাসুদেবকে বা আপনাকে ভয় করি না। কেবল এই আকস্মিক দৈবসঙ্কটজন্যই এ প্রার্থনা করিতেছি। আপনি ক্ষত্রিয়-সন্তান, মহাবংশের অবতংস। অতএব ধর্ম্মোপদেশ স্মরণ করিয়া মুহূর্ত্তমাত্র আমাকে ক্ষমা করুন। কর্ণের সেই সকল কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে রাধেয়! আজ বড়ই শুভাদৃষ্ট! যে, তোমার মুখে ধর্ম্মের কথা শুনিলাম। নীচাশয় লোকেরাই ব্যসনে নিমগ্ন হইয়া দৈবকে নিন্দা করে, নিজ কুকার্য্য স্মরণ করে

না। রাধেয়! আজি তুমি অনন্যোপায় হইয়া আমাদিগকে বীরধর্ম্ম স্মরণ করাইতেছ। নরাধম! যখন তোমরা রোরুদ্যমানা, একবস্ত্রা, নিরপরাধা, অশ্রুমুখী, কুলকামিনী দ্রুপদনন্দিনীকে কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক সভামধ্যে আনিয়া, তাঁহার প্রতি লোমহর্ষণ অত্যাচার কবিয়াছিলে, তখন তোমাদের বীরধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তোমাদের মন্ত্রণায় দুরাত্মা শকুনি অক্ষক্রীড়ানভিজ্ঞ অজাতশত্রুকে কপট দ্যূতে পরাজিত করিয়া, পাণ্ডবগণকে ঘোর দুঃখসাগরে নিক্ষেপ করিয়াছিল, তখন তোমাদের বীরধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন তোমরা ভীমসেনকে মিষ্টান্নের সহিত হালাহল ভোজন করাইয়া, তাহার অচেতন দেহ অতল জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তখন তোমাদের বীরধর্ম্ম কোথায় ছিল? যখন জতুগৃহে জননীর সহিত পঞ্চপাণ্ডবকে দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে, তখন বীরধর্ম্মের কথা স্মরণ হয় নাই? ওহে কর্ণ। যে মুহূর্ত্তে তোমরা সতী-নিগ্রহ করিয়া রাজসভায় মহাদম্ভে ও মহোল্লাসে নৃত্য করিয়াছিলে. সেই মুহূর্ত্তেই তোমরা সমূলে নিহত হইয়াছ, এ কুরুক্ষেত্র-সমর তাহারি পুনরভিনয়মাত্র। ওহে কর্ণ! যখন তোমরা সমস্ত রথী, মহারথী ও সমস্ত সৈন্য মিলিয়া, পাণ্ডবকুলসর্ব্বস্ব শিশু অভিমন্যুকে যুগপৎ বেষ্টনপূর্ব্বক, অদৃষ্টচর ও অশ্রুতপূর্ব্ব পাপময় নিষ্ঠুরতম উপায়ে হত্যা করিয়া, পিশাচের ন্যায় চিৎকার ও নৃত্য করিয়াছিলে, তখন বীরধর্ম্মের কথা স্মরণ হয় নাই? বীরধর্ম্মের কথা যদি সে সকল সময়ে একটীবারও স্মরণ না করিয়া থাক, তবে এখন মৃত্যুকালে শুষ্কতালুকায় 'ধর্ম্ম-ধর্ম্ম' করিয়া আর প্রলাপে ফল কি? তুমি এখন

যতই ধর্ম্মের দোহাই দাও না কেন, আজি গাণ্ডীবীর হস্তে তোমার পরিত্রাণ নাই।

কর্ণ বাসুদেবের সেই সকল কথা শুনিয়া লজ্জায় মস্তক নত করিলেন। আর কৃষ্ণের দিকে চাহিতে পারিলেন না, কোনও উত্তর দিতেও পারিলেন না। কিন্তু ক্রোধে তাঁহার ওষ্ঠ স্ফুরিত হইতে লাগিল। নয়নদ্বার হইতে যেন অনলশিখা বাহির হইতে লাগিল। তিনি ভূগর্ভে মগ্নপ্রায় সেই ভগ্নরথেই কোনওরূপে উপবিষ্ট হইয়া, ঘোর সমরানল জ্বালিলেন। কর্ণের সুদুঃসহ শস্ত্রজালে পার্থকে বিহ্বল দেখিয়া, শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে ধনঞ্জয়! সর্ব্বনাশ উপস্থিত! এ কর্ণ কালান্তক কাল! এখন তোমার সাধনালব্ধ দিব্যাস্ত্র-প্রয়োগের সময়। দেখ! সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যে হাহাকার পড়িয়াছে। আর বিলম্ব করিলে, সর্ব্বসংহার হইবে। তখন ধনঞ্জয় রৌদ্রমূর্ত্তি ধারণ করিলেন। সেই ক্রুদ্ধ বীরকেশরীর সমস্ত লোমকূপ হইতে অনলশিখার ন্যায় তেজঃপুঞ্জ নিষ্ঠ্যূত হইতে লাগিল। উভয় বীরের লোমহর্ষণ শস্ত্র-সংঘর্ষে ঘন ঘন বিদ্যুৎপুঞ্জের জ্বালাবলী উদ্ভূত হইয়া দিগ্দাহ করিতে লাগিল। কুরুক্ষেত্রের সমস্ত বীর চিত্রপুত্তলিকার ন্যায় নিস্পন্দ দণ্ডায়মান। সশৈলসিন্ধু-কাননা ধরণী মুহুর্মুহুঃ কম্পমানা। যেন সৃষ্টিসংহারের জন্য প্রলয়-পবন বহিতে লাগিল। দশদিক্ ধূলিপটলে সমাচ্ছন্না। যেন ভয়ঙ্করী কালরাত্রি উপস্থিত। উভয় সৈন্যেই তুমুল হাহাকার উঠিল। কর্ণবাণে অর্জ্জুন বিচলিত হইলেন। তিনি বিঘূর্ণিত ও শ্লথহস্ত হইলেন, তদীয় হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্খলিতপ্রায়। অর্জ্জুনকে বিচেতনপ্রায় দেখিয়া, সেই সুযোগে কর্ণ, ধরাগর্ভে নিমগ্ন নিজ

রথচক্রকে উদ্ধার করিবার জন্য রথ হইতে লম্ফ দিয়া পড়িলেন, এবং কনকস্তম্ভসদৃশ বিশাল ভুজদ্বয়ে রথচক্র ধারণ পূর্ব্বক প্রাণপণ যত্নে উদ্ধারের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু "প্রতিকূলতামুপগতে হি বিধৌ বিফলত্বমেতি বহুসাধনতা,"—বিধাতা প্রতিকূল হইলে, মনুষ্যের অশেষ সাধনা ব্যর্থ হইয়া যায়। তিনি কিছুতেই রথচক্র তুলিতে পারিলেন না।

এদিকে কিরীটী সংজ্ঞা লাভ করিয়া, দণ্ডাহত ফণীর ন্যায় রোষে ঘনঘন শ্বাস মোচন করত, কর্ণ-বিনাশের নিমিত্ত সাক্ষাৎ যমদণ্ডস্বরূপ—অমোঘ দিব্যাস্ত্র ধারণ করিলেন। তাহার প্রভাপুঞ্জে দিঙ্মণ্ডল ঝলসিতে লাগিল। সে দুর্নিরীক্ষ্য ও দুঃসহ অস্ত্রতেজে সকলেই নয়ন মুদ্রিত করিল। যোগী-ঋষিরা অকালে প্রলয় গণিয়া, জগতের শান্তিকামনায় "স্বস্তি—স্বস্তি" বলিয়া আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন। সেই সময় সেই আসন্নমৃত্যু বীরের অবশিষ্ট রথভাগও মহাশব্দে ভূগর্ভে অদৃশ্য হইল। সে কর্ণরথ একটী অপূর্ব্ব বস্তু! তাহা শ্রেষ্ঠ শিল্পিগণের বহু সাধনায় নির্ম্মিত। তাহা দুর্লভ ও অমূল্য হীরকাদি রত্নজালে ও বিচিত্র সৌবর্ণ ও মৌক্তিক কারুকার্য্যে উৎখচিত। তাহা যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভূত হইবার সময়, সকলের জ্ঞান হইত, যেন, অরুণোদয়বেলায় বালারুণ চতুর্দ্দিকে প্রতপ্ত-কনক-ভাস্বর করনিকর বিকীর্ণ করিয়া উদীয়মান। সকলে চমকিত হইয়া দেখিল, যেমন অস্তোন্মুখ অরুণ-ভাস্কর শনৈঃ শনৈঃ নীলাম্বুধিগর্ভে প্রবেশ করে, তেমনি সেই জ্যোতির্ম্ময় কর্ণরথ ভূগর্ভে বিলীন হইল! শ্রীকৃষ্ণ সেই সময়, কর্ণোপরি কৃতসন্ধান সেই অমোঘ দিব্যায়ুধ মোচন করিতে অর্জ্জুনকে আদেশ করিলেন।

সব্যসাচী সমাহিত চিত্তে সেই বাণকে প্রণামপূর্ব্বক অনুমন্ত্রিত করিলেন। অমনি সেই দিব্যায়ুধ শত শত বজ্রের তেজোরাশি উদ্গিরণ করিতে লাগিল। পুনরায় বসুন্ধরা থর থর কাঁপিয়া উঠিল। সুরাসুর-নর চৈতন্য হারাইল। পুনরায় ঋষিমণ্ডলী হইতে "স্বস্তি-স্বস্তি" নাদ উত্থিত হইল। তখন ধনঞ্জয় নিজ গাণ্ডীব শরাসনকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে দিব্যশক্তিধারিন্ গাণ্ডীব! যদি আমি সমাহিত চিত্তে গুরুসেবা করিয়া থাকি, যদি ঈশ্বরের প্রীতিকামনায় কঠোর তপস্যা করিয়া থাকি, যদি জ্ঞাতি-বন্ধু-গুরুজনের প্রতি আমার অকপট প্রীতি ও ভক্তি থাকে, যদি অকৈতবে হিতৈষী সুহৃদগণের উপদেশ পালন ও ধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষণ করিয়া থাকি, তবে সেই সত্যে ত্বদীয় মৌর্ব্বী-বিমুক্ত এই দিব্য বাণ কর্ণশত্রুকে নিপাতিত করুক। ইহা বলিয়া তিনি হুহুঙ্কারনাদে সেই অমোঘ শস্ত্র কর্ণের কণ্ঠ লক্ষ্য করিয়া মোচন করিলেন। সেই অমিতবীর্য্য দিব্যাযুধ তেজশ্ছটায় দশদিক্ প্রজ্বলিত করিয়া কর্ণের মস্তক ছেদন পূর্ব্বক ভূমিতলে পাতিত করিল। তৎক্ষণাৎ কর্ণদেহ হইতে এক অপূর্ব্ব তেজোরাশি উত্থিত হইয়া সূর্য্যমণ্ডলে বিলীন হইল। দিবাকর যেন সে সাংঘাতিক দৃশ্য দেখিতে অক্ষম হইয়াই অস্তাচলে প্রস্থান করিলেন। সকলে সবিস্ময়ে দেখিল, যেন মধ্যাহ্নের মার্ত্তণ্ডমণ্ডল অকস্মাৎ রক্তাক্তকলেবর হইয়া ভূতলে নিপতিত হইয়াছে। তৎক্ষণাৎ দিঙ্মণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া তুমুল বিজয়তূর্য্যনির্ঘোষ পাণ্ডবপক্ষে উত্থিত হইল। গভীর শোকান্ধকারে ও গগনভেদী হাহাকারে কৌরবপক্ষ নিমগ্ন হইল!

এইরূপে কর্ণবীরের তিরোধান হইয়াছিল। কর্ণ শেষদিনের যুদ্ধে যে বীর্য্য দেখাইলেন, তাহা অতুলনীয়। কিন্তু সে তাঁহার ভৌতিক বীর্য্য বলিয়া, কেহ তাহা সগৌরবে গণনা করে না। তাঁহার সে ভৌতিক বীর্য্য, তদীয় ভৌতিক দেহের সঙ্গেই পঞ্চভূতে লয় পাইয়াছে। জগতের লোক তাঁহাকে 'যুদ্ধবীর' কর্ণ বলিয়া পূজা করে না। তিনি অভৌতিক সত্য-ধর্ম্ম-দান-পুণ্যের প্রভাবে, দীনত্রাণমহাব্রতের মহিমায় ধরাতলে যে অক্ষয়া কীর্ত্তিরূপা জয়-বৈজয়ন্তী বিদ্যোতিত করিয়া গিয়াছেন, লোকে তাহাই গণনা করিয়া, তাঁহাকে "**দাতাকর্ণ**" নামেই পূজা করিয়া থাকে।

"দিবং স্পৃশতি ভূমিং চ শব্দঃ পুণ্যস্য কর্ম্মণঃ।
যাবৎ স শব্দো ভবতি তাবৎ পুরুষ উচ্যতে॥"

(মহাভারত)

—পুণ্যের ধ্বনি ভূলোক ও দ্যুলোককে ব্যাপ্ত করে। সে ধ্বনি যাবৎ এ ধরাতলে বিদ্যমান থাকে, তাবৎ সেই পুণ্যকর্ম্মা 'পুরুষ'—নামে কীর্ত্তিত হন। পৌরুষই পুরুষের লক্ষণ। সে পৌরুষ,—সত্যে-ধর্ম্মে-দয়ায় প্রতিষ্ঠিত।

কর্ণচরিতের পরিশিষ্ট।

কুন্তীর ও কর্ণের জন্মবিবরণ।

যদুশ্রেষ্ঠ বসুদেবের পিতার নাম শূর। শূরের কন্যা কুন্তী-দেবী। বসুদেব ও কুন্তী সোদর-সোদরা। শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের (কুন্তীর সোদরের) পুত্র বলিয়া, কুন্তী কৃষ্ণের পিতৃস্বসা। কথিত আছে, কুন্তীর পিতা শূর আপন কন্যা কুন্তীকে নিজ পিতৃস্বস্রীয় ভ্রাতা, অপুত্র কুন্তীভোজ রাজাকে কৃত্রিম পুত্রিকা-রূপে দান করিয়াছিলেন। উক্ত পালক পিতা, কুন্তীভোজের নামানুসারে পাণ্ডবমাতা 'কুন্তী' নামে খ্যাতা। কুন্তীর প্রকৃত নাম 'পৃথা'। এজন্য পাণ্ডবেরা 'পার্থ' ও 'কৌন্তেয়' ইত্যাদি নামে পরিচিত। কুন্তী বাল্যে পিত্রালয়ে সদাই ভক্তিপূর্ব্বক অতিথি-ব্রাহ্মণাদির পরিচর্য্যায় নিযুক্তা থাকিতেন। তিনি একদা মহাপ্রভাব মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে আতিথ্যে পরিতুষ্ট করায়, দুর্ব্বাসা তাঁহাকে একটী মন্ত্র দান করেন। বলিয়া দেন, দৈবঘটনায় তুমি অপুত্রা হইলে, পতিকুলরক্ষার্থ এই মন্ত্রপ্রভাবে পুত্ররত্নলাভ করিবে। এই মন্ত্র দ্বারা তুমি যে দেবতাকে স্মরণ করিবে, তাঁহার প্রভাবেই তত্তুল্য প্রভাবশালী পুত্ররত্ন লাভ করিবে। অথচ তদ্দারা তোমার কন্যাধর্ম্মের বা সতীত্বের হানি নাই (১)।

---

(১) কথিত আছে, মহাপ্রভু যীশুখ্রীষ্ট কুমারী মেরির গর্ভে উদিত হইয়াছিলেন। ফলতঃ মহাপুরুষগণের জন্ম ও কর্ম্ম প্রায় অলৌকিক দৈবঘটনাবলীপূর্ণ।

কুন্তী কন্যাবস্থায় মন্ত্রপরীক্ষারূপ কুতূহলের বশবর্ত্তিনী হইয়া, সূর্য্যদেবকে স্মরণ করায়, সূর্য্যের আবির্ভাবমাত্রে কুন্তী সম্ভাবিত-পুত্রা হইলেন। এইরূপে তাঁহার কন্যকাবস্থায় কর্ণের জন্ম। কুন্তী কলঙ্কভয়ে সদ্যঃপ্রসূত তেজঃপুঞ্জ শিশুকে গোপনে একটী প্যাত্রীব মধ্যে রাখিয়া. তাহা নদীজলে নিক্ষেপ করেন। দৈব-ঘটনায অধিরথ নামক এক সূতজাতীয় ব্যক্তি নদীজলে ভাসমান পাত্রীটী উদ্ধার করিয়া, তন্মধ্যে অপূর্ব্ব তেজঃপুঞ্জ নবপ্রসূত শিশুটীকে পাইয়া, বাধানাম্নী নিজ পত্নীকে প্রদান করেন। সূতজাতায পিতা-মাতার পালিত পুত্র বলিয়া, কর্ণ 'সূতনন্দন' নামে খ্যাত। তদীয় পালিকা মাতার নাম 'রাধা'। এজন্য তিনি 'রাধেয়' নামে অভিহিত। ভগবান্ সূর্য্যদেবের প্রসাদে তিনি জন্মাবধি অভেদ্য কবচে ও দিব্য জ্যোতির্ম্ময় কুণ্ডলদ্বয়ে সমলঙ্কত ছিলেন। ঐ কবচ-কুণ্ডল যাবৎ তাঁহাব দেহে থাকিবে, তাবৎ তিনি ত্রিলোকীর অজেয় ও অমর, এ কথা তিনি জানিতেন। জানিয়াও তাহা অম্লানমুখে অঙ্গ হইতে উন্মোচন করিয়া ছদ্মরূপী ইন্দ্রকে দান করেন।

কর্ণচরিত পর্য্যালোচনা করিলে দৃষ্ট হয়, এ জগতে পুরুষ-কারেরই জয়। পুরুষকার মানবমহত্ত্বের মুলসূত্র। সেই পুরুষ-কার, আত্মশাসন বা সংযমসাধনার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই, নহিলে ঘোর অনর্থের নিদান হয। অনেকে প্রভূত বিদ্যা ও প্রতিভা লাভ করিয়াও, একমাত্র সংযমগুণের অভাবে নিজের ও পরিবারবর্গের জীবন ঘোর অশান্তিময় করেন। লোকসমাজও তাঁহাদের নিকট বিস্তর আশা করিয়া শেষে হতাশ হইয়া থাকে।

ঔৎসুক্য, উৎকণ্ঠা, আবেগ, উল্লাস, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতির প্রবল কারণপরম্পরা সত্ত্বেও, যিনি আত্মজয়ী, তিনিই বীর। যাঁহার অত্যুন্নত হৃদয়, সংসারের অজস্র প্রলোভন ও বিকাররাশি ভেদ করিয়া, সৌরকরোদ্ভাসিত, অভ্রভেদী সুমেরুশৃঙ্গের ন্যায় ধর্ম্মতেজে প্রদীপ্ত, তিনিই বীর, তিনিই নরসিংহ, তিনিই নরোত্তম। বাহ্য পদার্থের প্রবল প্রলোভন মানুষকে আত্মশাসনে অশক্ত করে। যিনি সেই প্রলোভনকে পদদলিত করেন, তাঁহার শিক্ষা ও দীক্ষা, তাঁহার জন্ম ও কর্ম্ম সার্থক।

একমাত্র কৃতজ্ঞতানুরোধে সত্যরক্ষায় কর্ণকে অসৎপক্ষ অবলম্বন করিতে হইয়াছিল। এ বড় কঠিন সমস্যা, আত্মপরীক্ষার এরূপ সঙ্কটস্থল আর দেখা যায় না। সত্যরক্ষার্থে আত্মত্যাগের প্রতিকূল প্রবলতম কারণপরম্পরায় তিনি বিজড়িত। তথাপি তিনি সত্যরক্ষানুরোধে ঘোরশত্রুহস্তে নিজ অমূল্য জীবনরত্নকে, তৃণ লোষ্টাদিবৎ অম্লানচিত্তে বিসর্জ্জন করিলেন। ইহা কি তাঁহার প্রাণবির্জ্জন? কখনও নহে; বীরের ইহাই ত প্রাণরক্ষা। সত্য-ধর্ম্ম-কীর্ত্তি বীরের প্রাণবায়ু। সেই সত্যপ্রাণ মহাপ্রাণ বীরপুরুষ কর্ণ। যতকাল এ জীবলোকের অস্তিত্ব, ধর্ম্মবীরের পুণ্যকীর্ত্তি ততকাল অক্ষুণ্ণ। তদীয় অভৌতিক পুণ্য-শরীর অনন্তদেবে মিলিত হইয়া, অনন্তভাবে পরিণত হয়।

ধর্ম্মব্যাধ-কথা।

মহাভারতীয় এই পুণ্য উপাখ্যানের অবতরণিকা এইরূপ ;—একদা বনবাসী যুধিষ্ঠির মহর্ষি মার্কণ্ডেয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! এ সংসারে গৃহস্থাশ্রমই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, এ কথা সর্ব্বশাস্ত্রকারেই একবাক্যে স্বীকার করেন। কেননা, এই আশ্রমই একাধারে সর্ব্বজীবের উপজীব্য, অন্যান্য আশ্রমের প্রাণবায়ু ইহার উপর প্রতিষ্ঠিত। কিরূপ নিয়ম পালন করিলে এ বিশ্বজীবন, শ্রেষ্ঠ আশ্রমে সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ করা যায়? আমার বিবেচনায় মানবের পক্ষে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর ও প্রয়োজনীয় কথা। আপনি কৃপা করিয়া ইহা কীর্ত্তন করুন।

মার্কণ্ডেয় কহিলেন,—তুমি আমাকে প্রকারান্তরে স্ত্রী-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতে বলিতেছ। কেননা, নারীর শিক্ষা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও পুণ্যশীলতার মূলেই এ বিশাল লোকসমাজ প্রতিষ্ঠিত। লোকসমাজের হৃদয় ও প্রাণবায়ু নারীগণ। নারীর সাহায্য বিনা নিমেষমাত্রও লোকসমাজ বাঁচিতে পারে না। অতএব তোমাকে একটী প্রকৃত নারীরত্নের কথা বলি, শুন।—

এক ব্রাহ্মণ ছিলেন, তিনি তপস্বাধ্যায়নিরত ও ধর্ম্মশীল; তাঁহার নাম কৌশিক। তিনি অকালে সংসারাশ্রম পরিহার পূর্ব্বক কোনও বিজন অরণ্যে গিয়া, বেদ, বেদাঙ্গ ও উপনিষদ্ প্রভৃতি পাঠ করিতেন। একদা তিনি বৃক্ষমূলে বসিয়া বেদপাঠ করিতেছিলেন। বৃক্ষের শাখায় এক বক বসিয়াছিল। বক

ব্রাহ্মণের মস্তকে পুরীষত্যাগ করায়, তিনি রোষারুণ নেত্রে সেই বককে দর্শন করিবামাত্র, বক দগ্ধকলেবর হইয়া ভূতলে পতিত হইল। তদ্দর্শনে ব্রাহ্মণ অনুতপ্ত হইলেন। ভাবিলেন,—হায়! হঠাৎ রোষের বশবর্ত্তী হইয়া বড়ই দুষ্কর্ম্ম করিলাম! তিনি বহুক্ষণ অনুশোচনা করিয়া, ভিক্ষার্থে নির্গত হইলেন। তখন মধ্যাহ্ন-কাল, আহারের সময়। তিনি বনভূমি অতিক্রম করিয়া, কোনও গ্রামে এক গৃহস্থের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখিলেন, এক নারী বসিয়া ভোজনপাত্রাদি মার্জ্জন করিতেছেন। ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিলেন। নারী কহিলেন, একটু অপেক্ষা করুন, ভিক্ষা দিতেছি। এমন সময়, তাঁহার পতি সুদূরপর্য্যটনে অতিমাত্র পরিশ্রান্ত ও ক্ষুৎপিপাসায় মৃতকল্প হইয়া, গৃহে উপস্থিত হইলেন। রমণী পতিকে তদবস্থ দেখিয়া, অতিথির কথা বিস্মৃত হইয়া, সসম্ভ্রমে গিয়া তাঁহাকে পাদ্য ও আসনাদি প্রদানপূর্ব্বক বসাইলেন ও তন্ময়ভাবে বীজনাদি দ্বারা তাঁহার শ্রান্তি দূর করিতে লাগিলেন। তিনি প্রত্যহ পতিকে আহার না করাইয়া নিজে জলস্পর্শ করিতেন না। তিনি পতির পাত্রের প্রসাদমাত্র ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। তিনি ভাবিতেন, পতিই আমার ঐহিক ও পারত্রিক গতি ও মুক্তি, পতিই আমার চরম সৌভাগ্য, পতিই আমার সহায় ও সাধন, পতিসেবাই আমার অদ্বৈত ব্রত। এজন্য তিনি সর্ব্বতোভাবে ও সর্ব্বপ্রযত্নে কায়-মনোবাক্যে পতির প্রিয়হিতে নিরতা থাকিতেন। তদীয় সদাচার, শৌচ, দাক্ষিণ্য, পতিভক্তি, অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিবেশিবর্গের কল্যাণসাধন, দীন-দরিদ্র-আতুর-অতিথি-অভ্যাগতগণের প্রতি

অকৃত্রিম প্রেম ও করুণা প্রভৃতি গুণে সে প্রদেশের মানবমাত্রেই তাঁহাকে দয়াময়ী দেবী বলিয়া পূজা করিত।

তিনি কিয়ৎক্ষণ পতিশুশ্রূষা করত, অতিথির কথা স্মরণ করিলেন। অতিথি ভিক্ষার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন, তাঁহাকে ভিক্ষা দিতে বিলম্ব হইল, ভাবিয়া মনে মনে কুণ্ঠিতা হইলেন। অনন্তর অপরাধিনীর ন্যায় দীনভাবে ভিক্ষা লইয়া তাঁহাকে দিতে গেলেন। ভিক্ষার্থী ব্রাহ্মণ, বিলম্ব হওয়ায়, অতিমাত্র রুষ্ট হইয়া বলিলেন, রে দুর্বিনীতে! তোমার এ কি ব্যবহার? তুমি আমাকে ভিক্ষা দিতেছি বলিয়া, ভিক্ষা না দিয়াই কার্য্যান্তরে ব্যস্ত হইলে? আমি অতিথি ব্রাহ্মণ। অগ্রে আমার সম্মান রাখিলে না।

ব্রাহ্মণকে ক্রোধে অগ্নিমূর্ত্তি দেখিয়া সাধ্বী তাঁহাকে কাতর বাক্যে সান্ত্বনা পূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, ভগবন্! দয়া করিয়া এ অবলাকে ক্ষমা করুন। পতিই আমার আরাধ্যতম দেবতা, তাঁহাকে নিতান্ত শ্রান্ত-ক্লান্ত দেখিয়া, ব্যগ্রতা বশতঃ ক্ষণকাল ভিক্ষা দিতে বিস্মৃত হইয়াছিলাম। আপনি জ্ঞানী ও ক্ষমাশীল। অবলার অপরাধ ক্ষমা করুন। আমি কাতরচিত্তে শ্রীচরণে ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি। দাম্ভিক ব্রাহ্মণ সেই সুশীলা নারীর তাদৃশ করুণাপূর্ণ অনুনয়েও শান্ত না হইয়া অধিকতর রোষভরে কহিলেন, অহো! ব্রাহ্মণ তোমার নিকট শ্রেষ্ঠ না হইয়া, পতিই শ্রেষ্ঠ হইলেন! তুমি গৃহস্থধর্ম্মে থাকিয়া ব্রাহ্মণের অবমান করিলে! যিনি ত্রিলোকীর অধিপতি ইন্দ্র, তিনিও সসম্ভ্রমে ব্রাহ্মণের চরণে নতশীর্ষ হইয়া থাকেন। রে দর্পান্ধে!

তুমি কি জান না? বা বিজ্ঞ লোকের নিকটেও কি শুন নাই, যে, সাক্ষাৎ অগ্নিতুল্য ব্রাহ্মণেরা রোষানলে পৃথিবীকে দগ্ধ করিতে পারেন।

ব্রাহ্মণের তাদৃশ দম্ভপূর্ণ সরোষ বাক্য শ্রবণে সেই নারী অণুমাত্র ভীত না হইয়া, বরং অধিকতর ধীর ও প্রশান্ত ভাবে বলিলেন,—হে দেব! দীপ্ততেজা, ধীমান্ ব্রাহ্মণগণের প্রভাব আমি জ্ঞাত আছি। তাঁহারা ইচ্ছা করিলে সকলি করিতে পারেন। শুনিয়াছি, দণ্ডকারণ্য অগ্রে সমৃদ্ধ সাম্রাজ্য ছিল, ঋষি-শাপেই উহা মহারণ্যে পরিণত হইয়াছে; ব্রহ্মশাপেই সমুদ্রজল অপেয় লবণোদকে পরিণত হইয়াছে। দুরাত্মা বাতাপি প্রভৃতি দুর্জ্জয় রাক্ষসেরা ব্রহ্মর্ষি অগস্ত্যের শাপে নিহত হইয়াছে। তেজস্বী ব্রাহ্মণগণের এরূপ বহুতর প্রভাবের কথা শুনিয়াছি। হে ব্রহ্মন্! ভূদেবগণের ক্রোধ ও প্রসাদ, উভয়ই সুবিপুল, কিন্তু দেব! অবলাজনের এ ত্রুটি আপনার ক্ষমা করা উচিত। পতি-সেবাই আমার প্রিয়তম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। ইহাই সর্ব্বাগ্রে পালনীয়। ভর্ত্তা আমার দেবতারও দেবতা, আরাধ্যতম ঈশ্বর ভাবিয়া, একান্ত ভাবে পতিসেবা করিয়া থাকি। অণুক্ষণ পতি-সেবায় আমি যে আনন্দ, যে তৃপ্তি উপভোগ করি, তাহার নিকট আমার স্বর্গ-মোক্ষও নগণ্য। আপনারা শাস্ত্রজ্ঞ, ধর্ম্মোপদেষ্টা ব্রাহ্মণ, আপনারাই নারীর পতিসেবাকেই সর্ব্বাগ্রে করণীয় বলিয়া উপদেশ দিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ সতীর তাদৃশ সানুনয় ও যুক্তিযুক্ত বাক্যে শান্ত না হইয়া, ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া, বারংবার তাঁহার প্রতি আরক্ত লোচনে

দৃষ্টিপাত করায়, সেই নারী ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, ও ঠাকুর! আমি বক নহি। আপনার ও ক্রোধদৃষ্টিতে আমার বিন্দুমাত্র অনিষ্টের আশঙ্কা নাই। দেখুন! আমার পতিশুশ্রূষার প্রভাব দেখুন! আপনি বিজন কাননে কোপানলে বক দগ্ধ করিয়াছেন, আমি তাহা না দেখিয়া ও না শুনিয়া জানিতে পারিয়াছি। আপনি বক দগ্ধ করিয়াছেন, অতএব আমাকেও দগ্ধ করিবেন, ইহা মনেজ্ঞানেও স্থান দিবেন না। যে পবনবেগে বৃক্ষ উন্মূলিত হয়, তাহাতে মহীধর বিচলিত হয় না। অতএব আপনি শান্ত হইয়া এ সেবিকার পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন গ্রহণ করুন এবং এ দরিদ্রের গৃহে যৎসামান্য অন্ন-জল গ্রহণ ও বিশ্রাম করিয়া . আমাদিগকে কৃতার্থ করুন। হে দ্বিজবর। ক্রোধ মনুষ্যের অভ্যন্তরস্থ পরম শত্রু, উহার ন্যায় অশান্তিজনক ও অনিষ্টকর রিপু আর নাই। যিনি ক্রোধ ও মোহকে জয় করিতে পারেন, দেবতারা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলেন। যিনি সত্যবাদী, গুরুজনের প্রীতিসাধক, স্বয়ং হিংসিত হইয়াও প্রতিহিংসায় পরাঙ্মুখ, দেবতারা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলেন। যিনি জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্মপরায়ণ, স্বাধ্যায়নিরত, শারীরিক ও মানসিক শৌচগুণে (১)

(১) শৌচ দ্বিবিধ, বাহ্য ও আভ্যন্তর। জলাদির দ্বারা দেহের পরিশুদ্ধি বাহ্য শৌচ, এবং হৃদয়শুদ্ধির নাম আভ্যন্তর শৌচ ;—

"শৌচং তু দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যাভ্যন্তরভেদতঃ।
মৃজ্জলাদিকৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথাঽপরম্॥"

বিভূষিত, কাম ও ক্রোধের অধৃষ্য, দেবগণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলেন। যে মনস্বী ধার্ম্মিকের নিকট সর্ব্বভূত আত্মতুল্য প্রেমাস্পদ, সর্ব্ব-কর্ত্তব্যেই যাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ, দেবতারা তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলেন। যিনি অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন ও শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে যথাশক্তি দান করেন, দেবগণ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলেন। যিনি সত্যবাদী, গুরুভক্ত, দমে ও আর্জ্জবে বিভূষিত, মহাপ্রলয়েও নিজ কর্ত্তব্য হইতে অবিচলিত, দেবগণের নিকট তিনি ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত। প্রধানতঃ ইন্দ্রিয়সংযম, গুরুভক্তি, সত্যনিষ্ঠা, আর্জ্জব ও পরোপকার, এই কয়টা শাশ্বত ধর্ম্মের লক্ষণ। ধর্ম্মতত্ত্ব দুর্জ্জেয়, তাহার শাখা-প্রশাখা বহুধা। কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মরাজ্যের সিংহাসন একমাত্র সত্যমূলে প্রতিষ্ঠিত। সর্ব্বভূতে দয়া, তিতিক্ষা, আত্মসংযম, শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি, এগুলি ধর্ম্মের প্রকট লক্ষণ।

আপনি স্বাধ্যায়নিরত ও শৌচাচারসম্পন্ন হইয়াও, প্রকৃত ধর্ম্মের মর্ম্ম জ্ঞাত নহেন। এই জন্যই হঠাৎ রোষের পরবশ হইয়াছেন। যদি পরমধর্ম্মের স্বরূপ জানিতে ইচ্ছা থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া মিথিলানগরে গমন করুন। তথায় ধর্ম্মব্যাধ বাস করেন। দৈবনির্ব্বন্ধে ব্যাধকুলে জন্মলাভ করিয়াও, তিনি যথার্থ ধর্ম্মের স্বরূপ জ্ঞাত আছেন। তিনি সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, আতিথেয় ও বিনয়ের মূর্ত্তি। তিনি একান্তভাবে বৃদ্ধ পিতা-মাতার সেবায় অভিনিবিষ্ট। তাঁহার নিকট গমন করিলেই, তিনি আপনাকে সারধর্ম্ম শুনাইবেন। আপনার মঙ্গল হউক। হে ব্রহ্মন্! কৃপা করিয়া এ অবলার অপরাধ ক্ষমা করুন। স্ত্রীজাতি

সকলেরই অবধ্যা (১), ইহা ধর্ম্মজ্ঞমাত্রেরি অনুশাসন। ব্রাহ্মণ কহিলেন,—অয়ি ধর্ম্মশীলে! আমি তোমার কথায় প্রীত হইলাম। অয়ি কল্যাণি! আমার ক্রোধ তিরোহিত হইয়াছে। তুমি আমাকে যে তিরস্কার করিলে, তাহা আমাব সুমহৎ কল্যাণের নিদান জানিও। তোমার মঙ্গল হউক। আমি চলিলাম। ইহা বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রস্থান করিলেন।

তিনি ধর্ম্মব্যাধের অনুসন্ধানে মিথিলায় যাত্রা করিলেন, এবং সেই পতিব্রতা নারীর নিকট আপনাকে অতিশয় অপরাধী জ্ঞান কবিয়া, অনুতপ্তচিত্তে ভাবিলেন,—আমাকে সেই ধর্ম্মব্যাধের নিকট অতিবিনীত ভাবে ও শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে গমন করিতে হইবে। তিনি যে উপদেশ দিবেন, তাহা আমার অবহিতচিত্তে শ্রোতব্য ও সর্ব্বপ্রযত্নে পালনীয়। কারণ, ঐ নারী সামান্যা নহেন। উঁহার প্রভাব অত্যাশ্চর্য্য! নহিলে, উনি সেই ঘোর বিজন বনে বকদাহ-ঘটনা কিরূপে জানিলেন? বিশেষতঃ উঁহার উপদেশগুলি অমূল্য ও মর্ম্মস্পর্শী। ব্রাহ্মণ অতিমাত্র কুতূহলাক্রান্ত চিত্তে নানা অরণ্য, গিরি, নদী ও জনপদ অতিক্রম করিয়া, জনক-পালিতা মিথিলায় উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, ত্রিলোকী-পূজিত রাজর্ষি জনকের নগরী অতি অপূর্ব্ব স্থান। উহা চতুর্দ্দিকে শত শত কেতুমালায় সমাকীর্ণা,—মনোহর গোপুর-অট্টালিকা-হর্ম্ম্য-প্রাকার-পরিখায় শোভমানা। শত শত যজ্ঞশালা ও

(১) "অবধ্যাং চ স্ত্রিয়ং প্রাহুস্তির্য্যগ্‌যোনিগতামপি"—পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গাদিরও স্ত্রীজাতি অবধ্যা, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের অনুশাসন।

হোমকুণ্ড সুপবিত্র আজ্যগন্ধে দশদিক্ পবিত্র করিতেছে। অসংখ্য পণ্যবীথিকা রাজমার্গের উভয় পার্শ্বে সুশৃঙ্খলায় সজ্জিতা ও নানা-দেশজাত বিচিত্র পণ্যসম্ভারে পূর্ণা। কোথাও বিচিত্র ধ্বজ-পতাকাদিমণ্ডিত, ধাতুরত্নজালে ভাস্বর, অপূর্ব্ব কারুনৈপুণ্যে বিরাজিত রথরাজি দর্শকগণের দৃষ্টিকে মুগ্ধ করিতেছে। সুপ্রশস্ত ও সুপরিষ্কৃত রাজমার্গের উভয় পার্শ্বে ফল-পুষ্পমণ্ডিত তরুরাজি। শ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত পান্থগণের জন্য পথের পার্শ্বে পার্শ্বে বিমল-সলিলোদ্গারী ধারাযন্ত্রসকল উন্মুক্ত। কোথাও হস্তিশালা, কোথাও অশ্বশালা; দুর্গের সমন্তাৎ প্রশস্ত সেনা-নিবাস। তিনি দেখিলেন, মিথিলাবাসিগণের সকলেরি দেহ হৃষ্টপুষ্ট-বলিষ্ঠ, সকলেরি বদনে আনন্দ, শান্তি ও প্রফুল্লতা বিরাজমান। সেই পুণ্যশ্লোক রাজর্ষি জনকের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা যেন সকল লোকের মুখমণ্ডল হইতে স্ফুটিত হইতেছে। যেন রাজভক্তি আবালবৃদ্ধবনিতা-আপামর প্রজাপুঞ্জের হৃদয়ে দৃঢ়নিখাত। দুঃখ-দারিদ্র্য, রোগ-শোক, পাপ-তাপ, অকালমৃত্যু, অকালবার্দ্ধক্য, প্রভৃতি দুর্নিমিত্তসকল সে রাজ্যের ছায়াও লঙ্ঘন করে নাই। সর্ব্বত্র অশ্রান্ত যাগ-যজ্ঞ ও দান-পুণ্য অজস্র ধারায় প্রবাহিত। সেই পুণ্যময়ী, মহোৎসবময়ী, হৃষ্টপুষ্টজনাকুলা নগরী দেখিয়া ব্রাহ্মণ ভাবিলেন,—অহো! কোথায় আসিলাম! একি মিথিলা-পুরী না অমরাবতী? ধন্য রাজর্ষি জনক! ধন্য তোমার পুণ্য-প্রভাব! ব্রাহ্মণ অবাক্ হইয়া পুরশোভা দেখিতে দেখিতে ধর্ম্মব্যাধের অনুসন্ধানে চলিলেন। ধর্ম্মব্যাধের নাম করিবামাত্র, লোকে সাদরে তাঁহাকে ধর্ম্মব্যাধের নিকট লইয়া গেল। তথায়

ধর্ম্মব্যাধ সে দেশে আপামর সকলেরি সুপরিচিত, এজন্য তদীয় অনুসন্ধানে কাহারও কষ্ট পাইতে হয় না। ব্রাহ্মণ যখন তাঁহার নিকট উপস্থিত, তখন তিনি বিপণীমধ্যে বসিয়া মৃগ-মহিষ-মাংস বিক্রয় করিতেছিলেন। তথায় ক্রেতৃগণের ভিড় দেখিয়া, ব্রাহ্মণ জনতার এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলেন। অপরিচিত ব্যক্তিকে দেখিবামাত্র ধর্ম্মব্যাধ সসম্ভ্রমে উঠিয়া ব্রাহ্মণের নিকট গিয়া অভিবাদনপূর্ব্বক বলিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আসুন আসুন্! অহো কি সৌভাগ্য! কি সুপ্রভাত! আপনার দর্শন লাভ করিলাম। হে ভগবন্! আমি অতি অধম জাতি, ব্যাধ। এ দাসকে আজ্ঞা করুন, কি করিব? আপনি যে জন্য আসিয়াছেন, তাহা আমার অ[illegible]ত নহে। আপনাকে সেই পতিব্রতা নারী মিথিলায় আমার নিকটে আসিতে বলিয়াছেন। তাঁহার সেই কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ চমকিত হইয়া ভাবিলেন,—অহো! সে বৃত্তান্ত এ ব্যক্তি কিরূপে জানিল! ইহাও একটা আশ্চর্য্য ঘটনা! ব্যাধ বলিলেন,—দেব! এ স্থান আপনার অভ্যর্থনার যোগ্য নহে। আসুন! কৃপা করিয়া এ দাসের ভবনে পদধূলি দান করুন! ব্রাহ্মণ হৃষ্টচিত্তে তাহাতে সম্মত হইলে, ব্যাধ তাঁহাকে লইয়া নিজ গৃহাভিমুখে গমন করিলেন। কিয়দ্দূর গিয়া এক বৃহৎ চতুঃশাল হর্ম্ম্যে প্রবেশ করিলেন। ভবনটী সুপরিষ্কৃত ও অতি মনোহর। দেখিলে দেববিহারক্ষেত্র বলিয়াই জ্ঞান হয়। উহা সর্ব্বত্র অগুরু-চন্দনাদির ও বিবিধ কুসুমের সৌরভে সুবাসিত। উহার বহুদূর পর্য্যন্ত চতুর্দ্দিকে আবর্জ্জনাদি মলিনতার নামগন্ধ নাই। সম্মুখে মনোরম কুসুমকানন নানাজাতীয় পুষ্পের পরিমলে আকীর্ণ।

গৃহের পরিচারকাদিরাও পবিত্র পরিচ্ছদে ভূষিত ও প্রত্যেকেই যেন বিনয়-ভক্তির মূর্ত্তি। গৃহের প্রত্যেক সাজসজ্জা ও উপকরণ সুপরিষ্কৃত ও সুনির্ম্মল। সর্ব্বত্রই শান্ত, স্নিগ্ধ, পূত, নির্ম্মল ও উজ্জ্বল দৃশ্য। তাঁহারা প্রবেশ করিবামাত্র পরিচারকেরা শশব্যস্তে আসিয়া অভিবাদন করিল ও আদেশপ্রতীক্ষায় করযোড়ে দণ্ডায়মান রহিল।

ধর্ম্মব্যাধ গৃহে প্রবেশ করিয়া সর্ব্বাগ্রে পিতা-মাতার চরণে ভক্তিভরে নিপতিত হইলেন। পিতা-মাতা কহিলেন, হে ধর্ম্মজ্ঞ! কুলপাবন! বৎস! উঠ—উঠ। তোমার অকৃত্রিম ভক্তিগুণে, শ্রদ্ধায়, সেবায় ও শৌচে আমরা পরম সুখী। পুত্র! চিরজীবী হও! তোমার জ্ঞান-ধর্ম্ম-মেধা-বুদ্ধি-ভক্তি ও পুণ্যশীলতা দিন দিন বর্দ্ধিত হউক। আমরা তোমার ন্যায় সুপুত্রের সেবায় পরম সুখী। আমাদের এ সুখের নিকট স্বর্গসুখও তুচ্ছ। দেখিতেছি, দেবতাগণের মধ্যেও তোমার মাতা-পিতার ন্যায় দেবতা তোমার নিকট কেহই নাই। তুমি হীন ব্যাধকুলে জন্মলাভ করিয়াও প্রকৃত ব্রাহ্মণোচিত সদাচারসমন্বিত। নিশ্চয় তোমার এ অলৌকিক ভক্তিগুণে ও পুণ্যশীলতায় তোমার স্বর্গস্থ পিতৃলোক ও মাতৃলোক পরমানন্দিত। তাঁহারা দেবলোক হইতে নিরন্তর তোমার উপর অজস্র আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করিতেছেন, সন্দেহ নাই। দেখিতেছি, কায়মনোবাক্যে গুরুসেবা ও অতিথিসেবা ভিন্ন তোমার অন্য কর্ম্ম নাই। রোগে পীড়িত হইয়া বা সহস্র কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও তোমার গুরুসেবার ব্যাঘাত হয় না। গুরুসেবা, অতিথিসৎকার, দীনহীনগণের উপকার ভিন্ন আর

কোনও দিকে তোমার মতি নাই। তুমি এ অধম ব্যাধকুলে সাক্ষাৎ রামচন্দ্র। এ জগতে যে ব্যক্তি তোমার ন্যায় সুশীল, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, গুরুভক্ত সন্তান লাভ করে, সেই ধন্য! এ সংসারে অকিঞ্চন, গৃহশূন্য, দীনহীন হইযাও, যে সুপুত্র লাভ করে, সেই ভাগ্যবান্, সেই ধনী, সেই সুখী। সুপুত্রই মানবের সকল দুঃখে সান্ত্বনা। জন্ম জন্ম যেন তোমার ন্যায় পুত্ররত্ন লাভ করি। তুমি বৎস! একাধারে আমাদের মাতৃশোক, পিতৃশোক, সর্ব্ব-শোক হরণ করিয়াছ, সকল অভাব দূর করিয়াছ। ত্বদেকশরণ এ বৃদ্ধ মাতা-পিতার আশীর্ব্বাদে তুমি নিরাময় ও চিরজীবী হও, ঈশ্বরে ও গুরুজনে তোমার শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রীতি এবং দীনহীন অনাথগণে তোমার করুণা অনপায়িনী হউক। সেই বৃদ্ধদম্পতী প্রণত পুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া এইরূপ বলিতে বলিতে আনন্দবিগলিত বাষ্পধারায় পুত্রের মস্তক অভিষিক্ত করিলেন।

অনন্তর ধর্ম্মব্যাধ সেই অভ্যাগত ব্রাহ্মণের কথা তাঁহাদিগকে নিবেদন করায়, সেই বৃদ্ধদম্পতী সসম্ভ্রমে যুগপৎ উত্থিত হইয়া, অতিথির চরণবন্দনাপূর্ব্বক তাঁহাকে পবিত্র আসনে বসাইয়া অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক স্বাগতসম্ভাষণ করিলেন। অতিথিও হৃষ্টচিত্তে তাঁহাদের পূজা গ্রহণপূর্ব্বক বলিলেন,—পুত্র-ভৃত্যাদি পরিবার-বর্গের সহিত আপনাদের কুশল ত? বৃদ্ধদম্পতী কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনার কৃপায় এ গৃহে সকলেরি কুশল! ভগবন্! আপনার ত সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল? আপনি ত নির্ব্বিঘ্নে এ গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন? অহো! আজি কি সুপ্রভাত! আপনার ন্যায় দুর্লভ অতিথিরত্ন লাভ করিলাম! অনন্তর ধর্ম্মব্যাধ

ব্রাহ্মণকে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, ভগবন্! এই মাতাপিতাই আমার আরাধ্যতম দেবতা। ইহাঁরাই আমার যুগল ঈশ্বরমূর্ত্তি। ভক্তের ঈশ্বরের প্রতি যাহা যাহা কর্ত্তব্য, তাহা আমি ইহাঁদেরি প্রতি করিয়া থাকি। একাধারে এই বৃদ্ধ মাতা-পিতাই আমার ইন্দ্রচন্দ্রাদি তেত্রিশ কোটি দেবতা। ভক্তগণ স্বহস্তসঙ্কলিত যে সকল পবিত্র উপহারে নিজ ইষ্টদেবতার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন, আমি সেইরূপ উপহারে বিধিপূর্ব্বক ইহাঁদের পূজা করিয়া থাকি। হে দ্বিজোত্তম!—ইহাঁরাই আমার পরম দেবতা, আরাধ্যের সার। আমি অহরহঃ ফল-পুষ্প ও নানা রত্নাদি উপচারে ইহাঁদের সন্তোষবিধান করিয়া থাকি। পিতা-মাতাই আমার যাগ-যজ্ঞ, চারি বেদ, জপ-তপ; ইহাঁরাই আমার মেধ্য অগ্নিত্রয়। ইহাঁরাই আমার সকলি। আমার প্রাণবায়ু, ভার্য্যা, পুত্র, সুহৃদ্বর্গ, ধন-সম্পদ্, ইহাঁদেরই সেবার জন্য। প্রতিদিন যথাকালে ইহাঁদের স্নানানুলেপন, পাদ-প্রক্ষালন, ভক্ষ্য-ভোজ্য-পানীয়-প্রদান, চরণ-সংবাহন, বীজন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্য স্বহস্তে সম্পাদন করি, কায়মনোবাক্যে ইহাঁদের অনুকূল কার্য্য হইতে কদাচ অণুমাত্র বিচলিত হই না। যাহা কিছু ইহাঁদের অপ্রিয়, তাহা সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিয়া থাকি। হে দ্বিজসত্তম! এই গুরুসেবাধর্ম্মই আমার নিকট শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, ইহাই আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিকর। এ কার্য্যে যে আত্মানন্দ উপভোগ করি, তাহার তুলনায় স্বর্গ-মোক্ষও তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়। প্রতিদিন এ ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে আমার আলস্য নাই। আমি অনুক্ষণ পুলকিত হৃদয়ে ও নবীভূত উৎসাহে এ কার্য্য করিয়া থাকি। পিতা, মাতা, ঈশ্বর ও আচার্য্য,

এই চারিটী মানবের নিত্য-উপাস্য পরম দেবতা (১)। যিনি গৃহাশ্রমে বিদ্যমান, তাঁহার নিকট ইহাঁদের সেবাই শ্রেষ্ঠ ধৰ্ম্ম। ধৰ্ম্মব্যাধ ব্রাহ্মণকে পিতামাতার নিকট পরিচিত করিয়া, পুনরায় কহিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি এই পরমগুরু পিতামাতার সেবা করিয়াই দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছি। আমার আর অন্য সাধনার বল নাই। আমি শাস্ত্র পাঠ করি নাই। দেখুন! সেই সংযমিনী, পতিব্রতা, সত্যপরায়ণা নারী যে জন্য আপনাকে এ মিথিলায় আমার নিকট পাঠাইয়াছেন, তাহা আমাকে কেহ না বলিলেও, জানিতে পারিয়াছি। ব্রাহ্মণ বলিলেন,—সেই ধৰ্ম্মপ্রাণা সতীর বাক্যে ও আপনার অসামান্য সৌজন্যে আপনার প্রতি

---

(১) প্রাচীনকালের বৈদিক আচার্য্যেরা শিক্ষার্থী শিষ্যকে প্রথমেই এই কয়েকটী উপদেশ দিতেন ;—"ওঁ মাতৃদেবো ভব; পিতৃদেবো ভব; আচাৰ্য্যদেবো ভব; অতিথিদেবো ভব। যান্যনবদ্যানি কৰ্ম্মাণি, তানি সেবিতব্যানি, নো ইতরাণি। যান্যস্মাকং সুচরিতানি, তানি ত্বয়োপাস্যানি, নো ইতরাণি।"—মাতাকে দেবতাজ্ঞানে সেবা কর ; পিতাকে দেবতাজ্ঞানে সেবা কর; আচার্য্যকে দেবতাজ্ঞানে সেবা কর; অতিথিকে দেবতাজ্ঞনে সেবা কর। শিষ্টসম্মত অনাবিল কৰ্ম্ম সকলেরি অনুষ্ঠান করিও; নিন্দিত কৰ্ম্মের অনুষ্ঠান কদাচ করিও না। হে শিষ্য! আমাদেব সকলেব নিকট হইতে সদাচারই গ্রহণ করিও। অসৎকার্য্য গুরুজনে করিলেও, তাহার কদাচ অনুষ্ঠান করিও না। ইত্যাদি তৈত্তিরীয়োপণিষৎ। অহো! কি অমূল্য উপদেশ! ব্রহ্মলোকের অমৃতকুণ্ড হইতে যেন সর্ব্বপাপহারিণী অনন্ত শান্তিসুধা, বিন্দু বিন্দু শিষ্যহৃদয়ে ক্ষরিত হইতেছে! মর মানব ইহার এক বিন্দু পান করিলে, অমর হইয়া যায়।

আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও প্রীতি জন্মিয়াছে। ধর্ম্মব্যাধ কহিলেন,— ব্রহ্মন্! আপনার সর্ব্বাঙ্গীণ সুমঙ্গলকামনায় যাহা বলিতেছি, কৃপা করিয়া প্রণিধানপূর্ব্বক শ্রবণ ও সর্ব্বপ্রযত্নে তাহা পালন করুন। তাহাতে আপনার ঐহিক ও পারত্রিক অশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে। দেখুন! গৃহে আপনার মহাগুরু, প্রত্যক্ষ ঈশ্বর, বৃদ্ধ মাতা-পিতা। এ সংসারে তাঁহাদের ভরণপোষণ ও সেবা-শুশ্রূষা করিতে আপনি ভিন্ন আর কেহই নাই। যদবধি আপনি গৃহে সেই অশরণ বৃদ্ধ পিতামাতাকে ছাড়িয়া আসিয়াছেন, তদবধি তাঁহারা অন্নাভাবে মৃতকল্প। তাঁহাদের মুখে জলগণ্ডূষ দিবার কেহ নাই। আপনার জন্য অহোরাত্র রোদন করিয়া তাঁহারা অন্ধ হইয়াছেন। আমি দিব্যচক্ষে তাঁহাদের অবস্থা দেখিতেছি। অহহ! তাঁহাদের সে দশা দেখিলে, সে হাহাকার শুনিলে পাষাণও দ্রব হয়, বজ্রও বিদীর্ণ হয়। কুপুত্র হইলেও কুমাতা হয় না। তাঁহারা কিছুতেই আপনার অশুভ কামনা করেন না। তাঁহারা নিজের সে অশরণ দশা না ভাবিয়া,—"আমাদের প্রাণাধিক পুত্র কোথায় গেল! কি বিপদে পড়িল! তাহার আহার হইল কি না, কোথায় শয়ন করিল, হয়ত কোন অসহায় স্থানে পীড়িত হইয়া মা—মা—বাবা—বাবা—বলিয়া ডাকিতেছে, হয়ত এতক্ষণে তাহার প্রাণবায়ু নিঃশেষ হইল, এইরূপ নানা আশঙ্কা করিয়া তাঁহারা শোকে ও আতঙ্কে উন্মত্ত, ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত, কেবল সেই সঙ্কটনাশন, দীনদয়াময় জগদীশ্বরের কৃপাভিক্ষা করিয়া, তাঁহারই অনুকম্পার প্রত্যাশায় অতিকষ্টে প্রাণধারণ করিতেছেন। হে ব্রাহ্মণ! আমার কথা শুনুন, আর ক্ষণমাত্র

বিলম্ব না করিয়া স্বগৃহে গমন করুন। গৃহে গিয়া প্রাণপণ যত্নে তাঁহাদিগকে প্রসন্ন করুন। এক্ষণে বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ আপনার হস্তে, গতানুশোচনা বৃথা। অতীতে যে ত্রুটি ঘটিয়াছে, বর্ত্তমান ও ভাবী কার্য্য দ্বারা তাহার যথাসাধ্য পূরণ করুন। তাঁহারা আপনকার অশুভকামনা না করিলেও, তাঁহাদের দারুণ মনস্তাপ-জনিত নিঃশ্বাসে আপনার ইহকাল, পরকাল, আপনার বেদ-বেদান্ত-পাঠ, আপনার জপ-তপ-ব্রতোপবাস, আপনার তীর্থদর্শন, আপনার উপাসনা-ধ্যান-ধারণা সকলি ভস্মে ঘৃতাহুতির ন্যায় বিফল হইতেছে। আপনার মাতা-পিতা জীবিত, বৃদ্ধ ও অনন্যোপায়, আপনি যুবাপুরুষ। এ আপনার গৃহস্থাশ্রম পালনের সময়। আপনি সংযমী ও পুণ্যশীল হইয়া, একান্তভাবে গুরুজনসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া গার্হস্থ-ধর্ম্ম পালন করুন। অচিরেই আমার উপদেশের মর্ম্ম বুঝিবেন। দেখিবেন, এই গৃহস্থাশ্রমই একাধারে সর্ব্বধর্ম্মের—সর্ব্বপুণ্যের সাধনাক্ষেত্র, সর্ব্বজীবের তর্পণক্ষেত্র, সর্ব্বতীর্থের শ্রেষ্ঠ তীর্থ। মানবের আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক, একাধারে ও সমঞ্জসভাবে এই দ্বিবিধ উৎকর্ষের পূর্ণতারূপ পূর্ণ মনুষ্যত্ব বা দেবত্ব, এই তীর্থরাজ গৃহস্থাশ্রমই দান করিতে পারে। হায়! হায়! আপনি স্বগৃহে মাতা-পিতার সেবা, অতিথিসেবা, অনাথ দীনহীনগণের সেবা, অজ্ঞানান্ধগণকে সদ্-বিদ্যাদান, শোকার্ত্তের শোকশান্তি প্রভৃতি অমূল্য ও অতুল্য মহানিধি পরিহার করিয়া, অন্ধের ন্যায়, মরীচিকাভ্রান্ত জীবের ন্যায় মরুভূমিতে জলের আশা করিয়াছেন! এক গৃহস্থাশ্রমই সকলের জ্ঞানার্জ্জনী ও ধর্ম্মার্জ্জনী বৃত্তিগুলির যথোচিত অনুশীলনের

ক্ষেত্র। আপনি কিঞ্চিৎ বেদপাঠমাত্র করিয়াই আত্মাকে চরিতার্থ বোধ করিয়াছেন। প্রকৃত জ্ঞানসমুদ্র সম্মুখে অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। আপনি তাহার জলস্পর্শও করেন নাই। আপনি অকারণে বা অল্পকারণে ক্রোধের পরতন্ত্র হইয়া থাকেন। অগ্রে ইন্দ্রিয়নিগ্রহে কৃতকার্য্য হইয়া সমীচীনভাবে গৃহস্থাশ্রম পরিপালন করিলে, পশ্চাৎ আপনার সন্ন্যাসধর্ম্মে অধিকার জন্মিবে। আপনি সর্ব্বতোভাবে এ দাসের বাক্য পালন করিলে, নিশ্চয় আত্মপ্রসাদ লাভ করিয়া, আমার কথার মর্ম্ম বুঝিতে পারিবেন। হে দেব! আমি অধম ব্যাধজাতি। আপনাদের দাসাধম। তথাপি লোকের কল্যাণকামনায ও সদুপদেশদানে সকলেরি অধিকার। হীনজাতির নিকটে বা শিশুর নিকটেও সুভাষিত গ্রহণীয়, এ কথা আপনারাই বলিয়াছেন(১)। এজন্য অকপটহৃদয়ে

১) "শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥
বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং বালাদপি সুভাষিতম্।
অমিত্রাদপি সদ্বৃত্তমমেধ্যাদপি কাঞ্চনম্॥
স্ত্রিয়ো রত্নান্যথো বিদ্যা ধর্ম্মঃ শৌচং সুভাষিতম্।
বিবিধানি চ শিল্পানি সমাদেয়ানি সর্ব্বতঃ॥"

(মনু ২য় অধ্যায়, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০)

—মানবগণ শ্রদ্ধাসহকারে উত্তমা বিদ্যা হীন-জাতির নিকট হইতেও গ্রহণ করিবে; (চণ্ডালাদি) নিকৃষ্ট জাতির নিকট হইতেও উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে; অধম কুল হইতেও স্ত্রীরত্ন (শীলসৌন্দর্য্যশালিনী কন্যা) গ্রহণ (বিবাহ) করিবে।—বিষ হইতেও অমৃত উদ্ধার পুর্ব্বক

ও উন্মুক্ত প্রাণে, আপনার হিতকামনায় যাহা বলিলাম, তাহাতে এ সেবকের অপরাধ ক্ষমা করিবেন। ব্যাধ এই কথা বলিয়া প্রণতশীর্ষে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিলেন।

ব্যাধের সেই ধর্ম্মোপেত, ন্যায়ানুগত, সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া, ব্রাহ্মণ ভক্তি-বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হইয়া বলিলেন, হে সাধো! আজি আমার কি শুভ দিন! আমি কি শুভক্ষণেই এ ভবনে পদার্পণ করিয়াছি! কি শুভাদৃষ্টেই আপনার দর্শন লাভ করিলাম! এ ধরাতলে ঈদৃশ ধর্ম্মোপদেষ্টা ও ধর্ম্মপরায়ণ মানব অতীব দুর্লভ। সহস্র মনুষ্যমধ্যেও একটী ধর্ম্মজ্ঞ ও ধর্ম্মশীল ব্যক্তি মিলে না। আপনি নরশ্রেষ্ঠ; আপনার সখ্যলাভে আমি পরমানন্দ অনুভব করিতেছি। আমি বুদ্ধিদোষে ঘোর নরকে মগ্ন হইতে-ছিলাম, আপনিই আমাকে উদ্ধার করিলেন। হে অনঘ! আজি যে আপনার দর্শনলাভ ঘটিল, ইহা আমার প্রতি সেই পতিত-পাবন, করুণাময় ঈশ্বরের কৃপা। আমি ঘোর অজ্ঞানতিমিরে অন্ধ ছিলাম, আপনার কৃপায় আজি দিব্য চক্ষু লাভ করিলাম। যে প্রকৃত সাধুসঙ্গ লাভ করে নাই, সে ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিনির্ণয়ে অক্ষম। দেখিতেছি, শূদ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও লোকে শাশ্বত ধর্ম্মতত্ত্বে জ্ঞান লাভ করিতে পারে। অথবা, কোনও দৈবঘটনায়

গ্রহণ করিবে; ভাল কথা বালকের নিকট হইতেও গ্রহণ করিবে; শত্রু হইতেও সদাচার গ্রহণ করিবে; অপবিত্র স্থান হইতেও সুবর্ণ (স্বর্ণাদি বহুমূল্য বস্তু) গ্রহণ করিবে। অর্থাৎ স্ত্রী, রত্ন, বিদ্যা, ধর্ম্ম, শৌচ, সুভাষিত, বিবিধ শিল্পাদি বিদ্যা সকলের নিকট হইতেই সকলে গ্রহণ করিতে পারে।

আপনি এ হীন জাতিতে জন্মলাভ করিয়া থাকিবেন। অতএব আপনার পূর্ব্ববৃত্তান্ত বলিতে যদি বাধা না থাকে, তবে অনুগ্রহ করিয়া বলুন।

ব্যাধ কহিলেন,—ভগবন্! ব্রাহ্মণগণের আদেশ আমার শিরোধার্য্য। আমার পূর্ব্বজন্ম-বৃত্তান্ত নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন। আমি পূর্ব্বজন্মে বেদবেদাঙ্গপারদর্শী, নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ ছিলাম, নিজ কর্ম্মবিপাকেই অধমকুলে জন্মলাভ করিয়াছি। ধনুর্ব্বেদবিশারদ কোনও রাজা পূর্ব্বজন্মে আমার বন্ধু ছিলেন। সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে বাস করায়, ক্রমে আমিও ধনুর্ব্বেদে দক্ষতা লাভ করিলাম। একদা সেই রাজা মন্ত্রিবর্গে ও যোধমুখ্যে পরিবৃত হইয়া মৃগয়ায় গমন করিলেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে গমন করিলাম। আমরা এক আশ্রমের নিকট উপস্থিত হইয়া, বহু-সংখ্যক মৃগ বধ করিলাম। অনন্তর আমি একটা মৃগকে লক্ষ্য করিয়া ভীষণ শর নিক্ষেপ করায়, দৈবাৎ সেই শর মৃগদেহে পতিত না হইয়া, এক ঋষির বক্ষে পতিত হইল। তপোধন নিদারুণ শরাঘাতে বিদীর্ণহৃদয় হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহার মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে সমস্ত কানন প্রতিধ্বনিত হইল। তিনি যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বলিলেন,—আমি ত কাহারও কোনও অনিষ্ট করি নাই, আমি নিরীহ তপস্বী, কোন্ দুরাত্মা এ কার্য্য করিল? উহুহু! আমার মর্ম্মস্থান বিদীর্ণ হইয়াছে, অসহ্য যন্ত্রণা! এ সময় শীঘ্র আমার প্রাণ বহির্গত হউক। আমি সেই আর্ত্তনাদ শ্রবণমাত্র বিষম ভয়ে ও শোকে উন্মত্তপ্রায় হইয়া, দ্রুতপদে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, তিনি ভূতলে

পড়িয়া, রক্তাক্ত দেহে বিলুণ্ঠিত হইতেছেন এবং সেই শর দুই হস্তে ধরিয়া উদ্ধৃত করিতে চেষ্টা করিতেছেন। "হে ব্রহ্মন্! ক্ষমা করুন, মৃগের প্রতি নিক্ষিপ্ত এ শর দৈবাৎ আপনার অঙ্গে পতিত হইয়াছে," এই কথা বলিতে বলিতে, আমি দুই হস্তে আকর্ষণপূর্ব্বক সেই শর উন্মোচন করিলাম। সেই সঙ্গে প্রভূত রক্তধারা ক্ষরিত হইল। আমি নিজ উত্তরীয় দ্বারা ক্ষতস্থান দৃঢ়রূপে বদ্ধ করিয়া, তাহাকে অতি সাবধানে বক্ষে করিয়া ত্বরিত পদে আশ্রমে লইয়া আসিলাম। অনন্তর প্রাণপণে নানা উপায়ে তাঁহার চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম। তিনি ক্রমে আরোগ্যলাভ করিলেন, কিন্তু ক্রোধভরে আমাকে এই বলিয়া অভিশাপ দিয়াছিলেন, "রে দুরাত্মন্! তুই ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, চণ্ডাল ব্যাধের ন্যায় কার্য্য করিয়াছিস্, এজন্য তোকে পরজন্মে নৃশংস ব্যাধকুলে জন্মলাভ করিতে হইবে।"

হে দ্বিজবর! এইরূপে অভিশপ্ত হইয়া, আমি, 'ত্রাহি-ত্রাহি' বলিয়া অতি কাতরভাবে তদীয় পদতলে পড়িয়া বলিলাম,--হে দেব! এ দাসের অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনারা ক্ষমাশীল ও পরম কারুণিক। ঋষি কহিলেন, আমার শাপ-বাক্যের অন্যথা হইবে না। তবে তোমার এ অপরাধ অজ্ঞানকৃত এবং তোমার মনেও কোন পাপাভিসন্ধি ছিল না, এই জন্য তুমি শূদ্রকুলে জন্মিয়াও, পরম ধর্ম্মজ্ঞ, ধর্ম্মশীল ও জাতিস্মর (১) হইবে, পরম ভক্তিসহকারে মাতাপিতার সেবা করিবে। নিজ পুণ্য

(১) "জাতিস্মর"—পূর্ব্বজন্মের কথা যাহার স্মরণ থাকে।

চরিত্রপ্রভাবে তুমি মুনিজনদুর্লভা পরমা সিদ্ধি লাভ করিবে। সেই মুনিবরের কৃপায় আমি পূর্ব্বজন্মের সকল ঘটনাই প্রত্যক্ষবৎ জানিতেছি। হে মহাত্মন্! এ দাসের সমস্ত বিবরণ শ্রীচরণে নিবেদন করিলাম। আমি আর অধিককাল ইহলোকে থাকিব না। অচিরেই স্বপুণ্যোপার্জ্জিত স্বর্গলোকে প্রস্থান করিব।

ধর্ম্মব্যাধের কথা শুনিয়া, সেই বেদপাঠ-দাম্ভিক, পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্রাহ্মণের চৈতন্য হইল। তিনি নয়নজলে বক্ষ প্লাবিত করিয়া, ঘনঘন নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে স্ফুরিত অধরে বারংবার আপনাকে ধিক্কার দিলেন। ভাবিলেন,—হায়! হায়! কি কুকর্ম্ম করিয়াছি! প্রাণ, মন, দেহ নির্গলিত করিয়া, আত্মাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া তাঁহাদের পদে প্রদান করিলেও, তাঁহাদের মহোপকার-ঋণের কণামাত্রেরও পরিশোধ হয় না, হায়! আমি বুদ্ধিমোহে তাঁহাদিগকে—তাঁহাদের অন্ধ ও অসহায় দশায় ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি! আমার নিমিত্ত তাঁহাদের নয়ন-বিগলিত এক এক বিন্দু অশ্রু আমার অনন্ত জীবনের দাহকারী। এ বার্দ্ধক্যে হয়ত অনাহারে ও পুত্রশোকে এতক্ষণ তাঁহারা জীবলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন! অহো! যদি তাহাই ঘটিয়া থাকে, তবে এ হতভাগ্য মহাপাপীর আর পরিত্রাণ নাই, ঘোরতর দুস্তর নরকে আমার গতি হইবে। তাঁহারা জীবিত থাকিলেও এতদিন শোকে ও অনাহারে কঙ্কালসার হইয়াছেন। সারারাত্রি জাগিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে—প্রতি সাড়াশব্দেই ঐ পুত্র আসিল ভাবিয়া, শশব্যস্তে বহির্দ্বারে ছুটিতেছেন এবং আমাকে না দেখিয়া ভূতলে পড়িয়া সংজ্ঞা হারাইতেছেন। এ সংসারে

আমা বিনা তাঁহাদের দ্বিতীয় আশ্রয় নাই। হে ঈশ্বর! হে দয়াময়! বিভো! হে পাতকীর গতি! যেন গৃহে গিয়া, সেই প্রাণারাম—প্রাণারাধ্য পুত্রপ্রাণ যুগল দেবমূর্ত্তিকে দেখিতে পাই। অহো! এই ধর্ম্মব্যাধ জাতিতে চণ্ডাল হইয়াও প্রকৃত ব্রাহ্মণ (১)। আর, আমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াও চণ্ডাল। কেন না, বিধাতা সকল মনুষ্যকেই সমপ্রেমে সৃষ্টি করেন। লোকসকল নিজ নিজ কর্ম্মদ্বারাই এ জগতে উৎকর্ষাপকর্ষ লাভ করে।

ব্রাহ্মণ এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে, সে স্থান হইতে বিদায় লইয়া, ঊর্দ্ধশ্বাসে গৃহাভিমুখে ছুটিলেন।

ধর্ম্মব্যাধ-কথার পরিশিষ্ট।

—:—

ব্রাহ্মণ গৃহে উপস্থিত হইয়া, পিতা-মাতাকে জীবিত দেখিয়াছিলেন। অনুতাপে দগ্ধ হইয়া তিনি তখন নবজীবন লাভ করিয়াছিলেন। যাবৎ তাঁহার পিতামাতা জীবিত ছিলেন, তাবৎ তিনি ছায়ার ন্যায় তাঁহাদের অনুগামী হইয়া, অহোরাত্র সেই মহাগুরু-সেবায় প্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন। সেই বৃদ্ধদম্পতী

(১) "চণ্ডালোঽপি ভবেদ্‌বিপ্রো হরিভক্তিপরায়ণঃ।
হরিভক্তিবিহীনস্তু দ্বিজোঽপি শ্বপচাধমঃ॥"

—ঈশ্বরপরায়ণ-পুণ্যশীল ব্যক্তি জাতিতে চণ্ডাল হইয়াও ব্রাহ্মণতুল্য ভক্তিভাজন। অধার্ম্মিক নাস্তিক, জাতিতে ব্রাহ্মণ হইয়াও চণ্ডালেরও অধম বলিয়া গণ্য।

অন্তিমে প্রাণাধিক পুত্রের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া, প্রফুল্লমুখে ঈশ্বর-চরণে পুত্রের অনন্ত কল্যাণ-প্রার্থনা করিতে করিতে স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। সেই মাতা, পিতা ও পুত্র যতদিন জীবিত ছিলেন, ইহকাল-পরকালের বন্ধু মহাত্মা ধর্ম্মব্যাধকে ভুলেন নাই। তাঁহারা প্রাতে উঠিয়া ধর্ম্মব্যাধকে ভক্তি-কৃতজ্ঞতা-ভরে নমস্কার না করিয়া কোনও কর্ম্ম করিতেন না। অজ্ঞান-তিমিরান্ধ লোকের জ্ঞাননেত্রদাতা, পরহিতপ্রাণ, লোকাদর্শচরিত, পবিত্রাত্মা সাধুরা যে জাতি হউন না কেন, সর্ব্বলোকের নমস্য।

অত্যাশ্চর্য্য আতিথেয়তা

উঞ্ছবৃত্তি পরিবারের দানধর্ম্ম।

পুরাকালে ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে ধর্ম্মপরায়ণ তপস্বিগণ বাস করিতেন। তথায় উঞ্ছবৃত্তি নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার ভার্য্যা, একটী পুত্র ও পুত্রবধূ ছিল। সেই ব্রাহ্মণপরিবার সংযতাত্মা, ধর্ম্মশীল, সত্যনিষ্ঠ ও আতিথেয়। তাঁহারা প্রতিদিন পরম ভক্তিযোগে নিয়মিত ধর্ম্মকর্ম্ম সকল সম্পাদন করিতেন, এবং উঞ্ছবৃত্তি (১) দ্বারা যে যৎকিঞ্চিৎ খাদ্য সংগ্রহ করিতেন, তাহাতেই সকলে প্রাণধারণ করিতেন।

---

(১) কৃষকেরা ক্ষেত্র হইতে ধান্য-গোধূমাদি কাটিয়া লইয়া গেলে, তথায় ইতস্ততঃ গর্ত্তাদিমধ্যে যে সকল শস্য পতিত থাকে, যাহা পশুপক্ষীরাও লইতে পারে না, তাহা খুঁটিয়া সংগ্রহ করাকে 'উঞ্ছবৃত্তি'

একদা ঘোর অনাবৃষ্টিবশতঃ দেশের শাক, শস্য, কন্দ-মূল-ফলাদি নিঃশেষ হইল। বহু আয়াসেও আর খাদ্য মিলে না। ঐ ব্রাহ্মণপরিবার উপর্য্যুপরি অনাহারে থাকিয়াও, ব্রত-হোম-পূজাদি নিত্যকর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলেন না। অনশনে ক্রমে তাঁহারা কঙ্কালসার হইলেন। এইরূপে কয়েক দিন অতীত হইল। একদা তাঁহারা নানাস্থান পরিভ্রমণ করিয়া ও বিস্তর অনুসন্ধান করিয়া, অতি কষ্টে এক প্রস্থ যব (১) সংগ্রহ করিলেন। তাঁহারা পরমযত্নে সেই যবগুলি ভাঙ্গিয়া শক্তু প্রস্তুত করিলেন। তদ্দ্বারা যথাবিধি বলিকার্য্যাদি সম্পন্ন করিয়া, সকলে তাহা বিভাগ করিয়া লইলেন। সে মুমূর্ষু অবস্থায় সেই এক এক মুষ্টি শক্তু, তাহাদের প্রাণপ্রদ অমৃত বলিয়া জ্ঞান হইল। তাঁহারা তাহা ভোজন করিতে বসিতেছেন, এমন সময় এক অতিথি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অতিথিদর্শনমাত্র তাঁহারা সসম্ভ্রমে আহার রাখিয়া, তাঁহার পরিচর্য্যায় নিযুক্ত হইলেন। অতিথিকে পাদ্য, অর্ঘ্য, আসন প্রভৃতি দানে ও কুশলপ্রশ্নে আপ্যায়িত করিয়া, ব্রাহ্মণ কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলেন, মহাশয়! আজি আমাদের বড়ই সৌভাগ্য যে, আপনি কৃপা করিয়া এ স্থানে পদার্পণ করিয়াছেন। আপনাকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিতেছি। এই শক্তু আমাদের বিশুদ্ধভাবে উপার্জ্জিত।

বা উঞ্ছজীবিকা বলে। যে ব্যক্তি এইরূপে জীবন ধারণ করে, তাহাকেও উঞ্ছবৃত্তি বলা যায়। ধর্ম্মশীল তাপসগণের কাহারও জীবিকার ব্যাঘাত করিতে নাই।

(১) 'প্রস্থ'—চারি কুড়ব।

এই ধর্ম্মলব্ধ যৎসামান্য ভক্ষ্য আমি শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে (১) আপনাকে দিতেছি, আপনি অনুগ্রহ করিয়া ইহা ভোজন করিলে আমরা কৃতার্থ হইব। অতিথি তাহা সাদরে গ্রহণপূর্ব্বক ভোজন করিলেন। কিন্তু তাহাতে তাঁহার ক্ষুধাশান্তি হইল না। ব্রাহ্মণ তাহা বুঝিতে পারিয়া উদ্বিগ্নচিত্তে ভাবিতে লাগিলেন,--এক্ষণে কি উপায়ে ইহাঁর তুষ্টিসাধন করি। অতিথি অতৃপ্ত হইলে, আমার সকল সাধনাই নিষ্ফল হইবে। প্রাণ দিয়াও অতিথিকে তৃপ্ত করিতে হইবে। পতিকে বিষণ্ণ ও চিন্তাযুক্ত দেখিয়া তাঁহার ভার্য্যা কহিলেন,--নাথ! আমার এই শক্তুভাগ লইয়া অতিথিকে প্রদান করুন। ইনি তৃপ্ত হইয়া গমন করুন। সর্ব্বাগ্রে অতিথির তৃপ্তিসাধন করা আমাদের সর্ব্বোপরি কর্ত্তব্য। সেই অনশন-মুমূর্ষু সাধ্বীর ঐ কথা শুনিয়া, ব্রাহ্মণ তাহা গ্রহণ করিলেন না। অনশনযন্ত্রণা কিরূপ, তাহা তিনি নিজেই অনুভব করিতেছিলেন। সে অবস্থায়, সে ক্ষুধার্ত্তা, শ্রান্তা, অস্থিচর্ম্মাবশেষা, অনশনযাতনায় কম্পমানা, বৃদ্ধা, পতিপ্রাণা পত্নীর মুখের গ্রাস তিনি কোন প্রাণে হরণ করেন? তিনি বাষ্পগদ্‌গদকণ্ঠে বলিলেন,--ভদ্রে! তুমি ও কথা আর মুখেও আনিও না। দেখ! পশু-পক্ষি-কীট-পতঙ্গেরাও প্রাণপণ যত্নে তাহাদের স্ত্রীজাতিকে রক্ষা করে। তির্য্যগ্-

---

(১) "অবজ্ঞয়া ন দাতব্যং কস্মৈচিল্লীলয়াপি বা।
অবজ্ঞয়া কৃতং হন্যাদ্ দাতারং নাত্র সংশয়ঃ॥"
(রামায়ণ, বালকাণ্ড, ১৩শ সর্গ, ৩৪ শ্লোক।)

অবজ্ঞায় বা অশ্রদ্ধায় দান করিতে নাই। তাহা করিলে বিপরীত ফল হয়, অর্থাৎ দাতা নিজেই বিনষ্ট হয়।

যোনিরও স্ত্রীজাতি মানবের অবধ্যা (১)। আমি জ্ঞানী মনুষ্য হইয়া, আমার চক্ষের উপর পতিপ্রাণা ধর্ম্মপত্নীর অনশনমৃত্যু দর্শন করিব? প্রিয়ে! তুমি আমার জীবনের মূলবন্ধন, তোমার কল্যাণেই আমার সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ; তোমার সহায়তা না পাইলে সাধ্য কি, আমি ক্ষণমাত্রও বাঁচিতে পারি। মানবের ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এ চতুর্ব্বর্গেরই সহায় ভার্য্যা। শুশ্রূষা, বংশস্থিতি, আত্মার ও পিতৃলোকের তৃপ্তিসাধন প্রভৃতি ঐহিক ও পারত্রিক সমস্ত কার্য্যই ভার্য্যার উপর নির্ভর করে। রোগে ও শোকে দহ্যমান মানবের একমাত্র আশ্রয় ও আরামস্থল তাহার ভার্য্যা। আতপতাপিতের পক্ষে যেমন স্নিগ্ধ বটচ্ছায়া, তৃষ্ণার্ত্তের পক্ষে যেমন সুশীতল পানীয়, রোগার্ত্তের পক্ষে যেমন মহৌষধ, মুমূর্ষুর পক্ষে যেমন সঞ্জীবনী সুধা, দুঃখদগ্ধ মানবের পক্ষে তেমনি প্রিয়ংবদা, হিতৈষিণী ভার্য্যা। যে ব্যক্তি ভার্য্যারক্ষণে অক্ষম হয়, তাহার ইহলোকে ঘোর অকীর্ত্তি ও পরলোকে দুস্তর নরক। ফলতঃ তাহার ন্যায় হতভাগ্য আর কেহই নাই। অতএব তুমি এমন কথা আর মুখেও আনিও না।

ব্রাহ্মণী কহিলেন,—নাথ! এ দাসীর প্রতি আপনি প্রসন্ন হউন, আমার শক্তু লইয়া অতিথিকে তৃপ্ত করুন। পতিসেবায় দেহ ও আত্মার সমাধানই নারীর রতি ও প্রীতি, ধর্ম্ম ও স্বর্গ, ভুক্তি ও মুক্তি। আপনি পালনকর্ত্তা, এজন্য আমার পতি।

---

(১) "অবধ্যাঞ্চ স্ত্রিয়ং প্রাহুস্তির্য্যগ্‌যোনিগতামপি।"
(ইতি স্মৃতি

সর্ব্বশোকহারী পুত্রমুখ আপনার প্রসাদে দর্শন করিয়াছি, এজন্য আপনি আমার বরদাতা। বিশেষতঃ উপবাসে ও পরিশ্রমে আপনি মরণাপন্ন। পতির এ অবস্থা সম্মুখ দেখিয়া আমি নিজমুখে অন্ন-জল দিব ? হা ! এ কথা মনে আনিলেও আমার মহাপাপ। পত্নীর কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণ অগত্যা তাঁহার শক্তু লইয়া অতিথিকে দিলেন। কিন্তু তাহাতেও অতিথির ক্ষুধাশান্তি হইল না। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অতৃপ্ত দেখিয়া পুনরায় বিষণ্ণ বদনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। তখন পুত্র কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, -পিতঃ ! চিন্তা করিবেন না। আমার শক্তু গ্রহণ করিয়া অতিথিকে দান করুন ; ইহা আমার পরম ধর্ম্ম ও শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য জানিয়াই এ কথা বলিতেছি। আপনি সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রযত্নে আমার পরিপাল্য। বৃদ্ধ পিতা-মাতার পরিপালন পুত্রের সর্ব্বোত্তম ব্রত এবং তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে আমার কাঙ্ক্ষণীয়। যে পুত্র এ সর্ব্বলোকসম্মত, সনাতন ধর্ম্ম হইতে স্খলিত হয়, তাহার নরকেও স্থান নাই। ভগবন ! আপনার লোকপাবন, পুণ্যময় জীবন অনন্য। এ জীবন রক্ষার জন্য আমার এ ক্ষুদ্র জীবন বিসর্জ্জন করা অতি তুচ্ছ কথা। অতএব আর ইহাতে দ্বিধা করিবেন না। আমি ইহা পুলকিত চিত্তে দান করিতেছি।

পিতা কহিলেন, -পুত্রমুখ দর্শন করিয়া পিতা পুন্নাম নরক (১) হইতে ত্রাণ পায়। পুত্রই পিতা-মাতার কৃতি, কীর্ত্তি ও

(১) "পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তস্মাৎ পুত্রইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা॥"

কুলস্থিতির একমাত্র নিদান। পুত্র শত বৎসরের বৃদ্ধ হইলেও সে তাহার পিতা-মাতার নিকট শিশু। তুমি ত অল্পবয়স্ক। এ বয়সে তোমাদের ক্ষুধাই বলবতী। আমার এ বৃদ্ধবয়সে ক্ষুধার যাতনা বোধ হয় না। আমি সুদীর্ঘকাল তপস্যা করিয়া আমার মনস্কামনা পূর্ণ করিয়াছি। এক্ষণে মরণে আমার দুঃখ নাই। হে বৎস! তুমি আমার দেহের ও হৃদয়ের সার-সর্ব্বস্ব, তুমিই আমার আত্মা। প্রাণধন! তুমি চিরজীবী হও। যে পিতা পুত্রকে ধার্ম্মিক ও নিরাময় দেখিয়া মরিতে পারে, তাহার ন্যায় ভাগ্যবান কে আছে? আমি ঈশ্বরের চরণে ইহাই প্রার্থনা করি।

পুত্র, স্নেহময় পিতৃদেবের সেই কথা শুনিয়া কাতরভাবে পিতৃচরণে প্রণত হইয়া, গদগদবচনে কহিতে লাগিলেন,—পিতঃ! যে পুত্র পিতা-মাতার অবশ্যকর্ত্তব্য ধর্ম্মকার্য্যে সর্ব্বপ্রযত্নে সহায়তা না করে, পিতা-মাতার মঙ্গলের জন্য যে পুত্র অম্লানমুখে প্রাণ দিতে না পারে, তাহার জন্মধারণে কি ফল? সে পুত্র থাকা অপেক্ষা নারীর বন্ধ্যা হওয়া ভাল। পিতৃমাতৃকার্য্যই পুত্রের প্রাণ, পিতৃমাতৃসেবাই পুত্রের পুত্রত্ব। পিতা-মাতাই পুত্রের ধর্ম্ম, পিতা-মাতাই স্বর্গ, পিতা-মাতাই পুত্রের পরম তপস্যা। সমস্ত দেবপূজার ও সর্ব্বধর্ম্মের ফল পিতৃমাতৃভক্তি দ্বারাই লাভ করা যায়। কুল ও ধর্ম্ম হইতে পিতার পতনকে নিবারণ করে বলিয়া, পুত্রের নাম 'অপত্য' (১)। আমি এ সঙ্কটে যদি আপনাকে রক্ষা না করি, তবে পিতঃ! আমার জন্মগ্রহণে ধিক্!

---

(১) ন পতন্তি পিতরোঽনেন ইতি অপত্যম্; ন + পত্ + যৎ।

পিতা বলিলেন,—বৎস! দেখিতেছি রূপে ও শীলে, সর্ব্বাংশেই তুমি এ বংশের সুযোগ্য সন্তান। আমি তোমাকে নানারূপে পরীক্ষা করিলাম। এক্ষণে, তোমার শক্তু গ্রহণ করিব। তুমি ইহা বিশুদ্ধ ভক্তিভাবেই দিতেছ। ইহা বলিয়া, তিনি প্রীতি-প্রফুল্লচিত্তে সেই শক্তু গ্রহণ করিয়া অতিথিকে দিলেন। কিন্তু তাহাতেও সে অতিথির ক্ষুধাশান্তি হইল না। অতিথিকে অতৃপ্ত জানিয়া ব্রাহ্মণ বড়ই কুণ্ঠিত হইলেন, এবং নিরুপায় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার স্নেহপ্রতিমা পুত্রবধূ নিজের শক্তুগুলি লইয়া প্রফুল্লমুখে শ্বশুরকে কহিলেন,—পিতঃ! আপনারা কুশলে থাকিলেই আমার সকল দিক রক্ষা পাইবে। আপনাদের কৃপায় আমার অক্ষয় স্বর্লোকে গতি হইবে। আপনাদের কুলধর্ম্ম রক্ষা পাইবে। অতএব কৃপা করিয়া আমার শক্তু গ্রহণ করিয়া অতিথিকে দান করুন।

উপবাসমুমূর্ষু বালিকা পুত্রবধূর কথা শুনিয়া, ব্রাহ্মণ সাশ্রু-লোচনে বলিলেন,—সতি! লক্ষ্মি! মা আমার! নিরন্তর বাত, বর্ষা ও আতপাদি সহ্য করিয়া, তোমার দেহ বিবর্ণ ও বিশীর্ণ, তদুপরি কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রতাদিসাধনায ও কঠোর উপবাসক্লেশে তুমি মা! অস্থিসার হইয়াছ। তোমাতে আর জীবিতের আকার নাই। তোমার দিকে চাহিলে প্রাণ শিহরিয়া উঠে। আমি ধর্ম্মঘাতী হইয়া নিতান্ত নিষ্ঠুরের ন্যায় কিরূপে তোমার মুখের গ্রাস হরণ করি? হে কল্যাণি! তুমি এমন কথা বলিও না। আমার সমক্ষে তুমি মা! অনাহারে মরিবে, আমি দেখিব? তুমি বালিকা ও ক্ষুধার্ত্তা, কঠোর পরিশ্রমে ও দীর্ঘকাল উপবাসে তোমার প্রাণ-

বিয়োগের উপক্রম হইয়াছে। আমার প্রাণ দিয়াও তোমার প্রাণরক্ষা করা উচিত। তুমি যে মা! আমাদের আনন্দময়ী কুললক্ষ্মী।

পুত্রবধূ কহিলেন,—পিতঃ! আপনি আমার গুরুর গুরু, দেবতারও দেবতা (১), আমার দেহ, প্রাণ ও ধর্ম্ম সকলি আপনাদের সেবার জন্য। হে দেব! আপনাদের প্রসাদে আমার শুভলোকে গতি হইবে। হে পিতঃ! আপনাদের চরণে আমার দৃঢ়ভক্তি জানিয়া, আমাকে আপনাদের নিতান্ত আপনার জানিয়া, আমার এ প্রার্থনা পূর্ণ করুন। শ্বশুর কহিলেন,—অয়ি বৎসে! তোমার এ শীলসৌন্দর্য্য কি মধুর! ধর্ম্মব্রতে তোমার কি অচলা ভক্তি! অতুলনীয় তোমার গুরুভক্তি! তুমি ধার্ম্মিকা রমণীর শিরোমণি। তোমার একান্ত ভক্তি ও আগ্রহ জানিয়া আমি তোমার মনোরথ ভগ্ন করিব না। ইহা বলিয়া তিনি বধূর হস্ত হইতে শক্তু লইয়া অতিথিকে দিলেন। তখন অতিথি সেই সাধুবরের আতিথ্যে পরিতৃপ্ত হইলেন। তিনি প্রীতিলাভ করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিলেন,—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি ধর্ম্ম, নররূপে তোমাদের ভক্তি পরীক্ষা করিতে আসিয়াছি। তোমরা জীবনের প্রতি বিন্দুমাত্র মমতা না করিয়া যে আত্মোৎসর্গ করিয়াছ, তাহাতে আমি নিরতিশয় প্রীত হইয়াছি। ঐ দেখ

---

(১) 'গুরুর গুরু, দেবতারও দেবতা'—আমার পরম গুরু পতির আপনি গুরু, এবং আমার আরাধ্য দেবতা পতির আপনি আরাধ্য দেবতা।

স্বর্গ হইতে তোমাদের মস্তকে পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতেছে। অমরধামে তোমাদের এ পুণ্য বিঘোষিত হইতেছে। দেবতারা ও দেবর্ষিগণ তোমাদের দর্শন কামনা করিতেছেন। পত্নী, পুত্র ও পুত্রবধূ সহ তুমি নিত্যানন্দধামে গমন কর। ব্রহ্মচর্য্যে, তপস্যায়, যজ্ঞে, দানে ও অকপট ধর্ম্মশীলতায় তোমরা স্বর্গলোক জয় করিয়াছ। ক্ষুধা এমনি ভয়ানক বস্তু, যে, ইহাতে লোকের জ্ঞান, বুদ্ধি, ধৈর্য্য ও বিবেক, সকলি বিনষ্ট হয়। ক্ষুধাভিভূত ব্যক্তির প্রাণবায়ু দুঃসহ যাতনায় বহির্গত হয়। এই দুঃসহদুঃখদায়িনী, প্রাণহারিণী ক্ষুধাকে ধর্ম্মানুরোধে যে উপেক্ষা করিতে পারে, তাহার ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ সাধু কে আছে? দেখ! তুমি আপনার ও প্রাণাধিক পুত্র-কলত্র প্রভৃতির ও প্রাণের মায়া না করিয়া, ধর্ম্মকেই সার বস্তু জ্ঞান করিয়াছ। শ্রদ্ধাপূত, নিঃস্বার্থ দান অপেক্ষা মহত্তর ধর্ম্ম কি আছে? কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহাদি স্বর্গপথের কণ্টকস্বরূপ। যাহারা ঐ সকল রিপুকে জয় করিয়া যতদূর শক্তি, দান করে, সনাতন স্বর্গলোকের তাহারাই অধিকারী। তুমি একটা কপর্দ্দক দান কর, বা কোটি স্বর্ণ দান কর, তুমি রাশি রাশি দিব্য মিষ্টান্ন দান কর, বা তণ্ডুলকণা দান কর, তুমি সুধাভাণ্ড দান কর, বা জলবিন্দু দান কর, যদি সে দান, তোমার যতদূর শক্তি, তদনুরূপ হয়, যদি সে দান তোমার হৃদয়ের সুপবিত্র শ্রদ্ধা ও প্রীতি হইতে সমুদ্ভূত হয়, তবে সে সকলি তুল্যমূল্য। তোমাদের এ শক্তুদানের নিকট কোটি কোটি অশ্বমেধ ও রাজসূয় পরাভূত। অতএব তোমরা শাশ্বত ব্রহ্মলোকে গিয়া সচ্চিদানন্দ সম্ভোগ কর।

উঞ্ছবৃত্তি-কথার পরিশিষ্ট।

মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্বে উঞ্ছবৃত্তিপরিবারের কথা আছে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পর, যুধিষ্ঠির সসাগরা ধরার সার্ব্বভৌমপদে অভিষিক্ত হইয়া, মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেন। সকলে একবাক্যে বলিতে লাগিল,—এরূপ মহাযজ্ঞ, এরূপ মহাদানপুণ্য আর কোথাও কখনও হয় নাই। যুধিষ্ঠিরের জয়শব্দে সকল দেশ পূর্ণ হইল। তদীয় মস্তকে অবিরল পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। হস্তিনার রাজসভায় সেই জয়ধ্বনি ও জনকল্লোল ভেদ করিয়া, অকস্মাৎ এক মহাকায়, অদ্ভুতমূর্ত্তি নকুল উপস্থিত হইয়া মনুষ্য-ভাষায় কহিল, -তোমরা যুধিষ্ঠিরের এ অশ্বমেধের এত প্রশংসাবাদ কেন করিতেছ ? কুরুক্ষেত্রে এক উঞ্ছবৃত্তি ব্রাহ্মণের শক্তুদানের সহিত এ যজ্ঞের তুলনাই হয় না। নকুলের সেই কথা শুনিয়া সভাস্থ সকলে বিস্মিত হইয়া, আগ্রহসহকারে নকুলকে উঞ্ছবৃত্তির কথা জিজ্ঞাসা করায়, সে এই বৃত্তান্ত বলিয়াছিল। এ প্রসঙ্গে এ স্থলে আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিতেছি ;—

এই বঙ্গদেশের কোনও গ্রামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। ব্রাহ্মণ অতি দরিদ্র। গৃহে একমাত্র তাঁহার বৃদ্ধা জননী। বৃদ্ধা ভিক্ষা দ্বারা অতিকষ্টে পুত্রকে পালন করিতেন। সে গ্রামে বা নিকটবর্ত্তী স্থানে পুষ্করিণী ছিল না। দূরবর্ত্তিনী নদী হইতে অতিকষ্টে সকলকে পানীয় সংগ্রহ করিতে হইত। সে নদী গ্রীষ্মকালে

শুষ্কপ্রায় হইত। তখন স্থানীয় লোকের জলকষ্টের সীমা থাকিত না। অগত্যা সকলকে সেই নদীর পঙ্কিল জল পান করিতে হইত। সেই ব্রাহ্মণের মাতা পুত্রকে সর্ব্বদা বলিতেন,—বাবা! এ দুঃখিনী ত তোমাকে লেখাপড়া শিখাইতে পারিল না, তথাপি, যদি কখনও কোনও উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করিতে পার, এ গ্রামে একটা পুষ্করিণী কাটাইও। তোমার নিকট আমার ইহাই প্রার্থনা। আমি অনাহারে মরিলেও, এবং তুমি আমার শ্রাদ্ধ করিতে না পারিলেও, আমার দুঃখ নাই। কিন্তু তুমি এ কার্য্য করিলে, আমার জীবনের সকল কামনা পূর্ণ হইবে, আমার অক্ষয় স্বর্গলাভ হইবে।

সেই মাতৃবাক্য ব্রাহ্মণের ধ্যান, জ্ঞান ও জপমালা ছিল। অনন্তর মাতার পরলোকগমনে, মাতৃদায়ে ব্রাহ্মণ বিব্রত হইলেন। গৃহে কপর্দ্দক নাই। একখানি ভগ্ন কুটীর, কয়েকটা পুরাণ বাসন ও কয়েকখানি জীর্ণবস্ত্র ভিন্ন তাঁহার আর কোনও সম্বল ছিল না। ব্রাহ্মণ সে সমস্তই বিক্রয় করিয়া মাতৃশ্রাদ্ধে ব্যয় করিলেন। কেবল তাহা হইতে কিঞ্চিৎ অর্থ লইয়া, দুইখানি কোদাল ও কয়েকটা ঝাড়ি ক্রয় করিলেন। তদ্দ্বারা তিনি নিজ বাস্তুভূমিতে স্বহস্তে পুষ্করিণী খনন করিতে লাগিলেন। অন্নাভাবে অনেক সময় তাঁহাকে উপবাস করিতে হইত, এবং গৃহাভাবে যত্র তত্র শয়ন করিতে হইত। কিন্তু তাঁহার কোনও কষ্টেই ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি অহোরাত্র অবিশ্রান্ত একান্ত-ভাবে মাতৃনির্দেশপালনেই নিযুক্ত। ক্রমে অনাহারে ও অতিশ্রমে তিনি কঙ্কালসার হইলেন। লোকেরা তাঁহাকে "ক্ষেপা বামন"

বলিয়া উপহাস করিত। ব্রাহ্মণ অবশেষে বুঝিলেন কোনও ধনীর সাহায্য বিনা, একাকী তাঁহার দ্বারা একটী বৃহৎ জলাশয় হওয়া অসম্ভব: এ কার্য্যের জন্য তিনি অনেকের নিকট ভিক্ষার্থী হইলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁহার করুণাপূর্ণ প্রার্থনায় কেহই কর্ণপাত করিল না। কোনও ধনীর গৃহে প্রবেশ করিতে গেলে, তাঁহার সেই মলিন, সুজীর্ণ বেশ ও বিশীর্ণ আকার দেখিয়া, দ্বারপালেরা তাঁহাকে গলহস্ত দান করিত। তথাপি ব্রাহ্মণ অক্ষুব্ধ ও নিজ সঙ্কল্প হইতে অবিচলিত।

একদা তিনি শুনিলেন, কলিকাতা পাইকপাড়ার প্রসিদ্ধ ধনী, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ (১) মাতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে প্রভূত অর্থ দান করিতেছেন। সংবাদ পাইয়া তিনি সেই স্থানে গমন করিলেন। তখন উক্ত ভবনে শ্রাদ্ধ ও দানাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইযাছিল। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দের কর্ম্মচারী ও তোষামোদকারীরা তাঁহাকে ঘেরিযা সহস্রমুখে তদীয় দানকীর্ত্তি উদ্ঘোষণ করিতেছিল। তথায় দীনবেশ কৌপীনধারীর প্রবেশ অসাধ্য। বহুচেষ্টায় একদিন ব্রাহ্মণ সুযোগক্রমে দেওয়ানের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন,—বিষম জনতা। সকলেই স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশে তদীয় দানকীর্ত্তি অতিরঞ্জিত করিয়া ঘোষণা করিতেছে। ব্রাহ্মণ অকুতোভয়ে কহিলেন, ইনি এমন কি কার্য্য করিয়াছেন যে, আপনারা ইহাকে এত বাড়াইতেছেন? ইহাঁর

(১) ভারত-গভর্ণর হেষ্টিংসের সময় ভূমি ও রাজস্বের বন্দোবস্ত কার্য্যে ইনি গভর্ণমেণ্টের অন্যতম প্রধান কর্ম্মচারী ছিলেন।

মাতৃশ্রাদ্ধ, কোনও ক্রমেই আমার মতৃশ্রাদ্ধের তুল্য নহে। ব্রাহ্মণের ঐ কথা শুনিয়া, সকলেই ব্রাহ্মণের উপর রুষ্ট হইল, এবং তাঁহার উপর সুতীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল। তাদৃশ বেশ ও আকার দেখিয়া কেহ কেহ তাঁহাকে পাগল ভাবিয়া তথা হইতে বহিষ্কৃত করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু সদাশয়, গঙ্গাগোবিন্দ সকলকে নিবারণ পূর্ব্বক, সাদরে ব্রাহ্মণকে নিকটে আহ্বান করিলেন, এবং প্রণামপূর্ব্বক বিনয়মধুর বাক্যে তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক, আনুপূর্ব্বিক আত্মবৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া কহিলেন,—মহাত্মন্! আপনি আপনার বহুলক্ষ টাকা আয় হইতে কয়েক লক্ষমাত্র মাতৃশ্রাদ্ধে দান করিয়াছেন। আপনার বিশাল জমিদারি, অট্টালিকা, গৃহসজ্জা এবং দাস-দাসী ও যান-বাহন প্রভৃতি সকলি অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। কিছুরই অভাব দেখিতেছি না। কিন্তু আমার "নান্নং ন বস্ত্রং ন চ বারিপাত্রম্।" আমি ঈশ্বরী মাতৃদেবীর শ্রাদ্ধে সকলি দান করিয়াছি, একটী মৃৎপাত্রও অবশিষ্ট নাই। গঙ্গাগোবিন্দ বিস্মিত হইয়া, তাঁহার বিবরণ শুনিতে চাহিলেন। ব্রাহ্মণ তখন সাশ্রুনয়নে নিজ বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। গঙ্গাগোবিন্দ ব্রাহ্মণের কথিত ঘটনা সত্য কি না জানিবার জন্য, সে স্থানে নিজ কর্ম্মচারীকে পাঠাইলেন, এবং তাহার নিকট ব্রাহ্মণের বিবরণ সত্য জানিয়া, অচিরে সেই গ্রামে বৃহৎ দীর্ঘিকা খনন করাইলেন, এবং তাহা সেই ব্রাহ্মণের মাতার নামে উৎসর্গ করিলেন।

পতিব্রতা শাণ্ডিলীর কথা

ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির শরশয্যাগত পিতামহ ভীষ্মের নিকট সত্যধর্ম্ম শুনিতে চাহিলে, মুমূর্ষু পিতামহ ভক্তিমান পৌত্রের নিকট এই গল্পটা করিয়াছিলেন ;—

সুমনা নামে কোনও মহিলা পুণ্যবলে স্বর্গারোহণ করেন। তিনি অমরলোকে গিয়া দেখিলেন, শাণ্ডিলী নামে এক নারী স্বর্গের অত্যুচ্চ পদ অধিকার করিয়াছেন। শাণ্ডিলী জ্যোতির্ম্ময় দিব্যবসন পরিধানপূর্ব্বক দিব্যজ্যোতি দেবযানে আরোহণ করিয়া স্বকীয় পুণ্যতেজে দেবলোককে দ্বিগুণ আলোকিত করিয়া, অপ্রতিহত-প্রভাবে সর্ব্বত্র বিচরণ করিতেছেন। সুমনা তাঁহার তাদৃশ ঐশ্বর্য্য-দর্শনে বিস্মিত হইয়া একদা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আর্য্যে! আপনি কি পুণ্য করিয়া এ সম্পদ লাভ করিয়াছেন? আপনি মর্ত্ত্যলোকে কি তপস্যা করিয়া আসিয়াছেন, তাই সুরলোকে এ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেছেন? আপনার এ অসামান্য পদ কখনও সামান্য পুণ্যের ফল নহে।"

সুমনার কথায় শাণ্ডিলী মৃদুমধুর হাস্যে উত্তর করিলেন,—"ভগিনি! আমি মর্ত্ত্যলোকে যে ব্রত পালন করিয়াছি, তজ্জন্য আমাকে রক্তবস্ত্রও পরিধান করিতে হয় নাই, অথবা বল্কলও ধারণ করিতে হয় নাই। আমি মস্তকও মুণ্ডন করি নাই, জটাও বন্ধন করি নাই, তীর্থে-তীর্থেও ভ্রমণ করি নাই, উপবাসেও শরীর

শুষ্ক করি নাই। আমি গৃহাশ্রমে কয়েকটী অতি সহজ নিয়ম পালন করিয়াই এ অচিন্তনীয় বৈভব লাভ করিয়াছি। স্বামীকে প্রাণান্তেও কদাচ অহিতকর বা অপ্রিয় কথা কহি নাই। আমি সমাহিতচিত্তে দেবতা, অতিথি, পিতৃলোক ও সাধুগণের পূজা করিযাছি, পরম ভক্তিভাবে শ্বশুর-শাশুড়ী ও অন্যান্য গুরুজনের সেবা করিয়াছি, পরিজন ও ভৃত্যাদির প্রতি অকৃত্রিম স্নেহ, প্রীতি ও সহানুভূতি প্রদর্শন করিযাছি। কখনও কপটতা করিব না, ইহাই আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল। কদাচ বৃথা কথায় কালক্ষেপ করি নাই। আহার্য্য শোভার অভিলাষ করি নাই। অযথাস্থানে গিযা দণ্ডায়মান হই নাই। গোপনে বা প্রকাশ্যে, স্বপ্নে বা কল্পনায়ও কুৎসিত কার্য্যে কদাচ আমার প্রবৃত্তি হয় নাই। কখনও নির্লজ্জ ভাবে হাস্য-পরিহাস করি নাই। আমার স্বামী স্থানান্তর হইতে গৃহে প্রত্যাগত হইলে, আমি তৎক্ষণাৎ অন্য কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক তাঁহার চরণ ধৌত করিয়া, তাঁহাকে পবিত্র আসনে বসাইযা, একান্তভাবে তাঁহার পরিচর্য্যা করিতাম। স্বামী যে যে দ্রব্যে অভিলাষ করিতেন না, যে ভক্ষ্য-ভোজ্য-পানীয় ভালবাসিতেন না, আমিও সে সকল পরিত্যাগ করিয়াছিলাম। অতি প্রত্যূষে উঠিয়াই আমি গৃহকর্ম্মে স্বয়ং নিযুক্ত হইতাম এবং পরিজনগণকেও যথাযোগ্য নির্দ্দিষ্ট কার্য্যে নিযুক্ত রাখিতাম। পতি কোনও কার্য্যানুরোধে বিদেশে যাইলে, আমি তদীয় কল্যাণকামনায বিবিধ মঙ্গল কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতাম, এবং সর্ব্বদা সুসংযত ভাবে ও অতি সাবধানে তদীয় প্রিয় ও হিতকর কার্য্যে নিবিষ্ট থাকিতাম। পতির অনুপস্থিতিকালে গন্ধ, মাল্য, অনুলেপন,

বেশভূষা প্রভৃতি ভোগ্য পদার্থ স্পর্শও করিতাম না। আমি প্রাণান্তেও পতির সুনিদ্রা ভঙ্গ করিতাম না। কদাচ তাঁহাকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে দিতাম না। তাঁহার শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ও শান্তির প্রতি সদাই একাগ্র দৃষ্টি রাখিয়া চলিতাম। গোপনীয় বিষয় কদাপি প্রকাশ করিতাম না। গৃহ ও গৃহসামগ্রী সর্ব্বদাই সুপরিষ্কৃত রাখিতাম। আত্মীয়, প্রতিবেশী, অতিথি, অভ্যাগত, দীন-দুঃখী, কাঙ্গাল, কেহই আমার গৃহে আসিয়া অতৃপ্ত থাকিতেন না, সকলকেই যথাশক্তি সম্মান ও সেবা করিতাম। এক কথায়, আমার পতিদেবতার ও শ্বশুরকুলের ঐহিক ও পারত্রিক প্রভূত কল্যাণসাধনই আমার জীবনের অদ্বৈত ব্রত ছিল। একপুত্রা জননী যেরূপ নিজ দেহ, মন, প্রাণ ও আত্মাকে নির্গলিত করিয়া, সমস্ত সারাংশটুকু তাহার জীবন-সর্ব্বস্ব, বহু-সাধনা-লব্ধ, রুগ্ন শিশুসন্তানের আরোগ্যবিষয়ে অর্পণ করে, আমিও তেমনি যাবজ্জীবন পতিসেবায় অকৈতবে ও উৎফুল্লচিত্তে আমার সমস্ত শক্তি নিয়োজিত করিয়াছিলাম।

যে নারী ভক্তিযোগে এই সকল নিয়ম পালন করেন, তিনি সনাতন দিব্যলোকে মহতী পূজা লাভ করেন।

—

শাণ্ডিলী-কথার পরিশিষ্ট

এই ক্ষুদ্র উপাখ্যানটী দ্বারা বুঝা যায় যে,—ঐহিক বা পারত্রিক উৎকৃষ্ট শ্রেয়োলাভের পন্থা সুন্দর ও সরল। বরং অধঃপাতের পথ অতি বিষম, রোগ-শোক-পরিতাপ-বন্ধন-ব্যসনাদি অশেষ ক্লেশরাশির নিদান। সুসংযতভাবে সাধুসেবিত সদাচারমার্গে প্রবৃত্ত হইলেই মানব, ঐহিক ও পারত্রিক একাধারে সর্ব্বকল্যাণ লাভ করিয়া আপন জন্ম ও কর্ম্মকে সার্থক করিতে পারে।

অসংযত ইন্দ্রিয়গ্রাম সর্ব্বদুঃখের মূল। এজন্য শাস্ত্রকারেরা এক কথায় ইন্দ্রিয়দমনকেই অসীম কল্যাণপরম্পরার একমাত্র নিদান বলিয়াছেন (১)। অসংযত ইন্দ্রিয় লইয়া স্বর্গে গেলেও অত্যাচার ঘটিবে। যাহারা কলুষিত চিত্ত লইয়া বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাস গ্রহণ করেন, তাঁহারা নিরতিশয় ভ্রান্ত। আভ্যন্তর রোগের প্রতিকার বা অন্তঃসংস্কার না করিয়া, যাঁহারা যতিচিহ্ন

(১) "আপদাং কথিতঃ পন্থা ইন্দ্রিয়াণামসংযমঃ।
তজ্জয়ঃ সম্পদাং মার্গো যেনেষ্টং তেন গম্যতাম্ ॥"

— অনর্থের পথ হয় ইন্দ্রিয় উদ্দাম,
সম্পদের পথ হয় ইন্দ্রিয়-সংযম,
এই দুই পথ তুমি জানিয়া নিশ্চয়,
সেই পথে চল যাহে ইষ্টলাভ হয়।

(হিতোপদেশ)

ধারণ করেন, তাঁহারা ছাদ্মিক-লোকবঞ্চক-'বকব্রতী'-'বিড়ালব্রতী' ইত্যাদি আখ্যায় (১) ভূষিত হন।

"বনেঽপি দোষাঃ প্রভবন্তি রাগিণাং
গৃহেঽপি পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ।
অকুৎসিতে কর্ম্মণি যঃ প্রবর্ত্ততে
নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্॥"
—এ ভবে ইন্দ্রিয়জয় নাহি হয় যার,
বনে যাইলেও তার ঘটে অনাচার;
আর যার সমস্ত ইন্দ্রিয় বশে রয়,
গৃহেও থাকিয়া তার তপঃসিদ্ধি হয়।

---

(১) 'বকব্রতী'-'বিড়ালব্রতী' —

"ধর্ম্মধ্বজী সদা লুব্ধশ্ছাদ্মিকো লোকবঞ্চকঃ।
বৈড়ালব্রতিকো জ্ঞেয়ো হিংস্রঃ সর্ব্বাভিসন্ধকঃ॥
অধোদৃষ্টির্নৈষ্কৃতিকঃ স্বার্থসাধনতৎপরঃ।
শঠো মিথ্যাবিনীতশ্চ বকব্রতচরো দ্বিজঃ॥"

(মনু, ৪র্থ অধ্যায়, ১৯৫, ১৯৬।)

—যে পরধনে লোলুপ, ছদ্মবেশী ও লোকবঞ্চক, যে লোকসমক্ষে ধর্ম্মের আড়ম্বর করিয়া নিজমুখে ও পরমুখে নিজ ধার্ম্মিকতা প্রচার করে, নিত্যকর্ম্মের ন্যায় পরহিংসার অনুষ্ঠান করে, এবং অন্যের গুণ সহিতে না পারিয়া, সকলকে নিন্দা করিয়া বেড়ায়, তাহাকে 'বিড়ালব্রতী' বলে।—যে বিনয় দেখাইবার জন্য সর্ব্বদা অধোদৃষ্টি ও বিমর্ষভাবাপন্ন থাকে, স্বার্থসাধনার্থে পরের সর্ব্বনাশ করিতে কুণ্ঠিত হয় না, নিষ্ঠুর, শঠ ও কপটীর একশেষ, তাহাকে 'বকব্রতী' কহে।

বীতরাগ, পুণ্যপথে প্রবৃত্ত যে জন,
গৃহই তাহার পক্ষে পুণ্য তপোবন।

নির্ম্মল আত্মাই ধর্ম্মের ক্ষেত্র। যিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়বিকার হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া সর্ব্বত্র সমদর্শন হইয়াছেন, তিনি বনেই গমন করুন, আর গৃহেই অবস্থান করুন, সকল স্থানই তাঁহার পক্ষে পবিত্র তপোবন। যেমন স্পর্শমণির স্পর্শে সকলি স্বুবর্ণ হয়, তেমনি পবিত্র আত্মার স্পর্শে সকলি পুণ্যময় হয়।

গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া কতিপয় সহজ, সরল, সামান্য সামান্য নিয়ম সাবধানে পালন করিলে, মানব অত্যুৎকৃষ্ট-অবস্থা-লাভে ধন্য হয়। অরণ্যবাস, উপবাস, জটাবল্কল-কমণ্ডলু প্রভৃতি ধারণ, ভস্মানুলেপন, বাত-বর্ষ-শীতাতপ-জনিত ক্লেশপরম্পরা-সহন, এ সকল ক্লেশ স্বীকার না করিয়া, ঈশ্বরপরায়ণ হইয়া, সুসংযত ও নির্ম্মলভাবে সহজ সহজ গার্হস্থ্য-কৃত্যগুলি পরিপালন করিলে, মানব শাশ্বত শান্তিধামের অধিকারী হইতে পারে। মোহান্ধ মানব দুই দিনের অলীক বন্ধুকে পাইয়া অনন্তকালের সখাকে বিস্মৃত হয়। ধন, জন, জীবন, যৌবন, কিছুই চিরদিনের সখা নহে, ধর্ম্মই মানবের অনন্তকালের সখা। নির্লিপ্তভাবে সংসারে থাকিয়া নিষ্কাম পরহিতব্রত মানবের সারধর্ম্ম (১)।

(১) যুধিষ্ঠির শরশয্যাশায়ী ভীষ্মের নিকট, ধর্ম্ম, সুখ স্নেহ ও পাণ্ডিত্য, এই চারিটীর সহজ ও সংক্ষিপ্ত লক্ষণ জিজ্ঞাসা করায় বলিয়াছিলেন,—

(একাধারে প্রশ্নোত্তর।)

যুধি। "কো ধর্ম্মঃ ?"

ভীষ্ম। "ভূতদয়া।"

যুধি। "কিং সৌখ্যম ?"

ভীষ্ম। "অরোগিতা জগতি জন্তোঃ।"

যুধি। "কঃ স্নেহঃ ?"

ভীষ্ম। "সদ্ভাবঃ।"

যুধি। "কিং পাণ্ডিত্যং ?"

ভীষ্ম। "পরিচ্ছেদঃ।"

পূর্ণশ্লোক যথা ;—

"কো ধর্ম্মো ভূতদয়া কিং সৌখ্যমরোগিতা জগতি জন্তোঃ।
কঃ স্নেহঃ সদ্ভাবঃ কিং পাণ্ডিত্যং পরিচ্ছেদঃ॥"

(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব।)

অর্থাৎ সর্ব্বভূতে অব্যভিচারিণী করুণাই ধর্ম্ম। যাবজ্জীবন অক্ষুণ্ণ স্বাস্থ্যই জীবের সুখ। সর্ব্বভূতে হৃদয়ের অবিকারী প্রেমই স্নেহ। হিতাহিত-কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিচারশক্তিই পাণ্ডিত্য। এই পাণ্ডিত্যই লোককে সর্ব্বসঙ্কট হইতে উদ্ধার করে

পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ

মহারাজ কুরুকুলাবতংস পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ-ঘটনা 'মহাভারত' ও 'ভাগবত' নামক ধর্ম্ম-সাহিত্য-জগতের অতুলনীয়, মহীয়ান্, লোকপাবন কীর্ত্তিস্তম্ভের মূল। লোকপাবনী ভাগীরথী যেমন প্রথমতঃ গোমুখী-রূপ ক্ষুদ্র উৎস হইতে উত্থিত এবং ক্রমে বর্দ্ধিত ও প্রসারিত হইয়া, উত্তাল তরঙ্গভঙ্গে অসংখ্য গিরিকূট ও মত্তমাতঙ্গকুলকে বিচূর্ণিত ও উৎসারিত করিয়া, নতোন্নত ভূভাগসকলকে একাকার করিয়া প্রবাহিতা। মানব হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত অনন্ত জীবমণ্ডলীর যুগপৎ ক্ষুধা-তৃষ্ণা-আধি-ব্যাধি-সন্তাপ-প্রশমনের সঞ্জীবনী সুধাধারারূপে সেবমানা, নানারোগের বীজাণুবিনাশিনী "মা পতিতপাবনী গঙ্গা" (১) নামে ত্রিলোকী-বন্দিতা, বিশ্ববাসীর অতুল ভক্তি-প্রীতি ও পূজার আধার, তেমনি পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপঘটনাই ভারতকথা ও ভাগবত-কথারূপ অত্যাশ্চর্য্য ও অনির্ব্বাচ্য আধ্যাত্মিক-বিভূতিময়ী কাব্য-জগৎসৃষ্টির সূত্রপাত।

---

(১) মহাকবি ভবভূতি রামায়ণকথাকে জগন্মাতা ও গঙ্গার সহিত উপমা দিয়াছেন,—

"মাঙ্গল্যা চ মনোহরা চ জগতো মাতেব গঙ্গেব চ" উত্তররচিত উপমাটী সম্পূর্ণ সুসঙ্গত। পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণের ভূয়সী গবেষণা ও পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, গঙ্গাজলে পতিত হইবামাত্র যাবতীয় রোগের বীজাণু বিনষ্ট হয়।

দুরাত্মা, ব্রাহ্মণকুলকলঙ্ক, নরপিশাচ, দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা কর্ত্তৃক ঘোর নিশীথে শিবিরমধ্যে প্রসুপ্ত, কৌরবকুলসর্ব্বস্ব দ্রৌপদীর পঞ্চ শিশু সন্তান বীভৎসভাবে নিহত হইলে, কুরুকুল নির্ম্মূল হইল। পঞ্চপাণ্ডবের কুলতন্তু আর কেহই রহিল না। এইরূপে উক্ত রাজবংশ পরিক্ষীণ হইলে, উত্তরার গর্ভে অভিমন্যুতনয় মহাত্মা পরীক্ষিৎ জন্মগ্রহণ করেন। পরীক্ষিৎ সর্ব্বাংশে তাঁহার পিতৃপিতামহের উপযুক্ত বংশধর। যুধিষ্ঠিরের ন্যায় তাঁহারও প্রজারঞ্জনাদি গুণগ্রাম সর্ব্বত্র প্রখ্যাত হইল। ফলতঃ তিনি সর্ব্বাংশে ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের তুল্য ভাগ্যবান্ ছিলেন।

মন্বাদি ধর্ম্মশাস্ত্রকারেরা মৃগয়াকে ব্যসনমধ্যে গণনা করিলেও রাজারা সময়ে সময়ে এ প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিতেন না। একদা তিনি যথোচিত সুসজ্জিত ও অনুচরবর্গে পরিবৃত হইয়া মৃগয়ায় গমন করিলেন। তিনি অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এক মৃগের অনুসরণ পূর্ব্বক একাকী বহুদূর গিয়া পড়িলেন। শেষে সে মৃগও অদৃশ্য হইল। তখন মধ্যাহ্ন-মার্ত্তণ্ডের প্রচণ্ড তাপে ধরণী দগ্ধ হইতেছিল। রাজা পরিশ্রান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া ইতস্ততঃ জলের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। কিন্তু কুত্রাপি জলাশয় দেখিতে না পাইয়া, দৈবযোগে এক ঋষির আশ্রমে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখিলেন, তথায় এক মুনি যোগাসনে আসীন। তিনি প্রশান্ত, নিশ্চল ও নিমীলিতলোচন। তিনি তখন গভীর ব্রহ্মযোগে তন্ময়, তাঁহার মন-প্রাণ-বুদ্ধি স্ব স্ব বিষয় হইতে প্রত্যাহৃত। তিনি জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থা-ত্রয়ের অতীত। জটাজুটে ও মৃগচর্ম্মে তদীয় কলেবর সমাচ্ছন্ন।

প্রাণশোষিণী পিপাসায় শুষ্ককণ্ঠ ও শুষ্কতালু হইয়া, পরীক্ষিৎ সেই যোগিবরের নিকট জল যাচ্ঞা করিলেন। কিন্তু মুনি সমাধিস্থ, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান তিরোহিত, তিনি রাজার আগমনই জানিতে পারেন নাই, কিরূপে তাঁহার সমাদর করিবেন? কিন্তু মহারাজ মোহবশতঃ বা অলঙ্ঘ্য দৈবনির্বন্ধবশতঃ মনে করিলেন,—অহো! এ মুনি আমাকে অবজ্ঞা করিলেন। আমি তৃষ্ণার্ত্ত অতিথি, বিশেষতঃ আমার রাজোচিত বেশভূষাদি দেখিয়া আমাকে কেহই সামান্য ব্যক্তি বলিয়া জ্ঞান করিতে পারে না। পূর্ব্বে সে ক্ষমাশীল, ধৈর্য্যসাগর রাজর্ষির চিত্তে কখনও ক্রোধোদয় হয় নাই, কিন্তু ক্ষুৎপিপাসায় অতিমাত্র কাতর হওয়ায়, সে সময় তাঁহার মনে হঠাৎ ক্রোধোদয় হইল। তিনি সেই আশ্রম হইতে নির্গমণকালে অদূরে একটা মৃতসর্প দেখিতে পাইলেন। তিনি তাহা ধনুষ্কোটি দ্বারা আকর্ষণ পূর্ব্বক ঋষির স্কন্ধদেশে সংলগ্ন করিয়া স্বনগরে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

মহর্ষি শমীক ধ্যানস্থ, মৌনী ও বাহ্যজ্ঞানশূন্য বলিয়া রাজার সে অপরাধ আদৌ জানিতে পারেন নাই। সেই মহর্ষিবরের শৃঙ্গী নামক এক তরুণবয়স্ক পুত্র ছিলেন। যে সময় আশ্রমে এ ঘটনা হয়, সে সময় শৃঙ্গী সমবয়স্ক মুনিকুমারগণের সঙ্গে আশ্রমের কিয়দ্দূরে ক্রীড়া করিতেছিলেন। তিনি পিতার এ ঘটনার কথা কিছুই জানিতেন না। শৃঙ্গী অতি দাম্ভিক ও উদ্ধতস্বভাব। সহজেই ক্রোধের বশীভূত। তিনি ক্রীড়াকালে নিজ পিতার ও নিজের প্রভাবের বিষয়ে শ্লাঘা করায়, তাঁহার কোনও সহচর বিদ্রূপ করিয়া বলিলেন, ওহে শৃঙ্গিন! এত দম্ভ কেন? তুমি তোমার যে

পিতার বিষয়ে এত দম্ভ করিতেছ, গৃহে গিয়া দেখ! তাঁহার কি দুর্দ্দশা! আমাদেব মহারাজ পরীক্ষিৎ আশ্রমে আসিয়া, স্বয়ং তাঁহার স্কন্ধে মৃতসর্প দিয়া তাঁহার অপমান কবিয়া গেলেন। এই ত তোমাদের সম্মান? অতএব আর কদাচ আত্মশ্লাঘা করিও না। জ্বলদনলে ঘৃতাহুতির ন্যায় সেই কথায শৃঙ্গীর রোষানল জ্বলিযা উঠিল। তিনি তৎক্ষণাৎ কমণ্ডলু-জলে আচমনপূর্ব্বক, নির্ঘাত-মেঘ যেরূপ বজ্রাগ্নি উদ্গিরণ করে, সেইরূপ এই ভীষণ শাপবাণী উচ্চারণ করিলেন,—"কঠোরতপা, মৌনব্রতী, জরাজীর্ণ, নিরীহ মদীয় পিতার স্কন্ধে যে পাপিষ্ঠ মৃতসর্প প্রদান করিয়াছে, অদ্য হইতে সপ্তম দিবসে মহাবিষধর তক্ষক, সেই দ্বিজাবমন্তা, কুরু-কুলকলঙ্ক রাজাধমকে দংশন করিয়া যমালয়ে প্রেরণ করিবে।"

এইরূপ শাপবাণী উচ্চারণ করিযা, কম্পান্বিত কলেবরে ও দ্রুতপদে ঋষিকুমার আশ্রমে আসিলেন। দেখিলেন, সত্যসত্যই তাঁহার পিতার গলদেশে মৃতসর্প রহিয়াছে। মহর্ষি গভীর যোগে নিমগ্ন। সে ঘটনার তাঁহার কিছুমাত্র উদ্বোধ নাই। পিতার সে দশা প্রত্যক্ষ করিয়া যুগপৎ ক্রোধে ও দুঃখে শৃঙ্গীর নেত্র হইতে অশ্রু ঝরিতে লাগিল। তিনি রোষভরে গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। সেই শব্দে ঋষির ধ্যানভঙ্গ হইল। ঋষি নয়নদ্বয় উন্মীলন করিয়া দেখিলেন,—তাঁহার স্কন্ধে একটা মৃতসর্প লম্বিত। তিনি সর্পটাকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন,—বৎস! কি নিমিত্ত রোদন করিতেছ? কেহ কি তোমার অপমান করিয়াছে? তখন শৃঙ্গী ক্রোধে ও দুঃখে ফুলিতে ফুলিতে সমস্ত ঘটনা বলিলেন।

ক্ষমাশীল, ধৈর্য্যসাগর, শান্তিনিষ্ঠ মহর্ষি যখন শুনিলেন, লোক-পালতুল্য রাজেন্দ্র পরীক্ষিৎ অজ্ঞানকৃত সামান্য অপরাধে তাদৃশ সাংঘাতিক অভিশাপ প্রাপ্ত হইয়াছেন, তখন তিনি পুত্রের তাদৃশ ঘোরতর নৃশংস কার্য্যের অনুমোদন না করিয়া, অতিমাত্র ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি হঠাৎ রোষের বশীভূত হইয়া অতি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ! হায়! তুমি গুরুতর পাপে লিপ্ত হইয়াছ। লঘুপাপে ভীষণ দণ্ড বিধান করা হইয়াছে। লোকরক্ষক রাজারা কদাচ শাপের যোগ্য নহেন। নরদেব মহীপাল সকলের ঈশ্বর-তুল্য পূজ্য। সে নররূপিণী মহতী দেবতাকে সামান্য মানব বলিয়া জ্ঞান করিতে নাই। সমস্ত শাস্ত্রকারগণ একবাক্যে প্রজাপালক রাজাকে স্বয়ং নারায়ণের ও সর্ব্বদেবতার সারাংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লোকরক্ষক রাজা না থাকিলে, সর্ব্বত্রই ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয়। প্রবলের অত্যাচারে দুর্ব্বলেরা নিপীড়িত ও বিধ্বস্ত হয়। গুরু-লঘু, হিতাহিত, ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার না করিয়া অধিকাংশ লোক যদৃচ্ছাপ্রবৃত্ত হইয়া, সমাজবন্ধন ও লোক-মর্য্যাদাকে ছিন্নভিন্ন করে। দেশমধ্যে দস্যু-তস্করাদির এরূপ দৌরাত্ম্য ঘটে, যে, সেই সকল দুর্ব্বৃত্তের হস্ত হইতে নিজ নিজ স্ত্রী, পুত্র, পরিবার ও ক্ষেত্র, পশু, ধনরত্নাদি রক্ষা করা অসাধ্য হয়। দুর্ব্বৃত্তগণের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে ক্রমে আর্য্যকুল নির্ম্মূল ও নানা বর্ণসঙ্কর উদ্ভূত হইতে থাকে। রাজাই লোকসমাজের ধর্ম্মসেতুর প্রতিষ্ঠাতা ও রক্ষাকর্ত্তা। রাজার অভাবে লোকসমাজ অসীম দুর্গতিসাগরে মগ্ন হইয়া, শেষে নরকতুল্য হইয়া পড়ে। রক্ষাভাবে লোকসকল বাত্যা-বিধূনিত মেঘসঙ্ঘের ন্যায় ছিন্নভিন্ন

হইয়া যায়। জগতের অধিকাংশ লোক কেবল রাজদণ্ডভয়েই (১) ন্যায়পথে প্রবৃত্ত। সর্ব্বরক্ষয়া রাজশক্তি লোকসমাজের ন্যায়মার্গে প্রবর্ত্তিকা, দিব্যপ্রভাবশালিনী সাক্ষাৎ ব্রহ্মদণ্ডস্বরূপা। অজেয় রাজশক্তিপ্রভাবে মানবগণের আর্য্যধর্ম্ম ও সদাচার রক্ষিত হয়। নিশীথে জীবগণ প্রসুপ্ত ও চরাচর নিস্তব্ধ হইলেও, একমাত্র রাজশক্তি জীবজীবনী, স্নেহময়ী জননীর ন্যায় অলক্ষিত ভাবে লোকমণ্ডলীকে অশেষ সঙ্কট হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। এইজন্যই রাজ্যেশ্বর প্রজার সর্ব্বেশ্বর, ধর্ম্মমূর্ত্তি ও সাক্ষাৎ ঈশ্বররূপে পূজিত, সকলেরি নমস্য, সকলেরি ভক্তি-প্রীতি-পূজার ও কৃতজ্ঞতার আধার। ধর্ম্মপ্রাণ সাধুরা প্রাতে উঠিয়া, যেমন ইষ্টদেবতার তেমনি নরদেবতা মহীপালের প্রণাম করিয়া থাকেন এবং কায়মনোবাক্যে রাজশ্রীর সর্ব্বাঙ্গীণ কল্যাণ প্রার্থনা করিয়া থাকেন। হে পুত্র! আমরা সেই ধর্ম্মশীল, প্রজারঞ্জন, মহারাজ পরীক্ষিতের অধিকারে পরম সুখে বাস করিতেছি। একমাত্র তাঁহারি সুশাসনে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়া বিপুল ধর্ম্মাচরণ করিতেছি। বৎস! আমি অহরহঃ গভীর কৃতজ্ঞতা ভরে নরনাথের কল্যাণ কামনা করি। কারণ, তাঁহার কল্যাণেই আমাদের ও সমস্ত জনপদের কল্যাণ।

পুত্র! তুমি অল্প বালক, এখনও তোমার হিতাহিত-বিবেক জন্মে নাই। তুমি নিজ পিতার ও নিজের তপোবলে গর্ব্বিত। কিন্তু যিনি দেশরক্ষক, প্রজাপালক, সকলের দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা, তাঁহার তপোবল যে সর্ব্বোপরি। তাঁহার অধিকারে যে স্থানে

(১) "সর্ব্বো দণ্ডজিতো লোকো দুর্লভো হি শুচির্নরঃ। (মনু)

যত তপোধন বাস করেন, এবং তাঁহারা প্রত্যেকে যত তপোবল সঞ্চয় করেন, সমষ্টীভূত সে সমস্ত তপঃফলের রাজা ষষ্ঠাংশভাগী। এইজন্যই প্রজাপালক মহীপাল 'রাজর্ষি' নামে অভিহিত। তিনি সুবিশাল সাম্রাজ্যরূপ আশ্রমের কুলপতি। তাঁহার পুণ্যের ও প্রভাবের ইয়ত্তা নাই। তিনি এই শাপরূপাস্ত্র জ্ঞাত হইয়া অনায়াসে আমাদের দণ্ডবিধান করিতে পারেন। কিন্তু অকলঙ্ক চন্দ্রবংশের ক্ষমানিধি নরপতিরা কাহারও প্রতি, বিশেষতঃ তাপস-গণের প্রতি প্রতিহিংসা করেন না। হা হতভাগ্য সন্তান! তুমি যে কি দুষ্কর্ম্ম করিয়াছ! তাহা আর বলিয়া কি জানাইব? পিতৃদ্রোহ, আচার্য্যদ্রোহ, ভ্রাতৃদ্রোহ প্রভৃতি এ জগতে যতপ্রকার দ্রোহ আছে, রাজদ্রোহ সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর মহাপাপ। কেননা, অন্যান্য দ্রোহে ব্যক্তিবিশেষের বা পরিবারবিশেষের অনিষ্টপাত, কিন্তু রাজদ্রোহে সর্ব্বসাধারণের অনর্থপাত। একাধারে রাজাই সর্ব্বলোকের সমষ্টি। অসংখ্য জনমণ্ডলীর নেতা, দণ্ডধর মহীপাল না থাকিলে, লোকসমাজ, মহাসমুদ্রে অকর্ণধারা তরণীর ন্যায় নিমগ্ন হয় (১)। একমাত্র নরপতি বা রাজশক্তিই লোকসমাজের ধর্ম্মসেতুস্বরূপ। সাক্ষাৎ ঈশ্বরকৃপারূপী সে সনাতন সেতু ভগ্ন হইলেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। ভীষণ পাপের স্রোত অনিবার্য্য বেগে অজস্র ধারায় প্রবাহিত হইয়া জীবলোককে ঘোর নরকতুল্য

---

(১) "যদি ন স্যান্নরপতিঃ সম্যঙ্‌নেতা ততঃ প্রজা।
অকর্ণধারা জলধৌ নিমজ্জেত্তেহ নৌরিব॥"
(মহাভারত)

করিয়া তুলে। রাজবিধানে বা রাজশাসনে কোনও দোষ বা ত্রুটি ঘটিলে, সুবিনীত ভক্তিমান্ সন্তান যে ভাবে আপন পিতামাতার নিকট আত্মদুঃখ নিবেদন করে, সেইভাবেই রাজসকাশে আত্মদুঃখ জানাইতে হয়।

"শীলেন হি ত্রয়ো লোকা জেতুং শক্যা ন সংশয়ঃ।
ন হি কিঞ্চিদসাধ্যং বৈ ভবে শীলবতাং ভবেৎ॥"

একমাত্র চরিত্ররূপ ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা ত্রিভুবন জয় করা যায়। এ সংসারে যিনি সেই বিশ্বপ্রেমরূপ দিব্যাস্ত্রে বলীয়ান, তাঁহার অসাধ্য কিছুই নাই। অকৈতব প্রেম, ভক্তি, বিনয়, শ্রদ্ধা, প্রীতি ইহারা বিশ্ব জয় করে। অথচ ইহাতে রণসজ্জা নাই, রক্তপাত নাই, অর্থক্ষয় নাই, বিভীষিকা নাই।

অহো! সে প্রজাপালক নরপতি অতি যশস্বী ও পরম ভগবদ্ভক্ত। তিনি নিতান্ত শ্রান্ত ও ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় নিরতিশয় কাতর হইয়া, আমাদের আশ্রমে আসিয়া জল প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অহো! দুর্দ্দৈব! তিনি এ শান্তরসাস্পদ তপোবনে সুশীতল পানীয়ের পরিবর্ত্তে কঠোর কালকূট লাভ করিলেন! তুমি রোষ-পিশাচের বশবর্ত্তী হইয়া যে মহাপাপ করিয়াছ, তাহার প্রায়শ্চিত্ত দেখি না। আমি তোমার পিতা বলিয়া, এই পাতক আমাকে ও আমাদের পুণ্যোজ্জ্বল ঋষিবংশকে চিরকলঙ্কিত করিবে। অধিক কি, অতঃপর তোমাকে আমার পুত্র বলিযা পরিচয় দিতে লজ্জা বোধ হইতেছে। ক্ষমা সর্ব্বলোকেরই অমূল্য ভূষণ, বিশেষতঃ ঋষিবংশের।

"ক্ষমা তেজস্বিনাং তেজঃ ক্ষমা ব্রহ্ম তপস্বিনাম্।
ক্ষমা সত্যবতাং সত্যং ক্ষমা ব্রহ্ম ক্ষমা শমঃ॥"

ক্ষমাই তেজস্বীর তেজ, তপস্বিগণের ক্ষমাই ব্রহ্ম, সত্যশীলের ক্ষমাই সত্য, ক্ষমা ব্রহ্ম ও শান্তির নিদান।

মহারাজ পরীক্ষিৎ সহজ ধার্ম্মিক। তাঁহার কখনও এরূপ চিত্তবিকার হয় নাই। কিন্তু ক্ষুধায় তৃষ্ণায় বিহ্বল হওয়ায়, এবং মুনি তাঁহাকে অবজ্ঞা করিলেন, ভাবিয়াই মুনির প্রতি সহসা ক্রোধোদয় হইয়াছিল। মহাত্মার ক্ষমাই স্বাভাবিক ভাব, ক্রোধ আগন্তুক ভাব। তিনি গৃহে গমন করিয়া, নিজ অপরাধ বুঝিতে পারিলেন। মনে মনে উক্ত বিষয় যতই আলোচনা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার হৃদয়ে প্রবল অনুতাপানল প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। দুর্ব্বিষহ অনুতাপের জ্বালায় তাঁহার সে প্রাণ-শোষিণী পিপাসার জ্বালা বিলীন হইল। তদানীন্তন ভূপালগণ ঋষি-তপস্বি-ব্রাহ্মণ-সাধুগণের পরম ভক্ত ছিলেন। বিশেষতঃ চন্দ্র-সূর্য্যাদি বংশের রাজগণের বেদে, ব্রহ্মে ও ব্রাহ্মণগণে ভক্তি অতুলনীয় ছিল। তদানীন্তন ব্রাহ্মণেরাও তপঃস্বাধ্যায়সম্পন্ন ও ব্রহ্মতেজে প্রদীপ্ত হুতাশনতুল্য ছিলেন। পৃথ্বীশ্বর রাজন্যগণের মণি-রত্ন-মাণিক্য-বিভাষিত-কিরীট-দীপ্ত মৌলিমালা ব্রাহ্মণ-পদতলে বিলুণ্ঠিত হইত। এ পূজা বর্ণবিশেষ বলিয়া নহে, এ পূজা বিদ্যার। "বিদ্যা সর্ব্বত্র পূজ্যতে." আধ্যাত্মিক উৎকর্ষের গৌরব সর্ব্বকালে সর্ব্বত্রই এইরূপ।

মহারাজ অন্তঃপুরে একাকী নিরতিশয় আকুল ভাবে অনুতাপ করিতেছেন, দহ্যমান হৃদয়ে নিজ প্রায়শ্চিত্তের উপায় চিন্তা করিতেছেন, এমন সময় প্রতীহারী আসিয়া সংবাদ দিল,—মহারাজ! শমীক ঋষির আশ্রম হইতে তদীয় সন্দেশ লইয়া, গৌরমুখ নামে

তাঁহার এক শিষ্য আসিয়াছেন। তিনি অবিলম্বে রাজদর্শন লাভ করিতে ইচ্ছা করেন। এই কথা শ্রবণমাত্র মহারাজ আস্তেব্যস্তে আসিয়া পরমাদরে ও পরম-ভক্তি-সহকারে অভ্যাগত ঋষি-শিষ্যের অভ্যর্থনা ও আতিথ্য করিয়া, তাঁহাকে মহর্ষির কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজার অসামান্য ভক্তি, সৌজন্য ও বিনয় দর্শন করিয়া, এবং সেই ভয়ঙ্কর সংবাদ তাঁহাকে জানাইতে হইবে ভাবিয়া, ঋষি-শিষ্য দারুণ মনস্তাপে দগ্ধ হইতে লাগিলেন। কিন্তু গুরুদেবের আজ্ঞা অবিচারে ও অবিলম্বে পালনীয়। আর ইতস্ততঃ করিলে চলিবে না, এজন্য অকালে বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় সেই নিদারুণ ব্রহ্মশাপ তাঁহাকে জানাইলেন। সেই কথা বলিবার সময় তাঁহার নয়নযুগল অশ্রুপ্লাবিত ও হৃদয় বিদীর্ণ হইল। কিন্তু স্বয়ং মহারাজ স্থির-ধীর-প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় অচল ও নির্ব্বিকার। শোকের পরিবর্ত্তে তদীয় মুখমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব আনন্দ-শান্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইল। যেন তাঁহার মর্ম্ম হইতে অরুন্তুদ শল্য উদ্ধৃত হইল। ভাবিলেন, অহো! আমি এতদিন বিষয়াসক্ত ছিলাম, আজি সে পরলোকনাশিনী, পরমার্থপথের কণ্টকরূপা বিষয়পিপাসা তিরোহিত হইল। এক্ষণে হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় বৈরাগ্যভাব উপস্থিত হইতেছে। অতএব এ তক্ষক-বিষ আমার পক্ষে প্রাণপ্রদ অমৃত। ঐহিক সুখের হেয়তা তিনি ইতঃপূর্ব্বেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাহা চিত্ত হইতে উন্মূলিত করিয়া, ঈশ্বরে সম্পূর্ণরূপে আত্মাকে সমাহিত করিলেন।

মহারাজ পরমাদরে ঋষিশিষ্যকে বিদায় করিয়া, জীবনের অবশিষ্ট কয়েকটী দিন সুরধুনীতটে ভগবৎসাধনায় অতিবাহিত

করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি তক্ষক-দংশন হইতে আত্ম-রক্ষার উপায়বিধানে সম্পূর্ণ উদাসীন হইলেও, রাজপরিবার ও রাজভক্ত প্রজাবৃন্দ অতিমাত্র নির্ব্বন্ধসহকারে নদীতীরে তদীয় বাসের জন্য একটী সুদৃঢ় এবং বজ্রদ্বারাও অভেদ্য ও অচ্ছিদ্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহা সমন্তাৎ বিষঘ্ন পদার্থে ও বিশ্বস্ত বিষবৈদ্যবৃন্দে দৃঢ়রূপে সুরক্ষিত করিলেন। আশীর্ব্বাদক ঋষি-তাপস প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর সকলেরি তন্মধ্যে প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হইল। তিনি তথায় যথাবিধি প্রায়োপবেশন অবলম্বন করিলেন। তিনি সেই ব্রহ্মশাপ শ্রবণমাত্র নিজ বংশধর, বিনীত ও সমস্ত রাজগুণে সমলঙ্কৃত, যুবা পুত্র জনমেজয়কে যথাবিধানে রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। এজন্য পার্থিব কোনও বিষয়েই আর তাঁহার চিন্তার কারণ ছিল না। এক্ষণে সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগপূর্ব্বক অনন্যভাবে সর্ব্বপুরুষার্থের সার ভগবচ্চর-ণারবিন্দে একান্তভাবে আত্মাকে সমাহিত করিলেন। তৎকালে সেই আসন্নমৃত্যু, উপশান্তরতি, প্রায়োপবিষ্ট রাজর্ষির নিকট ভুবনপাবন, মহাতপা, খ্যাতকীর্ত্তি মহর্ষি, ব্রহ্মর্ষি, দেবর্ষি--বেদ ব্যাস, নারদ, অত্রি, বশিষ্ঠ, চ্যবন, ভৃগু, অঙ্গিরা, পরাশর, বিশ্বা-মিত্র, ভরদ্বাজ, গৌতম, অগস্ত্য প্রভৃতি আগমন করিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক ধর্ম্মকথার প্রসঙ্গ করিলেন।

পরীক্ষিৎ তাঁহাদের নিকটে কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, আপনারা মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মতেজঃস্বরূপ, জ্ঞানামৃতের আধার। আমার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছে, আর কতিপয় দিবসমাত্র অবশিষ্ট। এ সময় এস্থানে এ মুমূর্ষুর পারত্রিক মঙ্গলের জন্য কি কার্য্য অবলম্বনীয়?

"নাসৌ মুনির্যস্য মতং ন ভিন্নম্"। রাজার এই কথা শুনিয়া, কেহ কহিলেন,—যাগযজ্ঞই এ সময় উত্তম কর্ম্ম। কেহ কহিলেন,—যোগ, কেহ তপস্যা, কেহ বা দানধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। তাঁহাদের মধ্যে এইরূপ বাদবিতণ্ডা হইতেছে, এমন সময়, সে প্রদেশে অকস্মাৎ একটী অপূর্ব্ব মূর্ত্তির আবির্ভাব হইল। তদীয় আবির্ভাবমাত্র সমস্তাৎ জল, স্থল, আকাশ এক অত্যাশ্চর্য্য, অনির্ব্বচনীয় রূপান্তর ধারণ করিল। মধুময়, বিরজস্ক সমীরণ বহিতে লাগিল। নদ-নদী-হ্রদ-তড়াগ, বনস্পতি, ভূধর, কন্দর, চরাচর সমস্ত পদার্থ—ক্ষিত্যপ্-তেজ-মরুদ্ব্যোম, সকলি মধুময় হইয়া গেল। তখন দিবা দ্বিপ্রহর। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড প্রখর করনিকরে চরাচর দগ্ধ করিতেছিলেন। তদীয় আবির্ভাবে সে মার্ত্তণ্ডদেবও শারদীয় রাকা-সুধাকরের মধুরিমা প্রকাশ করিলেন। সেই বালযোগীর বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষের অধিক নহে। কমনীয় বাল্য ও নবযৌবন, উভয়েই যেন সমপ্রাণ সখার ন্যায় মিলিত হইয়া, অতি মধুরভাবে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়াছে। মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য, সারল্য ও তেজঃপুঞ্জ, নির্ব্বিকারতা ও প্রেমার্দ্রতা, অমায়িকতা ও কারুণ্য, শান্তি ও সহানুভূতি, ইহারা প্রাণারাম, জীবপাবন সচ্চিদানন্দ-ভাবের সহিত মিলিত হইয়া যেন তাঁহার বাহ্য ও আভ্যন্তর সর্ব্বাঙ্গ ও সর্ব্বেন্দ্রিয়কে যুগপৎ গাঢ়ভাবে অধিকার করিয়াছে। তাঁহার আপাদমস্তক অলৌকিক মহা-পুরুষের যাবতীয় সুলক্ষণ-সৌভাগ্যে সমলঙ্কৃত। আনীল, কুটিল কেশকলাপ বিকীর্ণ হইয়া মুখমণ্ডলের অপূর্ব্ব মাধুরী বিস্তার করিয়াছে।

তিনি যখন গ্রাম্য পথ দিয়া আসিতেছিলেন, তখন পথপার্শ্বস্থ সরোবরে কতকগুলি কুলকামিনী স্নানে নামিয়াছিলেন। সে স্থান জনশূন্য বলিয়া, কুলাঙ্গনারা বিশ্রব্ধভাবে বসনোন্মোচন পূর্ব্বক গাত্রমার্জ্জনাদি করিতেছিলেন। অকস্মাৎ জলাশয়তটে সেই অপূর্ব্ব মূর্ত্তি উদিত দেখিয়া, কেহই অণুমাত্র সঙ্কোচ না করিয়া, একদৃষ্টিতে তাঁহাকে দেখিতে লাগিলেন। পরক্ষণে স্বয়ং শুকদেবপিতা মহর্ষি বেদব্যাস তথায় উপস্থিত। তাঁহার দেহ বল্কলাবৃত, হস্তে দণ্ড ও কমণ্ডলু, মস্তকে আপিঙ্গ-রুক্ষ জটাজূট বিকীর্ণ, বর্ণ গাঢ় কৃষ্ণ, বিশাল পিঙ্গল লোচনদ্বয়, অতি তুঙ্গ ও বিপুল দেহায়তন, বাহুদ্বয় আজানুলম্বিত। তাদৃশ মূর্ত্তিকে দর্শনমাত্র কুলাঙ্গনারা সসম্ভ্রমে বস্ত্র পরিধান ও অবগুণ্ঠন দ্বারা লজ্জা নিবারণ করিলেন। এই ব্যাপার দেখিয়া ব্যাসদেব বিস্মিত হইয়া স্নেহমধুর সম্ভাষণপূর্ব্বক নারীগণকে কহিলেন,—মা সকল! আমি জরাজীর্ণ আজন্মতপস্বী, বিষয়বাসনায় চিরপরাঙ্মুখ। নারীমাত্রকেই মাতৃভাবে দর্শন করিয়া থাকি। এই শুকদেব আমার পুত্র, দিব্যকান্তি, নবীন যুবক, বিশেষতঃ উলঙ্গদেহ (১)। আপনারা আমাকে দেখিয়া ব্যস্তভাবে লজ্জা নিবারণ করিলেন, কিন্তু কি আশ্চর্য্য! আমার পুত্র এই উলঙ্গ নবীন যুবককে দেখিয়া বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ প্রকাশ করিলেন না, ইহার কারণ কি?

(১) নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী শুকের দেহে কোনও আশ্রমের চিহ্ন ছিল না, তাঁহার কোনও নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান ছিল না। তিনি নিরপেক্ষভাবে কেবল লোককল্যাণার্থ যদৃচ্ছাক্রমে পৃথিবী পর্য্যটন করিতেন।

নারীগণ সেই মহাপ্রভাব মহর্ষির বাক্যে ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন,—ভগবন্! এ অবোধ অবলা-গণের অপরাধ ক্ষমা করুন। আপনাকে দেখিয়া, পিতৃতুল্য-গুরুজন-দর্শনে যুবতী কন্যার মনে যে ভাব হয়, সেইরূপ ভয়-ভক্তি-সম্ভ্রমের ভাব আমাদের মনে উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু আপনকার পুত্র এই নবীন যুবক ঠাকুরকে দেখিয়া আমাদেব মনে হইল, যেন এটী আমাদেরি গর্ভজাত, স্তন্যপায়ী শিশুসন্তান। এজন্য ইহাঁকে উলঙ্গ দেখিয়াও আমাদের কাহারও মনে লজ্জা বা সঙ্কোচ দূরে থাকুক, ইহাঁকে স্নেহনির্ভরে ক্রোড়ে লইতে ইচ্ছা হইতেছে, আমাদের স্তনদুগ্ধ ক্ষরিত হইতেছে।

হে মহর্ষিঠাকুর! আপনার মনে স্ত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞান রহিয়াছে। ব্রহ্মে ও ব্রহ্মাণ্ডে ভেদবুদ্ধি আপনার চিত্ত হইতে তিরোহিত হয় নাই। উচ্চ-নীচ-জাতি-বর্ণ-সম্প্রদায়ে ভেদজ্ঞান আপনি সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তাহার নিদর্শন,—আপনার দেহে জটা-বল্কল-দণ্ড-কমণ্ডলু-প্রভৃতি আশ্রম-বিশেষের প্রকট চিহ্নসকল জাজ্বল্যমান। আমরা তরুণী কুলললনা এবং আপনি মহর্ষি, এ ভেদাত্মিকা বুদ্ধিকে কি আপনি ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন? সর্ব্বত্যাগী, ব্রহ্মসমাহিতাত্মা, ব্রহ্মময় ব্রহ্মযোগীর আবার আশ্রম কি? লজ্জা ভয়-সঙ্কোচই বা কি? তাঁহার কাহাকে ভয়? কাহাকেই বা সঙ্কোচ? তাঁহার ত মণি-লোষ্টে, হার-সর্পে, শিশু-তরুণ-বৃদ্ধে, জীবন-মরণে, সর্ব্বত্রই সম্পূর্ণ সমজ্ঞান। অহো! আপনার এ পুত্রটী বালারুণকান্তি, নবযৌবনোদ্ভাসিত, প্রত্যক্ষ কন্দর্পরূপী হইলেও, ইহাঁর আপাদ

মস্তক সর্ব্বাঙ্গ হইতে কি এক অচিন্ত্য ও অনির্ব্বচনীয়, অকৈতব, সরল মধুর-কোমল মধুরিমা উচ্ছ্বসিত হইতেছে! অহহ! ইহাঁকে দর্শনমাত্র যেন মনের সমস্ত অন্ধকার, সমস্ত বিকার, সমস্ত বিরোধ, দূরে অপসরণ করিল। ইহাঁর প্রতি অপূর্ব্ব মাতৃভাবে আমরা সকলেই আত্মহারা হইয়াছি, মনে হইতেছে, যেন আমরা শত জন্মের হারানিধি, সর্ব্বশোকহারী, প্রাণারাম, ঈশ্বরপ্রসাদ— তনয়রত্ন লাভ করিলাম!

অহো! আত্মারাম, যোগিগণের কি অচিন্তনীয় প্রভাব! নির্ব্বিকার প্রেমমূর্ত্তির কি অদ্ভুত শক্তি! (১)

---

(১) তাদৃশ কমনীয়কান্তি, উলঙ্গ যুবাকে দেখিয়াও কুলাঙ্গনাগণের মনে অণুমাত্র লজ্জাসঙ্কোচের উদয় হইল না। ইহার গূঢ়তত্ত্ব এই যে,—শুকদেবের চিত্তে স্ত্রী-পুরুষ ভেদজ্ঞান আদৌ ছিল না। ব্রহ্মযোগীরা ব্রহ্মসমাধিতে তন্ময় হইয়া গেলে চরাচর, উচ্চ-নীচ, সম-বিষম, জাতি-লিঙ্গ প্রভৃতি ভেদজ্ঞান বিলীন হয়। তাঁহারা তখন জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তির অতীত হন। তাঁহারা তখন অন্তর্ব্রহ্মে সচেতন, অথচ বহির্জগতে সম্পূর্ণরূপে অচেতন বা মৃত। মনুষ্য হউক, বা সর্প-ব্যাঘ্রাদি হউক, জীবমাত্রেরি স্বভাব এই যে, পরস্পরের মধ্যে কোনও একটা সাধর্ম্ম্য বা সাধারণ ভাব না থাকিলে, বৈরভাবেই হউক বা মৈত্রভাবেই হউক, পরস্পর আকৃষ্ট হয় না, সম্পূর্ণ উদাসীনই থাকে। তোমাতে যদি হিংসার অণীয়ান্ অংশও না থাকে, তবে কোনও হিংস্রই তোমাকে আক্রমণ করিবে না। কাষ্ঠ-লোষ্ট্র-পাষাণাদিকে কোন্ হিংস্র আক্রমণ বা দংশন করে? কেন করে না? যেহেতু কাষ্ঠ-লোষ্ট্রাদিতে সে হিংস্রের সাজাত্য ধর্ম্ম নাই। কথিত আছে, বুদ্ধদেব, তুলসীদাস, চৈতন্যদেবপ্রমুখ মহাত্মারা সর্প-ব্যাঘ্রাদির সম্মুখে পড়িয়াও, নির্ভয় ও নির্ব্বিঘ্ন ছিলেন।

বনপথ ও গ্রাম্যপথ অতিক্রম করিয়া ক্রমে সে দিব্যমূর্ত্তি জনসম্বাধপূর্ণ রাজমার্গে আবির্ভূত হইলেন। এক স্থানে বালকের দল ধূলাখেলা করিতেছিল, তাহাদের মধ্যে কতকগুলি বালক, বোধ হয়, তাঁহাকে সজাতীয় ও সমবয়স্ক বালক ভাবিয়া, আমোদ করত তদীয় গাত্রে ধূলি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তাঁহাকে পাগল ভাবিয়া, কতকগুলি বালক চারিদিকে ঘেরিয়া নানা কৌতুক করিতে লাগিল। কেহ বা দৌড়িয়া গিয়া লম্ফ দিয়া তাঁহার কণ্ঠালিঙ্গন করিল। কুলকামিনীগণ, কেহ গবাক্ষ-মার্গে, কেহ হর্ম্ম্যশিখরে, কেহ বহির্দ্বারে আসিয়া অবাক্ ও নিস্পন্দভাবে সেই পবিত্র রূপমাধুরী দর্শন কবিতে লাগিলেন। যুগপৎ প্রেম-ভক্তি-করুণায় ও বিস্ময়ে সকলেরি হৃদয় উদ্বেলিত হইল। সকলেব আত্মায অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-শান্তিব ধারা

হিংস্রেরা তাঁহাদিগকে বারংবার দেখিয়াও তাঁহাদের ছায়াও স্পর্শ করে নাই। নির্ব্বিকার বিশ্বপ্রেমের অচিন্ত্য মহিমা! স্বর্গীয় মনীষিবর ভূদেব মুখোপাধ্যায় বলিয়াছেন,—একদা তাহাব পিতৃদেব দালানে বসিয়া আছেন, এমন সময় এক ভীষণ কৃষ্ণসর্প শনৈঃ শনৈঃ সেই দিকে আসিতে লাগিল তিনি তাহা দেখিয়াও অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া, তৎক্ষণাৎ কুম্ভক দ্বারা প্রাণবায়ু নিরোধপূর্ব্বক নিস্পন্দ হইয়া রহিলেন। তখন কাষ্ঠ-লোষ্টে ও তাঁহাতে প্রভেদ রহিল না। সর্প তাঁহার সম্মুখে আসিয়া ক্ষণমাত্র থামিয়া ফণা তুলিয়া তাহাকে দেখিল। অনন্তর আস্তে আস্তে তাঁহার এক হস্ত দূর দিয়া অপসরণ করিল। তিনি বলিয়াছিলেন, সে সময় বিন্দুমাত্র অঙ্গচালনা বা পলায়নচেষ্টা করিলেই সর্প তাঁহাকে দংশন করিয়া যাইত।

প্রবাহিত হইল। অপূর্ব্ব-ভাবাবেশ-বিমুগ্ধ অসংখ্য জনতার মধ্য দিয়া তিনি মন্দ মন্দ গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার কোনও দিকে লক্ষ্য নাই। অধরে স্মিতসুধামাধুরী বিকাস করত তিনি যে দিকে দৃষ্টিপাত করেন, সে দিক্ যেন ধৃতপাপ হইয়া এক অভিনব দৃশ্য ধারণ করে। "মধুরৈরবশানি লম্ভয়ন্নপি তির্য্যঞ্চি শমং নিরীক্ষিতৈঃ"—শ্বাপদ-সর্পাদি হিংস্র জন্তুরা তাঁহাকে দেখিয়া, স্তম্ভিত ও ব্যায়তাস্য হইয়া, চিত্রার্পিতের ন্যায় সেইদিকে চাহিয়া রহিল। তাহাদের আজন্মসিদ্ধ, জাতিসুলভ হিংস্রভাব এককালে তিরোহিত ও অপূর্ব্ব শান্তিভাব আবির্ভূত হইল।

সে আত্মারাম, আত্মানন্দে বিভোর যুক্তযোগী আসন্নমৃত্যু মহারাজ পরীক্ষিতের দহ্যমান প্রাণে অশোক-অভয় ভূমামৃত সেচন করিতে চলিয়াছেন। আধি-ব্যাধি-জরা-মরণ-জর্জ্জরিত, তাপদগ্ধ জীবলোকে আনন্দশান্তিময়, অনপায়ী নবজীবন দান করাই, তাদৃশ সর্ব্বত্যাগী, নির্দ্বন্দ্ব মহাপুরুষগণের অদ্বৈত ব্রত। তিনি সঙ্কল্প করিয়াছেন, পুণ্যশ্লোক মহারাজ পরীক্ষিতের ভৌতিক দেহপিণ্ডমাত্র তক্ষক-কবলে অর্পণ করিয়া, তাঁহার অভৌতিক, অক্ষয় আত্মাকে মহানির্ব্বাণ দান করিবেন। অহো! কি মহান আত্মা! কি মহীয়সী সাধনা! কি মহোচ্চ আদর্শ! কি বিশ্বজনীন হৃদয়! কি লোকপাবন চরিত্র!! পুরাণাদি শাস্ত্রে দেব, দানব, মানব, যক্ষ, রক্ষ, পিশাচ প্রভৃতির জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। কিন্তু মনে হয়, স্বর্গ, মর্ত্ত্য, নরকাদি সকল লোক এই ভূলোকমধ্যেই। যাঁহারা নররূপিণী দেবতা, তাঁহারা যে স্থানেই অধিষ্ঠান করেন, তাহাই স্বর্গ, তাঁহাদের জ্যোতির্ম্ময়

চরিত্ররূপী পুষ্পকরথ পৃথিবীমধ্যে থাকিয়াও, পার্থিব মালিন্য স্পর্শ করে না। তাহা অগ্নিশিখার ন্যায় সদাই ঊর্দ্ধমুখ।

ক্রমে তিনি জাহ্নবীতটে মহারাজ পরীক্ষিতের সেই সুরক্ষিত ভবনের বহির্দ্বারে উপস্থিত হইলেন। তদীয় আগমনমাত্র রক্ষী পুরুষেরা শশব্যস্তে গিয়া মহারাজকে সংবাদ দিল। অনন্তর রাজাজ্ঞায় তাঁহাকে পরমাদরে রাজসন্নিধানে লইয়া গেল। রাজেন্দ্র অতুল ভক্তিযোগে স্বহস্তে তাঁহাকে পাদ্য-অর্ঘ্য-আসন-বন্দনাদি দ্বারা পূজা করিলেন, এবং ভূবিলুণ্ঠিত শীর্ষে তাঁহাকে বারংবার সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিলেন।

তদীয় আবির্ভাবে তথায় এক আশ্চর্য্য বিপ্লব উপস্থিত হইল। মহারাজ সেই দুর্ঘটনার পর হইতে জীবদ্দেহে অনুতাপের চিতানলে দগ্ধ হইতেছিলেন। তাঁহার চক্ষে সে ঐশ্বর্য্যোদ্ভাসিতা রাজপুরী ও রাজসম্পদ্, সে প্রাণাধিক পুত্রকলত্রাদি স্বজনবর্গ, সকলি অন্ধকারময় জ্ঞান হইতেছিল। অকস্মাৎ সেই গভীর শোকান্ধকার ভেদ করিয়া এক দিব্য জ্যোতিঃ প্রকাশিত হইল। সে হাহাকার ও শোকোচ্ছ্বাস দূর করিয়া, অপূর্ব্ব শান্তিধারা প্রবাহিত হইল। পরিবারবর্গের সহিত মহারাজ যেন এ জ্বালাময় সংসার পার হইয়া, কল্পনাতীত, অনির্ব্বচনীয় প্রেমরাজ্যে উপনীত হইলেন। সে ভীষণ ব্রহ্মশাপ ঈশ্বরকৃপায় পরিণত হইল। এইজন্য শাস্ত্রকারেরা বলেন,—

"সাধূনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হি সাধবঃ।
কালে ফলন্তি তীর্থানি সদ্যঃ সাধুসমাগমঃ॥"

—সাধুর দর্শনমাত্র পুণ্য লাভ হয়,
তীর্থের অধিক সাধু জানিবে নিশ্চয়;

বিলম্বে সফল হয় তীর্থাদি-সেবন,
সদ্যই সফল হয় সাধু-দরশন।

ভগবান শুকদেব তত্রত্য ব্রহ্মর্ষি-দেবর্ষি-রাজর্ষিবৃন্দে পরিবৃত হইয়া, নক্ষত্র-পরিবৃত, শারদ শশধরের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবদ্ভক্ত মহারাজ সেই সুখাসীন যোগিবরের নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—হে ব্রহ্মন্! আমি ক্ষত্রিয়াধম, মহাপাপী। আপনি কৃপা করিয়া দর্শন দান করায়, আমি পবিত্র হইলাম। আপনাদের স্মরণমাত্র লোকে পবিত্র হয়, দর্শন ও পাদস্পর্শনাদির প্রভাব কি বলিব? হে যোগীশ্বর! অরুণোদয়ে তামসরাশির ন্যায় ভবদীয় আবির্ভাবে লোকের অশেষ কলুষরাশি বিলীন হয়। হে দয়ানিধে! হে ভগবন্! আপনি যোগিকুলের গুরু; কৃপা করিয়া বলুন, মানবের বিশেষতঃ মুমূর্ষু মানবের কর্ত্তব্য কি?

মহারাজ পরীক্ষিৎ এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, শুকদেব তাঁহার নিকট সর্ব্বশোকহারিণী মহতী ভাগবতকথা সবিস্তারে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। কথিত আছে, মহারাজ সে ভাগবতসুধা পান করিয়া, বিশোক ও ভবসাগর-নিস্তীর্ণ হইয়া, অভয়-সচ্চিদানন্দধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন।

ক্রমে ছয় দিন অতীত হইলে, যখন সপ্তম দিন উপস্থিত হইল, কশ্যপনন্দন, ভগবান দেবভিষক ধন্বন্তরি সর্পদষ্ট পরীক্ষিৎকে নিজ বিদ্যাপ্রভাবে পুনর্জীবিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। কেননা, এ কার্য্য করিলে, তাঁহার প্রভূত ধনলাভ ও অতুল যশোলাভ হইবে। তিনি দেবলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়া পরীক্ষিতের নিকট গমন করিতে লাগিলেন। এদিকে, অমোঘ ব্রহ্মশাপে

আকৃষ্ট হইয়া তক্ষকও রাজাকে দংশন করিতে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ-রূপে চলিলেন। দৈবযোগে পথিমধ্যে উভয়ের সাক্ষাৎকার হইল। তক্ষক ধন্বন্তরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কি অভিপ্রায়ে কোথা এরূপ দ্রুতবেগে চলিয়াছেন? ধন্বন্তরি বলিলেন, আজি পন্নগরাজ তক্ষক কুরুবংশধর মহারাজ পরীক্ষিৎকে নিজ বিষানলে দগ্ধ করিবে। আমি তাঁহাকে সে বিষতেজ হইতে নির্ম্মুক্ত করিয়া পুনর্জীবিত করিব। এইজন্য এরূপ ব্যস্ত হইয়া তথায় চলিয়াছি। তক্ষক বলিলেন,—আমিই সেই তক্ষক, তাঁহাকে সংহার করিতে যাইতেছি। আপনি প্রতিনিবৃত্ত হউন, কি সাধ্য আপনার, যে আপনি, আমি দংশন করিলে, তাহাকে রক্ষা করিতে পারেন? ধন্বন্তরি কহিলেন,—তুমি দংশন করিলেও, আমি মহারাজকে বাঁচাইব, আমার এরূপ বিদ্যাবল আছে।

তখন তক্ষক বলিলেন,—হে কাশ্যপ! যদি আপনি আমা-কর্তৃক দষ্ট ব্যক্তিকে জীবনদান করিতে সমর্থ হন, তবে আপনার মন্ত্রশক্তি আমি এই স্থানেই প্রত্যক্ষ করিতে চাই। আমি এই ন্যগ্রোধবৃক্ষকে দংশন করিতেছি, আপনি ইহাকে পুনর্জীবিত করুন দেখি? ধন্বন্তরি বলিলেন,—নাগেন্দ্র! তুমি বৃক্ষকে দংশন কর, আমি বাঁচাইব। সর্পরাজও সেই বৃক্ষকে দংশন করিলেন। অহো! সে বিষাগ্নির কি প্রভাব! দংশনমাত্র সেই তরুবর, মূল হইতে অগ্রভাগ পর্য্যন্ত, আপাদমস্তক ধূধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল, এবং ক্ষণমধ্যেই ভস্মাবশেষ হইল। ধন্বন্তরি তখন যত্নপূর্ব্বক সেই দগ্ধ তরুর ভস্ম সংগ্রহ করিয়া তক্ষককে বলিলেন,—দেখ! সর্পরাজ! আমার বিদ্যাপ্রভাব

দেখ! বলিয়াই মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন। মণি-মন্ত্র-মহৌষধের অচিন্ত্য প্রভাব! তৎক্ষণাৎ সে ভস্ম হইতে একটী ক্ষুদ্রতম অঙ্কুর উদ্গত হইল। ক্রমশঃ তাহা বর্দ্ধিত ও শাখা-প্রশাখাদি-সমন্বিত হইয়া অবিকল সেই প্রকাণ্ড বৃক্ষে পরিণত হইল।

তখন তক্ষক বিস্মিত হইয়া কহিলেন,—আপনার শক্তি অদ্ভুত! জানিলাম, আপনি মদীয় বিষাগ্নি হইতে লোককে রক্ষা করিতে সমর্থ। কিন্তু এস্থলে আপনি এ কার্য্য করিবেন না। ব্রহ্মশাপকে ব্যর্থ করিলে, লোকপূজিত ব্রহ্মর্ষির অবমাননা করা হইবে। এ কার্য্য করিয়া আপনার কি লাভ? ধন্বন্তরি কহিলেন,—যশোলাভ ও বিপুল ধনলাভ। তক্ষক কহিলেন,—আপনি যত ধন চান, দিতেছি, গ্রহণ করুন। আর, এ ক্ষেত্রে আপনার যশোলাভ অসম্ভব; কারণ, বিপ্রশাপাভিভূত এ রাজার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছে। মর্ত্ত্যের কালপাশ দুরতিক্রম। বিধাতৃবিহিত নিয়মমার্গকে কেহই লঙ্ঘন করিতে পারে না। আপনি ইহাতে অকৃতকার্য্য হইলে, আপনার ত্রিভুবনব্যাপ্ত প্রদীপ্ত যশোরাশি অস্তগামী ভাস্করের ন্যায় অদৃশ্য হইবে।

তখন ধন্বন্তরি বলিলেন,—নাগেন্দ্র! আমি ধনলোভে এ কার্য্যে প্রবৃত্ত। আপনি আমাকে প্রচুর ধন দান করুন, আমি নিবৃত্ত হইতেছি। ইহা বলিয়া তিনি ধ্যানাবলম্বন করিলেন, এবং যোগবলে জানিলেন,—সত্যই রাজার আয়ুষ্কাল পূর্ণ। তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। তখন ব্যাপার অসাধ্য বুঝিয়া, ধনলাভ পূর্ব্বক ধন্বন্তরি প্রস্থান করিলেন।

ধন্বন্তরি প্রস্থান করিলে, তক্ষক বিদ্যুদ্বেগে পরীক্ষিতের সেই

সুরক্ষিত ভবনে যাত্রা করিলেন। তিনি পথে যাইতেই শুনিলেন, মহারাজ গঙ্গাতটে সুরক্ষিত ভবনে সাবধানে বাস করিতেছেন। সে ভবন সর্ব্বপ্রকার বিষহর মহৌষধে ও মণিমন্ত্রাদি দিব্য উপায়ে সমন্তাৎ পরিরক্ষিত। আশীর্ব্বাদক ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহারও তথায় প্রবেশাধিকার নাই। তখন নাগরাজ তক্ষক ভাবিলেন, মায়াবলে সকলকে ব্যামোহিত করিয়া তথায় প্রবেশ করিতে হইবে। তিনি গোপনে নিজ বিশ্বস্ত সহচর, কতিপয় ভুজঙ্গমকে আহ্বান করিয়া বলিলেন,—তোমরা সকলে তাপসরূপ ধারণ করিয়া, ফল-মূল-পুষ্প-কুশ-জল প্রভৃতি আশীর্ব্বাদী উপহার নানা পাত্রে গ্রহণ পূর্ব্বক রাজসন্নিধানে গমন কর। ভুজঙ্গমেরা তদীয় আদেশে তাপস-বেশে সেই সকল উপহার লইয়া রাজসকাশে গমন করিল, এবং ভূপালকে যথাবিধি আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক কহিল, মহারাজ! এই সকল উপাদেয় প্রসাদ ভোজন করুন। রাজা সাদরে সে সকল দ্রব্য গ্রহণ পূর্ব্বক, সচিবগণকে ভক্ষণ করিতে দিলেন, এবং একটীমাত্র ফল স্বয়ং ভক্ষণার্থ লইলেন। তিনি যে ফলটী নিজে লইলেন, মায়াবী কালফণী তক্ষক একটা অণুপরিমাণ, সূক্ষ্মতম, অদৃশ্য কীটরূপে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তিনি সেই ফল ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে, তাহা হইতে একটী ক্ষুদ্রতম কীট বহির্গত হইল। সেই কীট তাম্রবর্ণ ও কৃষ্ণনেত্র। রাজা সেই কীটকে হস্তে লইয়া জগদীশ্বরকে সম্বোধন করিয়া, ভক্তিগদ্গদবাক্যে করুণস্বরে কহিলেন,—"দয়াময় জগদীশ! আমি যদি লোকপূজিত চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি, যদি বিশুদ্ধভাবে কুলোচিত সদাচারপরম্পরা পালন

করিয়া থাকি, যদি অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাপালন করিয়া থাকি, যদি শ্রদ্ধাপূত হৃদয়ে তোমার আরাধনা করিয়া থাকি, যদি আমি একান্তভাবে বেদ-ব্রহ্মের ও গুরুজনের সেবা করিয়া থাকি, যদি আমার হৃদয়ে যথার্থই সুতীব্র অনুশয়-হুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া থাকে, হে করুণাসিন্ধো! পতিতপাবন! জগদীশ! হে সত্যের ও ধর্ম্মের মর্য্যাদারক্ষক! হে দীনদয়াময়! তবে এই ক্ষুদ্র কীটই কালফণী তক্ষক হইয়া আমার প্রাণসংহার করুক। ব্রাহ্মণবাক্য সফল হউক। আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হউক।

মন্ত্রিগণ সে রাজবাক্যের অনুমোদন না করিলেও, রাজা সেই কীটকে যত্নপূর্ব্বক নিজকণ্ঠে স্থাপন করিলেন। দেখিতে দেখিতে তাহা প্রকাণ্ড ও ঘোরদর্শন বিষধরের আকার ধারণ করিল, এবং এরূপ ভয়ঙ্কর গর্জ্জন করিতে লাগিল, যে, তত্রত্য মন্ত্রিগণ ও পরিচারকগণ আতঙ্কে থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে দ্রুতবেগে পলায়ন করিলেন। সকলে দেখিলেন, সেই কালসর্প রাজাকে দংশন করিয়া বিদ্যুদ্‌বেগে আকাশমার্গে চলিয়াছে। তাম্রবর্ণ তদীয় ভোগমণ্ডল গগন-ভালে সিন্দূরমণ্ডিত সীমন্তের ন্যায় দীপ্যমান। তক্ষকের বিষানল রাজাকে দগ্ধ করিয়া সমস্ত গৃহে ব্যাপ্ত হইল। রাজভবন ধূধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে সকলি নিঃশেষ।

শুকমুখ-বিনিঃসৃতা সে ভাগবতী সুধা পরম ভক্তিযোগে পান করিয়া, মহারাজ পরীক্ষিৎ সে করাল কালফণীকে পুষ্পমালার ন্যায় কণ্ঠে ধারণ করিয়াছিলেন, ভৌতিক দেহপিণ্ডমাত্র কৃতান্তহস্তে অর্পণপূর্ব্বক সচ্চিদানন্দধামে প্রস্থান করিয়াছিলেন। (১)

(১) পরীক্ষিতের কথা মহাভারতে ও ভাগবতে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ-কথার পরিশিষ্ট

প্রথমেই কথিত হইয়াছে, পরীক্ষিতের প্রতি ব্রহ্মশাপ জগতে একটী অলৌকিক পুণ্যযুগের অবতরণিকা। কেন না, এই ঘটনা হইতেই মহাভারত ও ভাগবত পুরাণের উদয়। তাদৃশ শোচনীয় পিতৃনিধন, পিতৃভক্ত সন্তান জনমেজয়ের প্রাণে শেলসম বিদ্ধ হইয়াছিল। সর্পদংশনে ঐ দুর্ঘটনা ঘটায়, সমগ্র বিষধরজাতির উপর তাঁহার প্রচণ্ড রোষানল সন্ধুক্ষিত হইল। তিনি মর্ম্মপীড়ায় ও প্রতিহিংসায় অধীর হইয়া সমস্ত দ্বিজিহ্বজাতির উচ্ছেদসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সঙ্কল্পসিদ্ধির জন্য মহাপ্রভাব ঋষিগণের সাহায্যে সর্পযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিলেন। পশ্চাৎ পরিণামদর্শী মহর্ষিগণের পরামর্শে তাহা হইতে নিরস্ত হন। সে যজ্ঞে জাগ্রত মন্ত্রশক্তির প্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া অগণিত বিষধর প্রদীপ্ত হোমানলে ভস্মীভূত হয় (১)।

উক্ত উভয় গ্রন্থ হইতে সারোদ্ধার করিয়া যথাস্থানে যথাযোগ্য উপকরণ সন্নিবেশপূর্ব্বক ইহা লিখিত হইল। এ ভাগবতামৃত আব্রহ্ম-চণ্ডাল কাহারও সেবন করিতে নিষেধ নাই।

(১) শৈশবে যখন পিতৃদেবের মুখে এই সর্পযজ্ঞ ও সর্পধ্বংসের কথা শ্রবণ করি, তখন মনে এই ক্ষোভ হইয়াছিল, যে, কেউটিয়া ও গোখুরা এই দুই জাতীয় সর্প যদি সেই উদ্যমে নিঃশেষ হইত, তবে লোকের কি মহোপকার হইত।

বিখ্যাত হইয়াছিলেন (১)। যাঁহার জীবনে কখনও কোনও পাপ ঘটে নাই, তাঁহা অপেক্ষা যিনি পড়িয়া (পাপ করিয়া) উঠিয়াছেন, তাঁহার বীরত্ব ও মহিমা অধিক। অনুতাপ ও সহানুভূতি হইতে এ জগতে অদ্ভুত অদ্ভুত কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিষাদ-বিদ্ধ-বিহঙ্গ-দর্শন-সমুত্থিত শোকোচ্ছ্বাস হইতেই অপূর্ব্ব শ্লোকগাথা উত্থিত হইয়া, সর্ব্বপ্রথম, অলৌকিকী, অভিনবা, কাব্যময়ী সৃষ্টির মূলভিত্তি স্থাপন করিয়াছে। বাল্মীকি-রামায়ণ তাহার সাক্ষী। অনুতাপ ধর্ম্মজগতের শিক্ষক ও সহায়। যিনি পাপ করিয়া কঠোর অনুতাপ করেন, এবং সেই অনুতাপের ফলে সমস্ত জীবন প্রভূত ভূতকল্যাণব্রতে উৎসর্গ করেন, তিনি সকলের নমস্য।

সুতীক্ষ্ণ গরল, যার স্পর্শে প্রাণ যায়,
তাহা পিয়া বাঁচে লোক ঈশ্বরকৃপায় ;
বিষও অমৃত হয় ঈশ্বর-কৃপায়,
অমৃতও বিষ হয় তাঁহারি ইচ্ছায় ;
বিশ্বপতি বিশ্বগতি কল্যাণনিধান,
যা করেন তিনি, তাই জীবের কল্যাণ।

"বিষমপ্যমৃতং ক্বচিদ্ভবেদমৃতং বা বিষমীশ্বরেচ্ছয়া।"

(কালিদাস।)

---

(১) সেণ্ট পল (St. Paul), সেণ্ট অগস্টিন্ (St. Augustine) লয়লা (Ignatius Loyala) প্রভৃতি মহাত্মারা সকলেই প্রথম বয়সে নিরতিশয় দুরন্ত উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি ছিলেন ; কিন্তু আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন! অবশেষে তাঁহারা নিজ নিজ পুণ্যচরিত্রমহিমায় বিশ্বপূজিত ধর্ম্মগুরুর আসন অধিকার করেন।

উপাদান নহেন। যিনি পাপ করিয়া অনুতাপানলে দহ্যমান হইয়া (পোড় খাইয়া) বিশুদ্ধীকৃত, তিনিই লোকশিক্ষোপযোগী উপাদান। অগ্নিতাপে বিমলীকৃত কাঞ্চনের ন্যায় তদীয় চরিত্রের বিশুদ্ধতা, উজ্জ্বলতা, দৃঢ়তা, স্থায়িতা ও আকর্ষণ অধিক। এইজন্যই দস্যু রত্নাকার (১), দুরন্ত শিশু নিমাই (গৌরাঙ্গদেব), সুরাপায়ী জগাই-মাধাই,নব্যন্যায়কর্ত্তা জগদীশ তর্কালঙ্কার, অদ্বিতীয় শ্রুতিধর পণ্ডিত-রাজ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রমুখ নরদেবতারা প্রথম বয়সে উচ্ছৃঙ্খল ও ভীষণপ্রকৃতি হইয়াও, শেষে জ্ঞানে, ধর্ম্মে ও লোকহিতে ভুবন-

(১) 'দস্যু রত্নাকর'—বনবাসকালে একদা রামচন্দ্র, সীতা ও লক্ষ্মণের সহিত ভগবান্ বাল্মীকির তপোবনে গমন করেন। মহর্ষি তাঁহাদের যথাবিধি আতিথ্য করিয়া, প্রসঙ্গক্রমে নিজ পূর্ব্ববৃত্তান্ত তাঁহাদিগকে এইরূপ বলিয়াছিলেন,—হে রাম! সাধুসঙ্গ-মহিমা কে বর্ণিতে পারে? যাহার প্রভাবে আমি এ ব্রহ্মর্ষিপদ লাভ করিয়াছি। আমি ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াও, সঙ্গদোষে ঘোর স্বেচ্ছাচারী ছিলাম। শূদ্রা-গর্ভে আমার বহুপুত্র উৎপন্ন হয়। সর্ব্বদা দস্যুগণের সঙ্গে মিশিয়া আমি নরহত্যায় ও দস্যুতায় পরিপক্ব হইয়াছিলাম। দিবারাত্রি ধনুর্বাণাদি ধারণপূর্ব্বক জীবগণের সাক্ষাৎ কৃতান্তরূপে ভ্রমণ করিতাম। একদা মহাবনে সপ্ত মহর্ষিকে দর্শন করিয়া, তাঁহাদের প্রাণসংহার পূর্ব্বক পরি-ধেয়াদিহরণার্থে তাঁহাদের সম্মুখীন হইলাম। অনন্তর তাঁহাদের অলৌকিক ব্রহ্মতেজে ও অমোঘ উপদেশে আমার মতিগতি ফিরিল। তদবধি কঠোর অনুতাপে দহ্যমান হইয়া সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিরত হইলাম। অনন্তর সুদীর্ঘকালব্যাপী দুষ্কর তপঃপ্রভাবে এই ত্রিলোকীপূজিত,সুদুর্লভ ব্রহ্মর্ষিপদ লাভ করিয়াছি। অতএব অনুতাপ ও সাধুসঙ্গই আমার এ মহোন্নতির নিদান। (অধ্যাত্মরামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ৬ষ্ঠ সর্গ।)

পাণ্ডবগণের মহাপ্রস্থান।

পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির হস্তিনার রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া সাক্ষাৎ ধর্ম্মের ন্যায় প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। তাঁহার রাজ্যে বাস করিয়া কেহ স্বর্গরাজ্যও কামনা করিত না। পঞ্চ পাণ্ডব প্রজাগণের যেন পঞ্চ প্রাণবায়ু ছিলেন। অসংখ্য প্রজাপুঞ্জের প্রতিহৃদয়েই সদ্ভাব এবং সেই বিশাল সাম্রাজ্যের প্রতিগৃহেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্ম্মপ্রাণ পাণ্ডবগণের পরম বন্ধু ও অনুপম সহায় ছিলেন। পাণ্ডবেরা ক্ষণকালও তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতেন না। কালক্রমে যখন সর্ব্বনাশকর সুরাপানে বিশাল যদুবংশ বিনষ্ট হইল, তখন শ্রীকৃষ্ণ মর্ত্ত্যলীলা সংবরণ করিলেন। এদিকে, কৃষ্ণবিরহে কৃষ্ণগতপ্রাণ পাণ্ডবগণের হৃদয়ে নির্ব্বেদ জন্মিল। যুধিষ্ঠির সংসার অসার ভাবিয়া অচিরেই তৎকালোচিত নিজ পার্থিব কর্ত্তব্যসকল সমাপন করিলেন। অনন্তর তাঁহারা পঞ্চ ভ্রাতা সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রৌপদীর সহিত রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। একটী কুক্কুর তাঁহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

প্রজাবৎসল যুধিষ্ঠির সংসারত্যাগী হইয়া চলিলেন, আর ফিরিবেন না, এই বার্ত্তা মুহূর্ত্তমধ্যে সর্ব্বত্র রটিত হইলে, পৌর ও জানপদবর্গে তুমুল আর্ত্তনাদ উঠিল। প্রজাপুঞ্জের অবিরল

অশ্রুধারায় ধরণী অভিষিক্ত ও হাহাকারে দশ দিক্ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। গৃহধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া সকলেই সেই সর্ব্বলোক-বল্লভ, বিশ্বপ্রেমিক ধর্ম্মরাজের অনুগমন করিতে লাগিল।

যে ভাগ্যবান্ বিশ্বপ্রেমে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তিনি প্রেমময় ঈশ্বরে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া কৃতার্থ হন। ঈশ্বরেই বিশ্বপ্রেমের পূর্ণতা। পুণ্যশ্লোক যুধিষ্ঠির অনন্ত প্রজাপুঞ্জের হৃদয়-সিংহাসনে রাজত্ব করিয়াছেন। তাই তিনি ঈশ্বরে প্রতিষ্ঠিত, অশোক, অভয়। যুগপৎ তদীয় হৃদয়ে ও বদনে আজি দিব্য জ্যোতিঃ প্রভাসিত। তিনি অমৃতায়মান সম্ভাষণে ও নানাউপদেশ-বচনে লোকমণ্ডলীকে অভয় ও সান্ত্বনা দিয়া এবং সাশ্রুলোচনে সকলের নিকট বিদায় লইয়া সকলকে নিবর্ত্তিত করিলেন।

এক মহাসূর্য্য যেমন স্বকীয় রশ্মিজালকে অনন্ত পদার্থে সংক্রমিত করিয়া, সমস্ত পদার্থকেই আলোকিত করে, তেমনি ধর্ম্মরাজের হৃদয়নিষ্ঠ্যূত, ধর্ম্মপ্রসূত শান্তিধারা সমস্ত প্রজামধ্যে সংক্রান্ত হইয়া, সে বিশাল সাম্রাজ্যকে শান্তিময় করিয়াছিল। আজি সে প্রেমগুরু, ধর্ম্মকল্পতরু যুধিষ্ঠির এ অনিত্য সংসার পরিহার করিয়া, লোকমণ্ডলীকে অনাথ করিয়া, মহাপ্রস্থান করিলেন। তাই আজি গৃহে গৃহে ক্রন্দনে রোল! ভক্তের এ কৃতজ্ঞতার অশ্রুধারা, সে ভক্তিভাজনের পক্ষে অপার্থিব ঐশ্বর্য্য--অক্ষয় স্বর্গের সোপানপরম্পরা। শিশু মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়াই কাঁদে, আর তাহার আত্মীয়েরা হর্ষধ্বনি করে। পশ্চাৎ সেই শিশু বর্দ্ধিত হইয়া যদি এমন কার্য্য করে, যে এ জীবলোক হইতে বিদায়কালে তাহার জন্য জগতের সকলেই

কাঁদে, কিন্তু সে নিজে আনন্দে হাস্য করে, তবেই জানিবে, সার্থক তাঁহার জন্ম ও ধন্য তাঁহার মাতৃগর্ভ !

অনন্তর, তিনি চারি ভ্রাতা ও পত্নীর সহিত গমন করিতে লাগিলেন। সেই কুক্কুরও ছায়ার ন্যায় তাঁহাদের অনুগামী হইল। ক্রমে তাঁহারা পৃথিবীর নানা পুণ্যতীর্থ দর্শন করিয়া অবশেষে সুমেরু পর্ব্বতে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা সেই গিরিবরে আরোহণ করিতে করিতে, তাঁহাদের প্রিয়তমা পত্নী দ্রৌপদী অকস্মাৎ গতাসু হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তাঁহাকে পতিত দেখিয়া ভীম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসিলেন,—আর্য্য ! রাজকুমারী দ্রৌপদী ত কখনও কোনও অধর্ম্ম করেন নাই, তবে কি কারণে ইহাঁর পতন হইল ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—"হে পুরুষপুঙ্গব! রাজনন্দিনী কৃষ্ণা মনে মনে অর্জ্জুনের প্রতি অধিক অনুরাগিণী ছিলেন, সেই পক্ষপাতদোষেই শেষে ইহাঁর পতন হইল। যে স্থলে সকলের প্রতি সমান অনুরাগ স্থাপন করিতে হইবে, সে স্থলে পক্ষপাত একটা মহাপাপ।" তিনি এই কথা বলিয়া পরমাত্মায় চিত্ত সমাহিত করিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। অনন্তর তাঁহারা কিয়দ্দূর আরোহণ করিতে করিতে, সহদেব অকস্মাৎ প্রাণশূন্য হইয়া পতিত হইলেন। তাঁহাকে পতিত দেখিয়া ভীম যুধিষ্ঠিরকে কহিলেন,—আর্য্য ! যিনি বিনীত, শান্ত ও সমভাবে সকলের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, সেই অপাপ সহদেব আজি কি পাপে পতিত হইলেন ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—"ইনি কাহাকেও আপনার সমান বিজ্ঞ

বলিয়া জ্ঞান করিতেন না, এই আত্মাভিমানেই রাজকুমার সহদেবের পতন হইল। সকলের অপেক্ষা আপনাকে অধিক বিজ্ঞ মনে করা একটা মহাপাপ।" এই বলিয়া তিনি গমন করিতে লাগিলেন, অবশিষ্ট তিন ভ্রাতা ও সেই সারমেয় নিঃশব্দে তাঁহার অনুগমন করিল। কিয়দ্দূর আরোহণ করিতে করিতে, নকুল গতাসু হইয়া পতিত হইলেন। ভীম পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসিলেন,—আর্য্য! ধর্ম্মে যাঁহার অচলা ভক্তি ছিল, যিনি গুরুজনের আজ্ঞাবহ এবং রূপে ও শীলে অনুপম ছিলেন, আজি কি পাপে সেই নকুলের পতন হইল?

যুধিষ্ঠির কহিলেন, "ইনি মনে করিতেন, যে, আমার তুল্য রূপবান ও গুণবান আর কেহই নাই। নকুল এই পাপেই পতিত হইলেন। আপনার রূপ-গুণের অভিমান একটা মহাপাপ। বৎস ভীম! চলিয়া আইস, যাহার যে কর্ম্মফল, তাহাকে তাহা অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে।" অনন্তর, তাঁহারা ক্রমে উচ্চতর প্রদেশে আরোহণ করিতে করিতে, বিশ্ববিজয়ী মহাবীর অর্জ্জুন ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায় অকস্মাৎ পতিত হইলেন। দিব্যপ্রভাব অর্জ্জুনের পতন দেখিয়া, ভীম অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া পুনরায় যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসিলেন,—আর্য্য! পরিহাসচ্ছলেও যিনি কখনও মিথ্যা কহেন নাই, শৌর্য্যে ও বীর্য্যে, সত্যে ও পরোপকারে যিনি অদ্বিতীয় ছিলেন, সেই পুরুষসিংহ অর্জ্জুন আজি কি পাপে পতিত হইলেন?

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—"ইনি পৃথিবীর যাবতীয় বীরপুরুষকে লঘু জ্ঞান করিতেন। অশেষ গুণের আধার হইয়াও ইনি আত্মাভিমান ত্যাগ করিতে পারেন নাই, এই দোষেই ধনঞ্জয়ের পতন হইল।

বীরপুরুষের বীর্য্যাভিমান একটা মহাপাপ।” তিনি ইহা কহিযা নিঃশব্দে চলিলেন। এক্ষণে একমাত্র ভীম ও সেই কুক্কুর তাঁহার অনুগামী হইল। তাঁহারা কিয়দ্দূর অতিক্রম করিলে, অকস্মাৎ ভীমসেন পতিত হইলেন, যেন সুমেরুর একটা শৃঙ্গ ভাঙ্গিয়া পড়িল। ভীম পতনকালে আর্ত্তনাদ করিয়া কহিলেন,—আর্য্য! বলুন,—আমার কি পাপে পতন হইল?

যুধিষ্ঠির কহিলেন—“ভ্রাতঃ! তুমি অন্যের দিকে না চাহিয়া নিজে অধিক ভোগ করিয়াছ, এবং সর্ব্বদা নিজ বাহুবলের শ্লাঘা করিযাছ, এই পাপেই তোমার পতন হইল। বৎস! ভীমসেন! মনুষ্যসাধারণের স্বভাব এই যে, কেহই নিজ অবস্থায় সন্তুষ্ট নহে। প্রায সকলেই আত্মাভিমানে স্ফীত হইয়া মনে মনে নিজ অধিকারকে প্রসারিত করে। সে যদি ভাবে, এ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে আমি একটা ক্ষোদীয়ান কীটাণু, সে ‘মহতো মহীয়ান্’ ঈশ্বরের তুলনায আমার অস্তিত্ব কতটুকু? তবে সে ভূপতিত হইযা, কম্পান্বিত কলেবরে, যুক্তকরে, ঊর্দ্ধমুখে সেই অনাদিনিধন, অনন্ত ভূমাকে সম্বোধন করিযা বলে, —হে অসীম-অনন্ত-অদ্বৈত-অপরিচ্ছেদ্য মহেশ্বর! হে অনন্তশক্তিধারিন্ জগদীশ! আমি কিছুই নহি—এ বিরাট্ ব্রহ্মাণ্ডের একটা পরমাণু অপেক্ষাও আমি ক্ষুদ্র। হে বিভো! যাহাতে এ দীনাধম তোমার সন্তান বলিয়া আত্মার নিকট আত্মপরিচয় দিতে পারে, আমার প্রতি সেইরূপ কৃপা কর।

“হাঁরে নির্বোধ মানব! সেই মহাসূর্য্যের নিকট তুমি যে একটী খদ্যোতিকাও নহ। কিসের অভিমান কর?

'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥'
—আপনাকে তৃণাধিক ক্ষুদ্র করি' জ্ঞান,
বিনয়ে প্রণম্র হও, ছাড়ি' অভিমান ;
বাতবর্ষাতপ তরু সহে অনিবার,
তেমতি সহিতে শিখ। সর্ব্বদুঃখভার ;
জীবমাত্রে ভাবি' সবে ঈশ্বরসন্তান,
অকৈতবে প্রীতি-ভক্তি করহ প্রদান ;
এগুলি প্রকৃতিসিদ্ধ হইলে তোমার,
বিভুগুণগানে তবে পাবে অধিকার। (১)

যিনি সেই দেবাদিদেবের কৃপায় এ দুর্লভ নরজন্ম লাভ করিয়াছেন, তিনি ইহা তাঁহারি প্রীতিকামনায় তাঁহারি প্রিয়কার্য্যে ব্যয় করিলেই, ইহার সার্থকতা হয়। নিরভিমান, নিঃস্বার্থ ভূত-কল্যাণসাধনই তাঁহার প্রিয়কার্য্য।" তিনি ইহা কহিয়া, ঈশ্বরে চিত্ত সমাধানপূর্ব্বক উচ্চতর শিখরে আরোহণ করিতে লাগিলেন। এক্ষণে একমাত্র কুক্কুর তাঁহার অনুগমন করিল। কঠিন পাষাণে পদতল ক্ষত বিক্ষত হইলেও সারমেয় কিছুতেই তাহার সঙ্গ ছাড়িল না। পথিমধ্যে অকস্মাৎ ধর্ম্মরাজের সম্মুখে জ্যোতির্ম্ময় দেবরথ আবির্ভূত হইল, স্বয়ং দেবরাজ তাহাতে আসীন ছিলেন। সুরনাথ যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—"বৎস! আমি সুরপতি ইন্দ্র, তোমাকে বরণ করিয়া লইতে আসিয়াছি, তুমি অলৌকিক পুণ্যবলে দেবলোকে আরোহণ কর।"

---

(১) প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম্মের ইহাই সর্ব্বোচ্চ আদর্শ।

যুধিষ্ঠির তাঁহাকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—"হে সুরেশ্বর! যাঁহারা আমার আশ্রিত ও ভক্ত, আমার সেই প্রাণাধিক আত্মীয় ও বন্ধুগণের কি গতি হইল? আমি তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া একাকী স্বর্গভোগ করিতে অভিলাষী নহি! আর এই কুক্কুরটী ছায়ার ন্যায় আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছে, ভীষণ সঙ্কটেও নিরস্ত হয় নাই। এ দুর্গম পার্ব্বত্য-পথে কণ্টকে-প্রস্তরে ইহার চরণ ছিন্ন ভিন্ন হইলেও, ইহার ইহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। আমি ইহার অনুরাগ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। অতএব এরূপ ভক্তকে ফেলিয়াই বা কিরূপে গমন করি?" ইন্দ্র কহিলেন, "ছি! ছি! এ কি কহিতেছ! এ ঘৃণিত অস্পৃশ্য শ্বাপদকে এখনি পরিত্যাগ কর। দেবদুর্লভ সম্পদ্ তোমার প্রতীক্ষা করিতেছে। এই কুক্কুরজাতি অতি অশুচি, হিংস্র ও হেয়, ইহাকে এখনি ত্যাগ কর।"

তাঁহার সেই কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠির ধীরস্বরে কহিলেন,—"বিভো! এ মনুষ্য হউক, শ্বাপদ হউক, কীট হউক, বা কীটাণু হউক, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অবজ্ঞেয় ও অস্পৃশ্য হউক, এ আমার ভক্ত ও আশ্রিত; আমি ভক্ত ও আশ্রিতের সহিত বরং ঘোর নরকেও যাইব, কিন্তু তাহাকে ছাড়িয়া অক্ষয় স্বর্গেও যাইব না।" ইন্দ্র কহিলেন,—"হায়! এ নিশ্চয় তোমার বুদ্ধিভ্রংশ ঘটিয়াছে, নহিলে একটা অস্পৃশ্য, ক্ষুদ্র ও অধম শ্বাপদের জন্য স্বর্গের সুখ ত্যাগ করিতে চাহিতেছ? অতএব এ দুর্বুদ্ধি পরিত্যাগ কর।" যুধিষ্ঠির কহিলেন,—"ভগবন্! আমি ঈশ্বরের এ প্রেমময়ী সৃষ্টির মধ্যে কোনও জীবকেই অস্পৃশ্য, ক্ষুদ্র বা অধম বলিয়া জ্ঞান করি

না। সর্ব্বজীবে অভেদ ও অকৈতব প্রেম আমার জীবনের অদ্বৈত ব্রত; এ মহাব্রতের নিকট সহস্র স্বর্গসুখও তুচ্ছ বলিয়া জ্ঞান করি। সর্ব্বজীবকে আত্মসম জ্ঞান করিতে করিতে যদি আমার অনন্ত নরকেও গতি হয়, হউক। ভগবন্! প্রসন্ন হউন; বিশ্বাসপ্রতিপন্ন, ভক্ত ও পীড়িত সহচরকে ত্যাগ করিয়া আমার স্বর্গভোগে কাজ নাই। আর যদি আমার প্রতি একান্তই দয়া প্রকাশ করেন, তবে আমার সমস্ত পুণ্য লইয়া এই কুক্কুর স্বর্গে গমন করুক।"

এই কয়েকটী কথা বলিবার সময় উচ্ছলিত কারুণ্যরসে সেই বিশ্বপ্রেমিকের নয়নদ্বয় বাষ্পার্দ্র হইয়া তুষারবর্ষী প্রভাতকমলের শোভা ধারণ করিল। এ মহাপ্রস্থানে তিনি এক একটী করিয়া, তাঁহার হৃদয়ের আনন্দময় বন্ধনস্বরূপ, —এই পঞ্চকোষী দেহের প্রাণময় কোষস্বরূপ,—তাঁহার পঞ্চপ্রাণবায়ুর এক একটী প্রাণ-বায়ুস্বরূপ—তাঁহার সর্ব্বদুঃখের সান্ত্বনাস্বরূপ—তাঁহার নয়নের নিধি ও প্রাণের আরামস্থল—পঞ্চ ভ্রাতাকে ও নিরুপমা প্রিয়তমা দ্রুপদনন্দিনীকে ছাড়িয়াছেন। কিন্তু সেই ধৈর্য্যসিন্ধু মহাপুরুষ আজি একটী শরণাগত শ্বাপদের মায়া ছাড়িতে পারিতেছেন না। এ জগতে এমন সকল ঈশ্বরানুগৃহীত মহাত্মা আছেন, যাঁহাদের জীবনের পুঞ্জীভূত শোকোচ্ছ্বাস পরদুঃখনিবারণেই প্রশমিত হয়। যাঁহারা নিজ প্রাণাধিক স্নেহতন্তুগুলিকে অকালে চিতানলে বিসর্জ্জন করিয়া, তাহাদের বিয়োগজনিত নিজ সন্তপ্ত অশ্রুধারাকে পরদুঃখাশ্রুধারায় মিশাইয়াছেন। তাঁহাদের সেই সহানুভূতি হইতে অপূর্ব্ব ধর্ম্ম-বীজ অঙ্কুরিত হইয়া, ক্রমে তাহা কুসুমিত ও পল্লবিত হইয়া, সেই শোকদগ্ধের জীবনতরুকে শান্তিময় ফলে

সুশোভিত করিয়াছে। এ জগতে এরূপ শোকদগ্ধ বা অনুতাপ-দগ্ধ হৃদয়ের সহানুভূতি হইতেই জগৎপাবনী করুণানদী প্রবাহিত হইয়া করুণাময়ের এ বিশ্বসৃষ্টিকে উজ্জীবিত রাখিয়াছে। সেই অবাঙ্মনসগোচর মঙ্গলময়ের জাজ্বল্যমান সত্তা সহৃদয় মানবের দয়াগুণেই উপলভ্য।

যুধিষ্ঠির ইন্দ্রকে সেই কথা বলিতে বলিতেই সেই কুক্কুর দিব্য-মূর্ত্তি ধারণ করিল। অনন্তর সেই জ্যোতির্ম্ময় দিব্যপুরুষ অমৃতায়-মান বাক্যে যুধিষ্ঠিরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,—বৎস ! আমি স্বয়ং সর্ব্বসাক্ষী ধর্ম্ম, তোমাকে পরীক্ষা করিতে কুক্করদেহ ধারণ করিয়াছিলাম। আমি তোমার অচলা ভক্তি ও অসীম বিশ্বপ্রেমে মুগ্ধ হইয়াছি। এই সংসার মহাপরীক্ষা-সাগর ; তুমি অলৌকিক ধর্ম্মবলে সেই পরীক্ষাসাগর পার হইয়াছ। অতঃপর তোমার সুদীর্ঘ কঠোর সাধনার ফল লাভ কর। তুমি অমৃতময় ব্রহ্মলোকে বাস করিয়া অক্ষয় ভূমানন্দ উপভোগ কর। যুধিষ্ঠির কহিলেন, ভগবন্ ! আপনি যদি আমার প্রতি একান্ত সদয় হইয়া থাকেন, তবে যথায় আমার সেই জ্ঞাতি-বন্ধু সকলে গমন করিয়াছেন, আমাকেও সেই স্থানে লইয়া চলুন। ধর্ম্ম কহিলেন,—বৎস ! নিজ পুণ্যে তুমিই সর্ব্বোত্তম পদ লাভ করিবে। তোমার আত্মীয়গণ কর্ম্মবিপাকে দুঃখময় অধমলোকে গমন করিয়াছেন, অতএব কিরূপে তাহাদের সহিত তোমার পুনর্ম্মিলন ঘটিবে ?

যুধিষ্ঠির কহিলেন,—"সুখময় হউক, আর দুঃখময় হউক, যে স্থানে আমার আত্মীয়-বন্ধুগণ গমন করিয়াছেন, আমি সেই স্থানই কামনা করি ; আর কোনও স্থান চাহি না। আত্মীয়গণকে

ছাড়িয়া একাকী অক্ষয় ব্রহ্মলোকেও বাস করিবার ইচ্ছা করি না; যথায় আমার স্বজনগণ গমন করিয়াছেন, তাহাই আমার স্বর্গ, আর যাহা আপনি দিতেছেন, তাহা আমার স্বর্গ নহে।"

ধর্ম্ম কহিলেন,—"বৎস যুধিষ্ঠির! এ জগতে সকল পদার্থের ধ্বংস আছে, কেবল বিনা ভোগে কর্ম্মফলের ধ্বংস নাই।

"নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি।"

—বিনা ভোগে কর্ম্মফলের ধ্বংস কোটি কোটি কল্পেও হয় না। পাপ-পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম সমস্ত কর্ম্মই অনন্তের উপর এক একটী অদৃশ্য রেখা বা সংস্কাররূপে অঙ্কিত থাকে (১)। এই অনন্ত মহাকাশ বা মহাশূন্য প্রকৃতপক্ষে শূন্যময় নহে। ইহা সেই সর্ব্বময় পরমাত্মার সত্তায় ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রাণিত। যাহা ব্যষ্টিভাবে জীবাত্মা, তাহাই সমষ্টিভাবে বা পূর্ণরূপে বিশ্বাত্মা। তত্ত্বজ্ঞানীরা জীবাত্মার মূলে ও সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মূলেই সেই বিশ্বাত্মাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হন। বিধাতার এমনি আশ্চর্য্য বিধান যে, এ জগতে কাহারও একটীও কার্য্য, একটীও বাক্য, একটীও নিভৃত মনোভাব, যতই গূঢ়তম হউক, অব্যক্তভাবে অনন্তে অঙ্কিত থাকিবেই, এবং তাহার শুভাশুভ ফল ফলিবেই। "আমি সকলের অগোচরে এই কার্য্য করিলাম, আমি ভিন্ন আর কেহই ইহা দেখিল না," যিনি এরূপ মনে করেন, তাঁহার ন্যায়

---

(১) যেমন গ্রামোফোন-যন্ত্রে পূর্ব্বগীত সঙ্গীতের রেখা অদৃশ্যভাবে রহিয়া যায়। যন্ত্র চালিত হইবামাত্র সেই সকল তান-লয়-রাগাদি-সহিত সঙ্গীত যথাক্রমে উত্থিত হয়।

ভ্রান্তবুদ্ধি আর কে আছে ? মহারাজ দুষ্মন্ত তপোবনে সঙ্গোপনে মুনিতনয়া শকুন্তলাকে বিবাহ করিয়া, পশ্চাৎ সে বিবাহ অস্বীকার করিলে, এবং সে বিবাহের সাক্ষী কে জিজ্ঞাসা করিলে, সেই তেজস্বিনী সাধ্বী বজ্রনাদে কহিয়াছিলেন,—

"একোঽহমস্মীতি চ মন্যসে ত্বং
ন হৃচ্ছয়ং বেৎসি মুনিং পুরাণম্।
যো বেদিতা কর্ম্মণাং পাপকানাং
তস্যান্তিকে ত্বং বৃজিনং করোষি॥"

(মহাভারত।)

'একা আমি' —ইহা তুমি ভাবিতেছ মনে,
জান না সে হৃদীশ্বর সর্ব্বহৃদাসনে ?
ধর্ম্মাধর্ম্ম যাঁর কাছে না থাকে গোপন,
করিছ সাক্ষাতে তাঁরি পাপ আচরণ !

হে পুত্র ! এ জাজ্বল্যমান সত্য যাহার আত্মায় অনুভূত হয়, সে কি প্রাণান্তেও অধর্ম্মপথে অগ্রসর হইতে পারে ? সর্ব্বশক্তিমান্, ন্যায়কারী ঈশ্বরের সাক্ষাতে দূরে থাক্, সামান্য একটী শিশুর সাক্ষাতেও লোকে চৌর্য্য-ব্যভিচারাদি দুষ্কর্ম্ম করিতে সঙ্কুচিত হয়। সর্ব্বক্ষণ সদা বাহিরে ও অন্তরে ঈশ্বরদর্শনই পাপচিন্তার বা পাপানুষ্ঠানের প্রশমনোপায়।

হে বৎস যুধিষ্ঠির ! সেই সর্ব্বান্তঃসাক্ষী, সর্ব্বভূতে বিরাজমান পরমাত্মার জ্বলজ্জ্যোতিঃ দৃষ্টি যুগপৎ সর্ব্বত্রই প্রসারিত, প্রত্যেক অণু-পরমাণুর অন্তর্নিবিষ্ট। এ অপরিসীম ব্রহ্মাণ্ডের একটী কীটাণুরও উত্থান-পতন, একটী ক্ষুদ্রতম তৃণাগ্রেরও স্পন্দন, সে দৃষ্টির

অগোচর নহে। বৎস! তোমার পবিত্র জীবন আদ্যোপান্ত ধর্ম্মময় হইলেও, তুমি ঘোর সঙ্কটে পড়িয়া একটী পাপ করিয়াছ। সে পাপ ব্যাজ-সত্য। তোমাদের গুরুদেব দ্রোণাচার্য্যের শেষ যুদ্ধের দিন, যখন তদীয় অনিবার্য্য বিশিখানলে তোমার পক্ষে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইল, সে সময় সেই ভীষণ দ্রোণানলকে নির্ব্বাণ করিবার জন্য, "অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ"—এ কয়েকটী শব্দ তুমি অভিসন্ধিপূর্ব্বক এরূপভাবে উচ্চারণ করিয়াছিলে যে, দ্রোণগুরু তদ্দ্বারা নিঃসংশয় বুঝিলেন যে, তাহার প্রাণাধিক পুত্র অশ্বত্থামাই হত হইয়াছে। সেই সাংঘাতিক অশিবসংবাদ পুত্র-ময়জীবিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কর্ণে যেমন পশিল, অমনি ঝরঝর অশ্রু ধারার সহিত তাঁহার হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ স্খলিত হইল। তিনি মৌনী ও অধোবদন হইয়া রথোপরি প্রায়োপবেশনে রহিলেন। এইরূপে তিনি যুদ্ধে ক্ষান্ত হইবামাত্র, সেই সুযোগে দুরাত্মা ধৃষ্টদ্যুম্ন, ক্ষত্রিয়কুলে চিরকলঙ্ককালিমা লেপনপূর্ব্বক, বায়ু-বেগে গিয়া খড়্গাঘাতে সেই নিরুপম বীর্য্যনিধি, বীরকুলাচার্য্য, বিশ্ববন্দিত গুরুদেবের দেহ হইতে উত্তমাঙ্গ বিচ্ছিন্ন করিল। অহহ! কি লোমহর্ষণ মহাপাপ। বৎস যুধিষ্ঠির! তুমিই সেই মহাপাপের নিদান। তুমি ব্যাজপূর্ব্বক সত্য বলিতে গিয়া সত্যের মর্য্যাদা খর্ব্ব করিয়াছ। কিন্তু বৎস! দেশকালপাত্রাদি-ভেদে পাপের গুরুতা ও লঘুতা আছে। তোমার সে কার্য্যটী পাতিত্যজনক হইলেও, সে অবস্থায়, নিজপক্ষে সর্ব্বনাশ নিবারণ জন্য ও ধরাতলে ধর্ম্মের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অনুষ্ঠিত হওয়ায়, তাহা লঘুপাপমধ্যে গণিত হইয়াছে। অতএব এক্ষণে

কিয়ৎক্ষণের জন্য তোমাকে নরকদর্শন করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কর্ম্মফলজনিত নিয়তিকে খণ্ডন করা বিধাতারও সাধ্য নহে।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথনে অগ্রসর হইতেছেন, এমন সময় তাঁহারা তিমিরাচ্ছন্ন এক বিভীষিকাময় স্থানে উপস্থিত হইলেন। স্বর্গমার্গের সে রমণীয় স্থান ও পবিত্র দৃশ্যসমূহ যেন ইন্দ্রজালের ন্যায় অকস্মাৎ পরিবর্ত্তিত হইল। তখন যুধিষ্ঠিরের পুরোভাগে বীভৎসতম, লোমহর্ষণ, চৈতন্যবিলোপী, বিকটাকার স্থান আবির্ভূত হইল। সে স্থান ধ্বান্তাচ্ছন্ন হইলেও, তদুত্থিত একপ্রকার অসহ্য-জ্বালাময় আলোকের সাহায্যে তত্রত্য পদার্থসকল দৃষ্ট হইতেছিল। সে স্থান হইতে এরূপ বীভৎস, তীব্র, উৎকট পূতিগন্ধ নির্গত হইতেছিল যে, তাহার আঘ্রাণমাত্র পর্ব্বততুল্য অটল বীরেরও তৎক্ষণাৎ সংজ্ঞালোপ হয়। তথায় সমন্তাৎ বিকৃত কেশ-নখ-মেদোমাংস-রক্ত-পূয়-বসাদি যাবতীয় বিকৃত পদার্থরাশি পুঞ্জীভূত। ভীষণাকার, বিচিত্রমূর্ত্তি শৃগাল কুক্কুর-গৃধ্র ও সিংহ-শার্দ্দূল-ভুজঙ্গমাদি হিংস্র পশু-পক্ষী-সরীসৃপেরা বিকটনাদে তত্রত্য লোকসকলকে সুতীক্ষ্ণ নখদংষ্ট্রাদি দ্বারা রহিয়া রহিয়া ছিন্নভিন্ন করিতেছে। রক্তপায়ী, অস্থিভেদী, প্রকাণ্ড দংশমশকাদি কীটপুঞ্জের নিষ্ঠুর দংশনে তত্রত্য প্রাণীরা মর্ম্মভেদিনী যাতনা ব্যক্ত করিতেছে। ভীমদর্শন কৌণপেরা সকণ্টক-লৌহমুদ্গরাঘাতে সকলকে জর্জ্জরিত করিতেছে। অহহ! আহত প্রাণিগণের পাষাণবিদারী সে আর্ত্তনাদে অতিবড় নিষ্ঠুরেরও মর্ম্ম বিদীর্ণ হয়। দুঃসহ ধূমজালে ও পূতিগন্ধে মিলিত হইয়া অগ্নিকুণ্ডসকল বিকরাল জ্বালাবলী বিস্তার

পূর্ব্বক ধগ্‌ধগ্‌ জ্বলিতেছে। কোথাও বিদীর্ণবক্ষ, ছিন্নোদর প্রাণিগণ যাতনায় বিলুণ্ঠিত হইতেছে, তাহাদের দেহ হইতে রুধিরধারাসহ নাড়ীপুঞ্জ উদ্গীর্ণ হইতেছে। কোথাও বিকটাকার পুরুষেরা জ্বলদঙ্গারলোহিত সন্দংশ দ্বারা নারকীর নাসাক্ষিকর্ণ উৎপাটিত করিতেছে। কোনও স্থানে অগ্নিময় বালুকারাশিতে পড়িয়া জীবগণ ধড়ফড় করিতেছে। যমকিঙ্করেরা কাহাকেও জ্বলন্ত লৌহপট্টে ফেলিয়া পেষণ করিতেছে, কাহাকেও ফুটন্ত-তৈল-কটাহে ফেলিয়া সিদ্ধ করিতেছে। অহহ! পাতকীরা সে নিদারুণ যাতনায় যতই আর্ত্তনাদ করিতেছে, যমদূতেরা ততই খলখল অট্টহাস্যে হর্ষ প্রকাশ করিতেছে। তাহারা কাহাকেও সুতীক্ষ্ণ কণ্টকাকীর্ণ কূটশাল্মলীর গাত্রে ঘর্ষণ করিতেছে, কাহাকেও ক্ষুরধারচক্রে, কাহাকে বা অসিপত্রবনে পাতিত করিয়া বিমর্দ্দিত করিতেছে। সেই বিভীষিকাপূর্ণ নরকলোকমধ্যে ঘোরতিমিরাচ্ছন্না, পূযশোণিতোদকা বৈতরণী নদী ভীষণ ঘট-ঘট নাদে প্রবাহিতা। তন্মধ্যে পাপীরা বারংবার উন্মগ্ন-নিমগ্ন হইয়া আর্ত্তনাদ ছাড়িতেছে। বৈতরণীতীরে ভীষণাকার ভুজঙ্গমেরা সরোষে ফণা তুলিয়া গর্জ্জন করত পাপিগণকে বিষদন্তে বারংবার ক্ষতবিক্ষত করিতেছে। নিদারুণ গরলজ্বালায় পাতকীরা কাতর স্বরে বিলুণ্ঠিত হইতেছে। তথাপি কাহারও সে যাতনাময় জীবনের অবসান নাই। কোথাও ক্ষারোদকা নদীর মধ্যে পাপীরা নিমগ্ন হইয়া, উৎকট পূতিগন্ধি ক্ষারবারি পান করত প্রভূত যাতনা ব্যক্ত করিতেছে। তৎপানে কেহ বিরত হইলেই, তৎক্ষণাৎ উগ্র ও ঘোররূপ যমপুরুষগণের মুদ্গরাঘাতে চূর্ণদেহ

হইতেছে। এরূপ তথায় অসংখ্য প্রকার পাপীর জন্য অসংখ্যরূপ যাতনাযন্ত্র অবিশ্রান্ত পবিচালিত। সকলেরি দেহ শবভূত, কৃশ, দীন, বিবর্ণ, মুক্তকেশ, রূক্ষ ও বীভৎসমলাকীর্ণ। তথায় অগণিত পাতকীর অশেষপ্রকার, কল্পনাতীত যাতনাসকল দর্শন করিয়া, করুণার্দ্রচেতা যুধিষ্ঠির কম্পান্বিত কলেবরে ও দহ্যমান হৃদয়ে নয়ন মুদ্রিত করিলেন, এবং বাষ্পগদ্গদকণ্ঠে ধর্ম্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন, —হে দেব। আমায় কোথায় আনিলেন? অহহ! এ দৃশ্য আমার অসহ্য। আমাব চৈতন্য বিঘূর্ণিত ও হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। আমি আব আত্মাকে প্রকৃতিস্থ করিতে পারিতেছি না। আমাকে শীঘ্র এস্থান হইতে লইয়া চলুন। হা! কোথা আমাব সেই প্রাণাধিক ভ্রাতৃগণ? বলিতে বলিতে তিনি ধর্ম্মদেবেব পদতলে নিপতিত হইলেন।

ধর্ম্মদেব তাঁহাকে সস্নেহে পদতল হইতে তুলিয়া স্নেহমধুব বচনে কহিলেন,—বৎস! এই ক্ষণিক নিরয়দর্শনে, আজি তোমার সেই ব্যাজসত্য-ভাষণরূপ পাতকের অবসান হইল। এক্ষণে তুমি পরমানন্দে নিত্যানন্দময় অমরসদনে আগমন কর।

অনন্তর সেই পুণ্যশ্লোককে নরকসীমা হইতে প্রস্থানোন্মুখ দেখিয়া, যাতনাদগ্ধ পাতকীবা মর্ম্মোপঘাতী কাতরস্বরে কহিতে লাগিল,—হে পতিতপাবন! শান্তিনিধে! দয়াসাগর! যুধিষ্ঠির! দাঁড়ান—দাঁড়ান!—যাইবেন না—যাইবেন না, আমাদিগকে ছাড়িয়া যাইবেন না। হে দেব! এ ঘোর নরকজ্বালায় আপনার দর্শনলাভে আমরা শান্তিলাভ করিতেছি। অহহ! আমাদের যে কি যাতনা, তাহা ত আপনি স্বচক্ষে দেখিলেন! আপনার দেহ

হইতে এক অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ ও দিব্য পরিমল নিষ্ঠ্যূত হইয়া আমাদের এ অসহনীয় নরকযাতনার উপশম করিতেছে। আমরা যে ঘোর পাতকী, আমাদের যে, এ কঠোর যাতনার অবসান নাই, আপনাকে দেখিয়া অবধি তাহা আমরা বিস্মৃত হইয়াছি। আপনি করুণাময়ের সাক্ষাৎ করুণামূর্ত্তি। আপনি অপূর্ব্ব শান্তিসুধার আধার। এ নরকানলে এবং ততোধিক অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া, আমরা আপনার চরণে শরণাগত। আপনি প্রাণান্তেও শরণাগত প্রাণীকে পরিত্যাগ করেন না। বলিতে বলিতে তাহারা তুমুল হাহাকার উত্থিত করিল। দীর্ণমর্ম্মসমুত্থিত সে আর্ত্তনাদে সে নিরয়ের ও হৃদয় যেন স্ফুটিত হইল। প্রহারোদ্যত, নির্ম্মম যম-কিঙ্করেরাও স্তব্ধ ও চকিত হইয়া, সমুদ্যত প্রহরণসকলকে সঙ্কুচিত করিল। তাহাদের সে বিকট বদনমণ্ডলে যেন একটু স্নিগ্ধভাব দৃষ্ট হইল।

ধর্ম্মময় মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের অকলিত ও অনির্বাচ্য পুণ্যতেজে, এবং পাতকীতারণ ভগবানের চরণে পাপিগণের জন্য তাঁহার মর্ম্ম-নির্গলিত, করুণাপূর্ণ প্রার্থনাপ্রভাবে বিশ্বনাথের আসন টলিল। পীড়িত শিশুর সুদূরোত্থিত অব্যক্ত রোদনধ্বনি, যাহা আর কাহারও কর্ণগোচর হয় না, জননী যেমন তাহা সহস্র গৃহকর্ম্মে ব্যস্ত থাকিয়াও শুনিতে পান, তেমনি সেই বিশ্ববন্ধু যুধিষ্ঠিরের সে মর্ম্মভেদিনী প্রার্থনা ঈশ্বর শুনিয়াছিলেন, এবং তাঁহার অভয়-হস্তের ইঙ্গিতমাত্র শত শত পাপী নরকমুক্ত হইয়া অমরধামে যুধিষ্ঠিরের অনুগামী হইয়াছিল।

দয়াবীরা-বাক্‌পুষ্টা

এই প্রাতঃস্মরণীয়া নারী কাশ্মীরপতি মহারাজ তুঞ্জীনের মহিষী ছিলেন। বাক্‌পুষ্টা পতির সহিত ধর্ম্মাসনে অভিষিক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রকার রাজকার্য্যে পতির সহায়তা করিতে লাগিলেন। মহারাজ তুঞ্জীন সেই ধর্ম্মশীলা পত্নীর পরামর্শ ভিন্ন কোনও কার্য্য করিতেন না। অন্যান্য গৃহিণীর কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ সঙ্কীর্ণ, কেবল আপনার গৃহকার্য্য ও কতিপয়মাত্র পরিজনের তত্ত্বাবধানেই সীমাবদ্ধ, রাজগৃহিণীর কার্য্যক্ষেত্র সেরূপ সঙ্কীর্ণ নহে। যাঁহার হস্তে, অগণ্য পরিজনের ও অসংখ্য প্রজার প্রতিপালনের ভার, যাঁহাকে বিভিন্নপথাবলম্বী কোটি কোটি লোকের মনোরঞ্জন করিতে হইবে, যাঁহার উপর একটী বিশাল রাজ্যের ভদ্রাভদ্র নির্ভর করে, তাঁহার ধৈর্য্য, বীর্য্য, দয়া, দাক্ষিণ্য ও বিবেকশক্তি কিরূপ হওয়া উচিত, তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ও পবিত্র প্রভাব কিরূপ হওয়া উচিত, বাক্‌পুষ্টা ইহারই একটী উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

সিংহাসনে অভিষিক্ত হইয়া সেই রাজা ও রাজ্ঞী স্বল্পকালমধ্যে সমস্ত প্রজার হৃদয় অধিকার করিলেন। সমস্ত লোকমণ্ডলী সেই নৃপদম্পতীকে অলৌকিক দেবত্বের অবতার বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিল। বস্তুতঃ ঐশিকভাব প্রত্যেক মানবের আত্মায় অব্যক্তভাবে নিহিত আছে। উপযুক্ত শিক্ষা, সাধুসঙ্গ, অভ্যাস ও অনুশীলনাদি দ্বারা তাহা বহির্জগতে বা কর্ম্মক্ষেত্রে স্ফুরিত হয়।

হৃদয় ও পুরুষকার, এ উভয়ের নিত্যসংযোগই মহোৎকর্ষলাভের ভিত্তি। আন্তরিক ইচ্ছা ও সাধনা করিলে, প্রত্যেক মানব আপনাকে দেবত্বে উন্নীত করিতে পারেন। যাঁহারা প্রেমময় ধর্ম্মজীবনে জয়লাভ করিতে পারেন, তাঁহারা বিনা যুদ্ধে, বিনা বিবাদে জগতের সম্রাট্-মুকুট ধারণ করেন। সে মুকুট কল্পান্তেও বিচলিত হয় না, ম্লান বা বিকৃত হয় না। তাহার কণামাত্রও স্খলিত হয় না, অগণিত কৃতজ্ঞ প্রাণীর অমর আত্মায় সে রাজমুকুট প্রতিষ্ঠিত। তাই আজি, যুগযুগান্তর অতীত হইলেও, কত রাজা ও রাজবংশ প্রলয়-গর্ভে বিলয় পাইলেও, কত শত জাতির উত্থান-পতন সংঘটিত হইলেও, নরদেবতা কৃষ্ণ ও খ্রীষ্ট, বুদ্ধ ও চৈতন্য, ধ্রুব ও প্রহ্লাদ, ব্যাস ও বাল্মীকি—রাম ও যুধিষ্ঠির প্রভৃতির সে বিশ্বপূজিত বরাসন অটল ও অবিকৃত। সতীকুলরত্ন রাজমহিষী বাক্‌পুষ্টা অবসর পাইলেই, স্বামীকে বলিতেন, নাথ! এ অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর ভৌতিক জীবন মানবের আদি ও অন্ত নহে। এ সাম্রাজ্যভোগ মানবভাগ্যের সীমা নহে। যিনি অক্ষয় শান্তি-রাজ্যের অধিবাসী হইতে বাসনা করেন, তাঁহার হস্তে যাবৎ ইহকাল বিদ্যমান, এমন সুন্দর সুযোগ ও সুসময় বিদ্যমান, তাঁহার ক্ষণমাত্রও অলস, প্রমত্ত, নিরুদ্যম বা উপেক্ষাশীল থাকা উচিত নহে। দেখুন! করুণাময় বিধাতা আমাদের হস্তে অতুল বৈভব ও শক্তি দান করিয়াছেন। এই স্বভাবচপলা লক্ষ্মী যাবৎ হস্তে থাকে, তাবৎ আমাদের সর্ব্বান্তঃকরণে ও সর্ব্বপ্রযত্নে ইহার সম্পূর্ণ সার্থকতাসম্পাদনই একান্ত কর্ত্তব্য। পুণ্যসঞ্চয়ের এমন অমূল্য অবসর কয় জন পায়? কত দিনই বা এ শুভযোগ স্থায়ী

হয়? অতীত পরমায়ুর (১) একটী ক্ষণও কোটি কোটি স্বর্ণ-বিনিময়ে ফিরিয়া পাওয়া যায় না। তাহা বিফলে যাইলে, তদপেক্ষা ক্ষতি আর কি আছে? হয়ত, এমন দিন আসিবে, যখন আর পরোপকারের কোনও উপায় রহিবে না।

এ সংসারে বিপদ্ ভিন্ন মানবের প্রকৃত পরীক্ষা হয় না। যেমন অগ্নি কাঞ্চনের পরীক্ষাস্থান, তেমনি বিপদেই ধার্ম্মিকের পরীক্ষা। দৈবঘটনায় তাঁহাদের সেই কঠোর পরীক্ষা আরম্ভ হইল। যেন তাঁহাদের চরিত্রপরীক্ষার জন্যই প্রজামধ্যে এক লোমহর্ষণ দৈব সঙ্কট উপস্থিত হইল। একদা ভাদ্রমাসে, যখন দেশের সমস্ত কেদারমণ্ডল পাকোন্মুখ শালিশস্যে সমাচ্ছন্ন, তখন কাশ্মীরে অকস্মাৎ ঘোর তুহিনপাত হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে দেশের সমস্ত শস্য ও ফলমূল গভীর হিমানীগর্ভে নিমগ্ন হইল, সেই সঙ্গে সমস্ত প্রজার জীবনাশাও বিনষ্ট হইল। ক্রমে রাজ্যে ঘোর দুর্ভিক্ষানল প্রজ্বলিত হইল।

একটী সন্তান পীড়িত হইলে, তাহার শুশ্রূষা পিতামাতার পক্ষে কিরূপ গুরুতর, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ. তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে, যাঁহাদের হস্তে অসংখ্য পীড়িতের ও অসংখ্য মুমূর্ষুর শুশ্রূষার ভার, তাঁহাদের কর্ত্তব্য কিরূপ গুরুতর! এক্ষণে সেই রাজদম্পতীর হস্তে দুর্ভিক্ষপীড়িত অগণিত প্রজার প্রাণরক্ষার ভার পতিত হইল। অন্ন বিনা দেশে হাহাকার উঠিয়াছে; অনাহারে

(১) "আয়ুষঃ ক্ষণ একোঽপি ন লভ্যঃ স্বর্ণকোটিভিঃ।
স চেৎ বিফলতাং নীতঃ কা নু হানিস্ততোঽধিকা॥"

দিন দিন শত শত লোক প্রাণত্যাগ করিতেছে। তদ্দর্শনে রাজা ও রাজ্ঞী তাঁহাদের জীবনের বিষম পরীক্ষার দিন উপস্থিত জানিয়া, বিপদ্বিহারী জগদীশ্বরের নাম স্মরণ করিয়া প্রাণপণে প্রজারক্ষায় দীক্ষিত হইলেন। গৃহে, অরণ্যে, পথে, শ্মশানে, আশ্রমে, কান্তারে, আপণে, পর্ব্বতে, নদীতটে যে যেখানে অনাহারে পতিত, তাঁহারা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া মুমূর্ষুর মুখে অন্নজল প্রদান করিতে লাগিলেন। মহিষী শত শত নিরন্নকে অন্ন দিবার জন্য এককালে যেন শত শত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন; প্রজারা যেন এক অন্নপূর্ণার অসংখ্য রূপ দর্শন করিতে লাগিল।

প্রজার জন্য বিদেশ হইতে অন্ন ক্রয় করিতে ক্রমে রাজকোষ নিঃশেষিত হইল, ক্রমে রাজার ও মন্ত্রিগণের সঞ্চিত অর্থ সকলি নিঃশেষিত হইল। হায়! দুর্দ্দম দৈববলের সহিত ক্ষুদ্র মানব-শক্তি কতক্ষণ যুঝিতে পারে? ক্রমে সকল উপায়ই ফুরাইল। মহিষী প্রজার জন্য গাত্রের অলঙ্কার উন্মোচন করিলেন, পরিধেয় পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া প্রজার অন্ন ক্রয় করিলেন। পুত্রপ্রাণা জননী যে বেশে মুমূর্ষু শিশুকে ক্রোড়ে করে, মহিষী শেষে সেই সর্ব্বত্যাগিনীর বেশে, আলুলায়িত কেশে গৃহে গৃহে অন্নমুষ্টি লইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আর কিছুতেই রক্ষা হয় না। পিতা-মাতা অপত্যপ্রেম বিস্মৃত হইল, জায়া-পতি দাম্পত্যপ্রেম বিস্মৃত হইল, ভ্রাতা-ভগিনী সোদরপ্রেম বিস্মৃত হইল। সকলেই স্বোদরপূরণে উন্মত্ত! দেশের শূর, বীর, পণ্ডিত, মূর্খ, ধনী, নির্ধন সকলেই সমভাবে কালগ্রাসে পতিত হইতে লাগিল। যাহারা জীবিত, তাহাদেরও আর মনুষ্যের আকার

নাই, সকলেই কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট, কঠোর জঠরজ্বালায় জ্বলিত হইয়া চতুর্দ্দিকে বিকট কটাক্ষপাত করিতেছে; একমুষ্টি অন্ন লইয়া মাতা-পুত্রে, পতি-কলত্রে, প্রভু-ভৃত্যে ঘোরতর বিবাদ বাঁধিয়াছে। সমস্ত দেশ যমপুরীর ন্যায় ঘোরদর্শন প্রেতবৃন্দে সমাকীর্ণ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। গৃহে, দ্বারে, পথে, ঘাটে, সমন্তাৎ অনশন-মৃত পুঞ্জ পুঞ্জ শবদেহ পতিত। শবভোজী গৃধ্র, গোমায়ু, সারমেয় প্রভৃতির বিকট নাদে ও মৃতাবশিষ্টগণের আর্ত্তনাদে সে ভূস্বর্গ কাশ্মীর দুর্নিরীক্ষ মহারৌরবে পরিণত হইল। কেন না, কাহাতেও আর মনুষ্যচিহ্ন ছিল না।

সেই লোমহর্ষণ ভীষণ সময়ে, গভীর নিশীথকালে, একদা যখন সমস্ত রাজভবন নিঃশব্দ, নরপতি শয়নকক্ষে সহসা হাহাকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার সে গভীর আর্ত্তনাদে গৃহভিত্তিসকল যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল। মহিষী তখন শান্তিকামনায় ইষ্টদেবতার ধ্যানে নিমগ্না ছিলেন, তিনি পতির রোদন শুনিয়া অমনি তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিলেন। রাজা শোকোন্মত্ত হইয়া হাহাকার করত কহিতে লাগিলেন—দেবি! রাজার পাপ ভিন্ন প্রজার অমঙ্গল হয় না। নিশ্চয় আমারি দোষে নিরপরাধ প্রজালোকের এই সর্ব্বনাশ উপস্থিত। আমারি ভাগ্যদোষে আজি ধরণী অন্নশূন্যা হইয়াছেন। যাহা কিছু উপায় ছিল, ক্রমে সকলি ফুরাইল; নিদারুণ কালের হস্তে সর্ব্বস্বান্ত হইল। দুরন্ত দাবানলে বারিবিন্দুর ন্যায় আমাদের সমস্ত যত্ন লয় পাইল। দেখ! চক্ষের উপর কত শত মহাপ্রাণী বিনষ্ট হইতেছে; শিশুসন্তানগুলি মাতার বিবশ বাহুপাশ হইতে স্খলিত ও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতেছে। কোথাও ক্ষুধার্ত্তের সকরুণ

প্রার্থনা, কোথাও রোগার্ত্তের যাতনাময় চিৎকার, কোথাও শোকার্ত্তের পাষাণভেদী আর্ত্তনাদ, কোথাও মুমূর্ষুর মর্ম্মভেদী অন্তিম কাতরতা। অহো! আমার সেই অমরাবতী কাশ্মীর আজি মহাশ্মশান হইয়াছে। এস্থান হইতে কেহ পলাইয়া প্রাণরক্ষা করিবে, তাহারও পথ নাই; হিমসংঘাতে চারিদিকের পর্ব্বতশ্রেণী অলঙ্ঘ্য, পথ-ঘাট সকলি রুদ্ধ; এস্থান হইতে নির্গমণ করা মনুষ্যশক্তির অতীত। সূর্য্যদেব যেন রসাতলে প্রবেশ করিয়াছেন, ঘোর ঘনঘটায় দশ দিক্ নিরন্তর আচ্ছন্ন রহিয়াছে, যুগপৎ যেন শত শত কাল রাত্রি আসিয়া ঘেরিয়াছে। তরুকোটরের দ্বার রুদ্ধ হইলে, তন্মধ্যে বিবশ পক্ষিদিগের যে দশা হয়, আমার প্রজাগণেরও সেই দশা উপস্থিত। হে দেবি! যাহারা আমার প্রাণের উপাদান, আমার প্রাণাধিক স্নেহাস্পদ, আমি সেই প্রিয়তম প্রজাগণের এ দুর্গতি আর দেখিতে পারি না। আমি জ্বলন্ত হুতাশনে এ দেহ আহুতি দিব। ধন্য সেই নরপাল! যিনি প্রাণাধিক প্রজাগণকে সর্ব্বতোভাবে সুস্থ ও সুখী দেখিয়া রাত্রি-কালে সুখে নিদ্রা যান। হা দেবি! জানি না, কি মহাপাপে আমরা সে সুখে বঞ্চিত হইলাম। নরপতি ইহা কহিতে কহিতে মূর্চ্ছিত হইয়া মহিষীর ক্রোড়ে পতিত হইলেন। মহিষী এতক্ষণ নিস্পন্দভাবে ঐ সকল কথা শুনিতেছিলেন; অকস্মাৎ তাঁহার বদনে দিব্য জ্যোতিঃ আবির্ভূত হইল, তিনি যেন কোনও দিব্য শক্তি দ্বারা অনুপ্রাণিতা হইলেন। তিনি সুপ্তোত্থিতার ন্যায় উঠিয়া পরম যত্নে পতির চৈতন্য সম্পাদন করিলেন। অনন্তর ধীর ও গম্ভীর স্বরে কহিতে লাগিলেন। সেই নিশীথনির্বাত কক্ষমধ্যে

দীপাবলী স্তিমিতভাবে জ্বলিতেছিল, অকস্মাৎ সে সকল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, যেন মহিষী কি বলিবেন, শুনিবার জন্যই গ্রীবা উন্নত করিয়া তাঁহাকে দেখিতে লাগিল। মহিষী কহিলেন,—"নাথ! আপনি নিতান্ত অধীর ও দুর্ব্বলচিত্তের ন্যায় এ কি কথা কহিতেছেন! হায়! এ সময় আপনারও কি চৈতন্যলোপ হইল? প্রবল ঝটিকায় সামান্য তরুর ন্যায় মহাশৈলও যদি বিচলিত হয়, তবে ক্ষুদ্রে ও মহতে প্রভেদ কি? এ জগতে অসাধ্যসাধনেই যদি সমর্থ না হইলেন, তবে নাথ! ভবাদৃশ মহাত্মার মাহাত্ম্য কোথায়? কোন্ পিতা মুমূর্ষু সন্তানকে পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান করে? যেমন পতির প্রতি ভক্তি পত্নীর একমাত্র ব্রত, তেমনি প্রজার প্রতি অনুরাগ রাজার একমাত্র ব্রত। যতক্ষণ দেহে প্রাণ থাকিবে আমাদিগকে অটলভাবে সেই ব্রত পালন করিতে হইবে। আত্মহত্যা দ্বারা সঙ্কট হইতে নিষ্কৃতিলাভ কাপুরুষের কার্য্য। যদি একান্তই তাহা করিতে হয়, তবে যতক্ষণ এ রাজ্যে একটীও মহাপ্রাণীর দেহে প্রাণবায়ু অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিব। অবশেষে যখন তাহারও জীবনাশা নির্ব্বাণ হইবে, তখন আমরা উভয়ে সেই শব-কঙ্কাল আলিঙ্গন করিয়া অনশনে জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিব।" এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহার বদনজ্যোতিঃ দ্বিগুণ প্রজ্বলিত হইল, নয়নদ্বার হইতে অপার্থিব তেজঃপুঞ্জ বাহির হইতে লাগিল, মহিষী গভীরস্বরে বলিয়া উঠিলেন, —"হে ধর্ম্মবীর! উঠুন উঠুন! হে প্রজাপাল! ভয় নাই— ভয় নাই। আমি যদি যথার্থ পতিসেবা করিয়া থাকি, যদি প্রজার দুঃখে আমার অন্তরাত্মা দ্রবীভূত হইয়া থাকে, আমি যদি সত্যের

সাধনা ও ঈশ্বরের উপাসনা করিয়া থাকি, এ জগতে একটী কৃমিকীটেরও কষ্ট যদি আমার প্রাণে বজ্রসম বাজিয়া থাকে, তবে কার সাধ্য আমার কথার অন্যথা করে। হে প্রজানাথ! আপনার প্রজাগণের আর দুর্ভিক্ষভয় নাই”। অহো! পতিব্রতার কি আশ্চর্য্য মহিমা! ঈশ্বরের কি অচিন্ত্য করুণা! এ সংসারে ঘটনাচক্রের কি আশ্চর্য্য গতি! মহিষী ঈশ্বরে আত্মা সমাহিত করিয়া সেই কথা বলিবামাত্র, অকস্মাৎ শূন্যমার্গ হইতে ভূরি ভূরি মৃত কপোত পতিত হইতে লাগিল! রাজা আশ্চর্য্য মানিয়া মরণোদ্যম হইতে বিরত হইলেন। প্রজারা প্রত্যহ সেই মৃত-কপোত-মাংস ভোজন করিয়া প্রাণধারণ করিতে লাগিল, এবং কহিতে লাগিল, “জগদীশ্বর মহিষীর অলৌকিক ধর্ম্মনিষ্ঠায় প্রসন্ন হইয়া সকলের প্রাণরক্ষার এই অদ্ভুত উপায় বিধান করিলেন! আবালবৃদ্ধবনিতা সকলে পরমানন্দে জগৎপিতার অপার মহিমা এবং সেই পুণ্যবতী রাজ্ঞীর গুণাবলী গান করিতে লাগিল।

ঈশ্বর সেই ভগবৎপ্রাণা বিশ্বপ্রেমিকা মহিলার নিকট যথার্থই আত্মপ্রকাশ করিলেন। যাঁহারা জ্ঞানাভিমানী বা ধর্ম্মাভিমানী, ঈশ্বর তাঁহাদের নিকট সর্ব্বদাই আত্মগোপন করেন। পক্ষান্তরে যাঁহারা শিশুর ন্যায় সরল-নির্ব্বিকার, ঈশ্বরের কৃপাপাত্র তাঁহা-রাই। পীড়িত শিশু যাতনায় অস্থির হইয়া কাতরস্বরে ‘মা-মা’ বলিয়া কাঁদিলে, জননী কতক্ষণ তাহার নিকট আত্মগোপন করিতে পারেন? যদি ঈশ্বর চিনিবে, যদি সেই কৃপাময়ের অনুগ্রহ-ভাজন হইবে, তবে শিশুর ন্যায় সরল বিশ্বাসী হও। শিশুর প্রতি মাতৃহৃদয়ের যে প্রেম, সর্ব্বত্র সেই অকৈতব প্রেমের আধার

হও। কোটি কোটি পরিণতবয়া যতি, ব্রতী, ঋষি, তপস্বিগণকে ছাড়িয়া ভগবান্, ধ্রুব-প্রহ্লাদ-শুকদেব-প্রমুখ বালযোগীর নিকট আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন। জগৎপতির অসীম করুণা স্মরণ করিয়া, যাহার হৃদয় অনুক্ষণ প্রেম-ভক্তি-কৃতজ্ঞতার নব নব ভাবাবেশে পুলকিত না হয়, হায়! সে হতভাগ্য, অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইলেও, কি শোচনীয়! প্রেম-ভক্তি-কৃতজ্ঞতা, দয়া-পরোপকার, এগুলি নরজগতে ঈশ্বরদত্ত অমৃত।

দিন দিন মহিষীর পুণ্যরাশি অজস্রধারায় বহিতে লাগিল, ঈশ্বরের কৃপায় আকাশমণ্ডলও ক্রমে সুপ্রসন্ন হইল। যথাকালে বসুন্ধরাও প্রচুর শস্যরত্ন প্রসব করিলেন।

কথিত আছে, ছত্রিশ বৎসর বয়সে প্রজাবৎসল মহারাজ তুঙ্গীন পরলোক গমন করেন। পতিব্রতা বাক্‌পুষ্টা প্রজামণ্ডলীকে শোকসাগরে ভাসাইয়া পতির সহগমন করিয়াছিলেন। পতির শবদেহ আলিঙ্গনপূর্ব্বক তাঁহার জ্বলচ্চিতায় আরোহণকালে, পৌর ও জানপদ, আবালবৃদ্ধবনিতা প্রজাবৃন্দ তথায় হাহাকার তুলিল। সতী সেই জ্বলচ্চিতোত্থিত আরক্ত জ্বালাবলীকে রক্ত-কমলদলশ্রেণীর ন্যায় স্নিগ্ধমধুর জ্ঞান করিয়াছিলেন। তখন সতীর সে শ্রীমুখমণ্ডলে এক অপূর্ব্ব অপার্থিব জ্যোতিঃ প্রদীপ্ত! যেন তদীয় আত্মায় অনির্ব্বচনীয় আনন্দলহরী খেলিতে লাগিল। গলদশ্রু অগণিত প্রজাবৃন্দ তথায় দণ্ডায়মান হইয়া দেখিল,—চিতাগ্নিমধ্য হইতে সে দেবী দুই বাহু তুলিয়া সকলকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন। ক্ষণমধ্যে সকলি নিঃশেষ হইল, কেবল সে দেব-দম্পতীর সে দীনত্রাণ-মহাপুণ্যের কীর্ত্তি জগতের ইতিহাসে চির-

প্রদীপ্ত রহিল। সেই পুণ্যশীলা যে স্থানে মৃত পতির সহগমন করিয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি "বাক্‌পুষ্টাটবী" নামে পবিত্র তীর্থ বলিয়া খ্যাত রহিয়াছে। অদ্যাপি নানা দেশের তীর্থযাত্রীরা তথায় গিয়া পরম ভক্তিযোগে সেই পুণ্যশ্লোক দম্পতীর উদ্দেশে নানা দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে। নানা স্থানের সূত-মাগধ-বন্দীরা তথায় গিয়া মুক্তকণ্ঠে তাঁহাদের কীর্ত্তি সঙ্কীর্ত্তন করে। অহো! পুণ্য-শ্লোকের মরণই অনপায়ী অমৃতময় জীবন।

দয়াবীর-জীমূতবাহন

হেমকূট নগরে জীমূতকেতু নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি বহুকাল প্রজাপালন করিয়া, বৃদ্ধদশায় সর্ব্বগুণাকর জীমূতবাহন নামক পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। অনন্তর বান-প্রস্থাশ্রম-পরিগ্রহের জন্য পত্নীর সহিত মলয়াচলের উপত্যকায় গিয়া বাস করিলেন। "আমি পিতা-মাতার চরণসেবা পরিত্যাগ করিয়া গৃহে থাকিব না" এই স্থির করিয়া জীমূতবাহনও পিতা-মাতার অনুগমন করিলেন, এবং দিবারাত্রি কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন।

তাঁহাদের সেই স্থানে অবস্থানকালে, একদা মিত্রাবসু নামে এক রাজকুমার জীমূতবাহনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন।

তিনি যথোচিত অতিথিসৎকার লাভ করিয়া,বিনীত ভাবে কহিলেন, ভ্রাতঃ! আমার নাম মিত্রাবসু, আমি মলয়রাজ বিশ্বাবসুর পুত্র, আমি পিতৃদেবের আদেশক্রমে আপনার নিকট আসিয়াছি। পিতা আপনাকে বলিয়াছেন,—"বৎস! জীমূতবাহন! আমার মলয়বতী নামে একটী কন্যারত্ন আছে; কন্যাটী আমাদের জীবনস্বরূপা। আমি তাহাকে তোমায় প্রদান করিতেছি, তুমি যথাবিধি গ্রহণ কর। কন্যাটী যেন মূর্ত্তিমতী ভক্তি। বৎস! তুমিও যেন মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম। অতএব তোমরা উভয়ে এই স্পৃহণীয় পবিত্র সম্বন্ধে পরস্পর সম্বদ্ধ হও।"

তাহা শুনিযা জীমূতবাহন অতি বিনীতভাবে কহিলেন,—ভ্রাতঃ! আপনাদের সহিত এ শ্লাঘনীয় সম্বন্ধ স্থাপন করিতে কে না কামনা করে? কিন্তু আমি পিতা-মাতার চরণসেবা হইতে চিত্তকে বিষয়ান্তরে নিয়োজিত করিতে পারিব না। বিশেষতঃ পরমারাধ্য পিতা-মাতা যখন জীবিত আছেন, তখন এ বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ পরাধীন। অতএব আমি এ প্রস্তাবে সম্মত নহি। ইহা শুনিয়া মিত্রাবসু ভাবিলেন, ইনি ভাল কথাই বলিতেছেন, ইনি গুরুজনকে উল্লঙ্ঘন করিবেন না। অতএব ইনি যাহাতে পিতার আজ্ঞায় মলয়বতীকে বিবাহ করেন, তাহাই করিতে হইবে। এই বিবেচনা করিয়া, তিনি এ বিষয় তাঁহার পিতাকে গিয়া জানাইলেন।

অনন্তর জীমূতবাহন পিতা-মাতার আজ্ঞায় সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় মলয়বতীকে বিবাহ করিলেন। সমারোহে বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইলে, বধূ পিত্রালয় হইতে শ্বশুরের তপোবনে আগমন

করিলেন, এবং অলৌকিক শীলসৌন্দর্য্যে সকলের হৃদয়ে অমৃত-ধারা বর্ষণ করত পরম সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

একদা জীমূতবাহন প্রিয়সুহৃদ্ মিত্রাবসুর সহিত সমুদ্রবেলা দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তিনি সিন্ধুতটের অনতিদূরে মলয়গিরির শিখরাবলীর ন্যায় অস্থিস্তূপ দর্শন করিয়া বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন,—সখে মিত্রাবসো! এ সকল অস্থিরাশি কাহাদের? মিত্রাবসু কহিলেন, এ সকল নাগগণের অস্থিরাশি। তাহা শুনিয়া জীমূতবাহন উদ্বিগ্ন হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, হায়! কিরূপে একই সময়ে এত নাগের মৃত্যু ঘটিল? মিত্রাবসু কহিলেন,—এ সকল মৃত্যু এক সময়ে ঘটে নাই। ইহা যেরূপে ঘটিয়াছে তাহা শুন! বিনতানন্দন অমিতবীর্য্য গরুড় প্রতিদিন পাতাল হইতে নাগ আনিয়া এই স্থানে ভক্ষণ করিতেন। অনন্তর ক্রমে সমস্ত নাগকুলের বিনাশাশঙ্কা দেখিয়া নাগরাজ বাসুকি গরুড়কে কহিলেন,—হে খগেশ্বর! আপনার প্রলযবেগে আগমনভয়ে সহস্র সহস্র নাগবধূর গর্ভপাত হয়, শিশুসন্তানগুলিও পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়। এইরূপে আমাদের বংশলোপ হইতেছে। এরূপ ঘটনা আর কিছু দিন চলিলে, নাগকুল এককালে নির্ম্মূল হইবে। অতএব আমাদের সহিত একটা নিয়ম করুন। আমি আজি হইতে প্রতি-দিন একটা করিয়া মহানাগ আপনার ভোজনের নিমিত্ত সমুদ্রতীরে পাঠাইব। পক্ষিরাজও তাঁহার প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তদবধি নাগরাজ প্রতিদিন এই স্থানে এক একটা মহানাগ প্রেরণ করেন, গরুড়ও তাহাকে ভক্ষণ করেন। এইরূপে ভক্ষিত নাগগণের কঙ্কালরাশি দিন দিন এই স্থানে সঞ্চিত হইতেছে।

এই শোচনীয় হত্যাব্যাপার শুনিয়া, জীমূতবাহন ব্যথিত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন,—অহো! কি আশ্চর্য্য! জীর্ণ তৃণকণার ন্যায় অসার ও অশুচি এই তুচ্ছতম দেহের জন্যও লোকে পাপাচরণ করে! নাগলোকের কি বিপদ! আমি নিজ দেহ দিয়াও যদি একটী নাগের উদ্ধার করিতে পারি, আমার জীবন সার্থক হয়। তিনি এইরূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় মিত্রাবসু কোনও বিশেষ কার্য্যানুরোধে সে স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। জীমূতবাহন বিষাদে মগ্ন হইয়া একাকী তথায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে অকস্মাৎ তিনি দূর হইতে শুনিলেন,—"হা পুত্র শঙ্খ-চূড! মায়ের সর্ব্বস্বধন! কেমন করিয়া গরুড় তোমার এই সুন্দর শরীর ভক্ষণ করিবে! হায়! আমি দশ দিক্ শূন্য দেখিতেছি। আর আমার জীবনে কি ফল! দয়াময় পরমেশ্বর! তুমি দীনহীন অশরণের আশ্রয়। আমি তোমার চরণে শরণ লইলাম, দুঃখিনীর জীবনধনকে রক্ষা কর, আমার বাছাকে আমায় ভিক্ষা দাও। উঃ! আমি কি পাষাণ! এখনও বিদীর্ণ হইলাম না! বৎস! চন্দ্রানন! এ দুঃখিনী মায়ের তুমিই যে অনন্য আশ্রয়! একটীবার দাঁড়াও, আমি তোমার চাঁদমুখখানি দর্শন করি"।

এই প্রকার মর্ম্মভেদী করুণাপূর্ণ রোদন শুনিয়া জীমূতবাহন অতিমাত্র ব্যথিত হইলেন, ভাবিতে লাগিলেন, কে এ নারী এরূপ কাতরস্বরে রোদন করে? হায়! বুঝি সেই গরুড় আজি ইহার পুত্রটীকে ভক্ষণ করিবে। গরুড়ের কি নিষ্ঠুরতা! যে নৃশংস মাতৃক্রোড় হইতে শিশুসন্তান বিচ্ছিন্ন করিয়া তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিতে পারে, নিশ্চয় তাহার হৃদয় বজ্র দিয়া গঠিত। আমি

আমার প্রাণ দিয়া উহাকে উদ্ধার করিব। যে ব্যক্তি কাতর ও কণ্ঠাগতপ্রাণ, এ জগতে সকলেই যাহাকে ত্যাগ করিয়াছে, পুত্রপ্রাণা জননী চতুর্দ্দিক্ শূন্য দেখিয়া যাহার জন্য হাহাকার করিতেছেন, সেই অশরণকেই যদি রক্ষা করিতে না পারিলাম, তবে এ দেহধারণে ফল কি? তিনি মনে মনে এই স্থির করিয়া দ্রুতপদে সেই রোদন-স্থানে উপস্থিত হইলেন, দেখিলেন,—এক বৃদ্ধা পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া উন্মত্তার ন্যায় রোদন করিতেছেন। তিনি সম্মুখে গিয়া কহিলেন,—মা! আপনি স্থির হউন, কাঁদিবেন না, ভয় নাই, আমি গরুড়কে নিজ দেহ দান করিয়া আপনার পুত্রকে রক্ষা করিব। অথবা, আর কথায় কি ফল? কার্য্যেই ইহা সম্পাদন করি। এই কথা শুনিয়া বৃদ্ধা কহিলেন,—ও বাছা! অমন কথা মুখেও আনিও না, তুমি চিরজীবী হও। ও যাদু! তোমার ও আমার শঙ্খচূড়ে প্রভেদ কি? অথবা তুমি আমার শঙ্খচূড় হইতেও অধিক, কেন না, তাহাকে রক্ষা করিতে তুমি অকাতরে নিজের প্রাণ দিতে উদ্যত হইয়াছ। শঙ্খচূড় কহিল,—মহাত্মন! আপনার অলৌকিকী করুণায় মুগ্ধ হইয়াছি। আমার ন্যায় কত শত ক্ষুদ্র প্রাণী জন্মিতেছে ও মরিতেছে, কিন্তু পরহিতে বদ্ধপরিকর ভবাদৃশ মহাত্মা এ জগতে কয় জন জন্মিয়া থাকেন? অতএব আপনি এ সঙ্কল্প ত্যাগ করুন, আপনার প্রাণত্যাগে আমার ন্যায় একটীমাত্র ক্ষুদ্র প্রাণীর প্রাণ রক্ষা হইবে, কিন্তু হে দয়াবীর! আপনি জীবিত থাকিলে শত শত মহাপ্রাণীর উদ্ধার হইবে। অতএব ক্ষান্ত হউন। আমিও সমুদ্রতটে ভগবান্ দেবাধিদেবের পূজা করিয়া অবিলম্বে

রাজাজ্ঞা পালন করি। শঙ্খচূড় ইহা কহিয়া জননীর সহিত দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

ইত্যবসরে, গরুড় আসিতেছে দেখিয়া জীমূতবাহন ভাবিলেন,—অহো! শুভাদৃষ্টক্রমে বুঝি আমার মনোরথ পূর্ণ হইল, এই ত গরুড় আসিতেছেন। অতএব শঙ্খচূড় না আসিতে আসিতেই বধ্যশিলায আরোহণ করি। হে দয়াসিন্ধো জগদীশ! তোমার চরণে এ দাসাধমের আর কোনও প্রার্থনা নাই, হে মঙ্গলময়! শরণাগতবৎসল! সর্ব্বান্তঃসাক্ষিন্! তুমি আমার অন্তরের কথা জানিতেছ। এ সন্তানে এই কৃপা কবিও, জন্ম-জন্ম যেন এইরূপ পরহিতেব জন্যই আমার দেহলাভ হয়। তিনি মনে মনে এই প্রার্থনা করিয়া বধ্যশিলায় আবোহণ কবিলেন, এবং পবমানন্দে গরুডকে নিজ দেহ দান করিলেন। গরুড়ও সুতীব্র চঞ্চুকোটি দ্বারা তাঁহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া ভক্ষণ কবিতে লাগিলেন।

গরুড় ক্ষণকাল ভোজন করিয়া ভাবিলেন,—এ কি। আমি ত আজন্মকাল নাগকুল ভোজন করিতেছি, কিন্তু এরূপ আশ্চর্য্য কাণ্ড ত কখনও দেখি নাই। আমি যতই ইহাঁর দেহ খণ্ড খণ্ড করিতেছি, বজ্রসম চঞ্চুদ্বারা মর্ম্মস্থান বিদীর্ণ করিতেছি, ততই ইহাঁর বদনে অপূর্ব্ব আনন্দ লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। ইহাঁর এ অলৌকিক ধৈর্য্য ও প্রসন্নতা দেখিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। এখনও ইহাঁর প্রাণবায়ু বহির্গত হয় নাই, অতএব জিজ্ঞাসা কবি—ইনি কে?

এদিকে জীমূতবাহন মুমূর্ষু দশায় পতিত হইয়াও যখন দেখিলেন, গরুড় ভোজনে ক্ষান্ত হইলেন, তখন ক্ষীণস্বরে

কহিলেন,—মহাত্মন্! এখনও আমার শিরামুখ দিয়া রক্ত ঝরিতেছে, এখনও আমার দেহমাংস নিঃশেষিত হয় নাই, আপনারও সম্পূর্ণ ক্ষুধাশান্তি হয় নাই, তবে কেন ভোজনে বিরত হইলেন? তাঁহার সেই কথা শুনিয়া গরুড় মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন,—কি আশ্চর্য্য! এ মৃত্যুকালেও ইহাঁর এই উক্তি এই বিষম যন্ত্রণায়ও ইহাঁর এত শান্তি! না জানি, ইনি কোন্ মহা-পুরুষ বা দেবতা! অনন্তর জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে মহাপুরুষ আপনি কে? আপনার এই অদ্ভুত ধৈর্য্য ও শান্তি দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়াছি। গরুড় এইরূপ জিজ্ঞাসা করিতে করিতেই শঙ্খচূড় তথায় দ্রুতপদে ও রুদ্ধশ্বাসে উপস্থিত হইয়া সসম্ভ্রমে কহিল,—কি করেন! কি করেন। এ অবিচার করিবেন না, হে গরুড! ইনি নাগ নহেন, ইহাঁকে পরিত্যাগ করুন, আমাকে ভক্ষণ করুন, নাগপতি আপনার আহারের নিমিত্ত আজি আমাকেই পাঠাইয়াছেন। সেই সময় শঙ্খচূড়কে তথায় উপস্থিত দেখিয়া জীমূতবাহন অত্যন্ত বিষণ্ণ হইলেন, ভাবিলেন,—হায়! বুঝি আমার মনোরথ সফল হইয়াও হইল না। গরুড় শঙ্খচূড়কে নিরীক্ষণ করিয়া কহিলেন,—আঃ! যদি তোমাকেই নাগরাজ পাঠাইয়াছেন, তবে আমি এ কোন্ মহাত্মাকে সংহার করিলাম? শঙ্খচূড় কহিল, ইনি ধার্ম্মিকতিলক, বিশ্বহিতৈষী, পুণ্যশ্লোক দয়াবীর জীমূতবাহন। হায়! আপনি কি সর্ব্বনাশ করিলেন গরুড় ইহা শুনিয়া বিষাদে অভিভূত হইয়া ভাবিলেন,—হায় আমি কি করিলাম! আমি জীবলোকের পরম বন্ধু জীমূতবাহনের প্রাণ সংহার করিলাম! নিশ্চয় ইনি এই নাগের প্রাণরক্ষ

করিতে নিজ দেহ দান করিয়াছেন। আমি ঘোর দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি, অধিক কি, করুণানিধান সাক্ষাৎ বুদ্ধদেবকেই সংহার করিয়াছি। আমি নিশ্চয় দুস্তর পাপপঙ্কে নিমগ্ন হইলাম। অহহ! কোটি কল্প কঠোর প্রায়শ্চিত্তেও আমার এ মহাপাপের শান্তি নাই। অনন্তর গলদশ্রুলোচনে জীমূতবাহনের পদতলে পতিত হইয়া কহিলেন,—হে মহাত্মন্! আমি বিষম নরকাগ্নির জ্বালায় দগ্ধ হইতেছি, যাহাতে আমার এ মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, যাহাতে আমি এ অসহ্য মর্ম্মভেদিনী যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই, আমাকে তাহা বলিয়া দিন। জীমূতবাহনের প্রাণবায়ু তখন কণ্ঠাগত, তিনি অতি কষ্টে কহিলেন,—বিনতানন্দন! অদ্যাবধি জীবহিংসা হইতে নিবৃত্ত হউন, সর্ব্বভূতে অভয় দান করুন, আত্মকৃত পাপের জন্য কঠোর অনুতাপ করুন, নিঃস্বার্থ পরোপকারব্রতে দীক্ষিত হউন, করুণাময়ের কৃপায় ক্রমে শান্তি লাভ করিতে পারিবেন। করুণাময় বিশ্বপতির এ বিশ্বরাজ্যে জীবমাত্রই তাঁহারি সৃষ্ট, তাঁহারি প্রিয় সন্তান। যে ব্যক্তি একটী ক্ষুদ্রতম জীবের প্রাণে ব্যথা দেয়, সে তাঁহার নিকট ঘোর অপরাধী। কোন্ পিতা, কোন্ জননী পুত্রহন্তার উপর প্রসন্ন হন? আর আমার বলিবার শক্তি নাই। আমার প্রাণ বহির্গত হইতেছে। জননি! পিতঃ! আপনাদের চরণে এই আমার অন্তিম প্রণাম! এই কথা বলিতে বলিতেই তিনি চক্ষু মুদ্রিত করিলেন।

তাঁহাকে গতাসু দেখিয়া, শঙ্খচূড় হাহাকার করিয়া কহিল,—হা জীমূতবাহন! হা বিশ্ববন্ধো! হা গুণনিধে! এই হতভাগ্যের জন্যই আপনি লোমহর্ষণ যাতনায় জীবলোক পরিত্যাগ করিলেন।

হা মহাপুরুষ! হা পরমকারুণিক! হা পরদুঃখকাতর! হা অকারণমিত্র! কোথায় গেলেন? আমি কাতরস্বরে আপনাকে ডাকিতেছি, আসিয়া আমার শোকশান্তি করুন। হায় 'রে গরুড়! আজি তুমি জগৎকে অনাথ করিলে! বিশ্বের আলোক নির্ব্বাণ করিলে! দীনতারণ, দয়াসিন্ধু জীমূতবাহনকে বিলুপ্ত করিলে! হে লোকপালগণ! স্বর্গ হইতে অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া এই বিশ্ববন্ধু মহাত্মাকে জীবিত করুন।

এদিকে গরুড় শোকার্ত্ত হৃদয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—হায়! আমি এই জীববন্ধু, বিশ্বপ্রাণ মহাত্মার অমূল্য জীবনরত্ন হরণ করিলাম। এক্ষণে কি উপায়ে ইহাঁকে জীবিত করি? কিরূপে এ দুস্তর কলঙ্কসাগর পার হই? শঙ্খচূড়ের কথায় ভাল মনে হইল! দেবলোকে মৃতসঞ্জীবন অমৃত আছে, ক্ষণকালমধ্যেই সেই অমৃত আনিয়া ইঁহাকে জীবিত করি। তিনি ইহা স্থির করিয়া প্রলয়বেগে ক্ষণমধ্যে দেবধামে গমন করিলেন, এবং তথা হইতে অমৃত আনিয়া জীমূতবাহনের গাত্রে সেচন করিলেন। অমৃতস্পর্শে জীমূত-বাহনও পুনর্জীবন লাভ করিলেন। তখন গরুড় সরোদনে তাঁহার চরণে মস্তক নত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন,—আমি এতদিন ঘোর মোহনিদ্রায় অভিভূত ছিলাম, কৃপা করিয়া আপনিই আমাকে জাগরিত করিলেন। আমি আজি হইতে সর্ব্বপ্রকার প্রাণিহিংসায় বিরত হইলাম। আপনি পরহিতে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া যে কীর্ত্তি রাখিলেন, যাবৎ চন্দ্র-সূর্য্য থাকিবে, আপনার এ কীর্ত্তি প্রদীপ্ত থাকিবে। ইহা বলিয়া, বিনতানন্দন বিনীতভাবে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, জীমূতবাহনও আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।

রত্নাকর-চরিত

-৵৯✱৵৲-

পুরাকালে দণ্ডকারণ্যে রত্নাকর নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিত। পবিত্র ব্রহ্মকুলে জন্মলাভ করিয়াও, অসৎসঙ্গে পড়িয়া সে ক্রমে ঘোর দুর্বৃত্ত হইয়া উঠিল। নিত্য নিত্য অসহায় পথিকগণের প্রাণসংহার পূর্ব্বক সর্ব্বস্বহরণ তাহার ব্যবসায়। নৃশংস কিরাত-গণের সহবাস ও নরহত্যা করিয়া সে সম্পূর্ণ পৈশাচভাব প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদীয় নিদারুণ আঘাতে ভূবিলুণ্ঠিত, মুমূর্ষু পান্থগণ যখন পাষাণভেদী কাতর কণ্ঠে মৃত্যুযাতনা প্রকাশ করিত, তখন সে মহোল্লাসে নৃত্য করিত। সে পিশাচ সর্ব্বক্ষণ অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া বনমার্গে তরুগুল্মান্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সতৃষ্ণ ভাবে পথিকগণের গমনাগমন প্রতীক্ষা করিত। বাল, বৃদ্ধ, তরুণ, নর, নারী, একবার তাহার দৃষ্টিপথে পড়িলে, কাহাকেও আর প্রাণ লইয়া গৃহে ফিরিতে হইত না। সে তাহাদের ধনপ্রাণ হরণ না করিয়া ক্ষান্ত হইত না। হায়! এইরূপে কত শত নিরীহ পান্থ, কত শত সাধু-তপস্বী সে দুরাত্মার হস্তে নিহত হইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। কত শত পরিবারে যে সে ঘোর শোকাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়াছিল, কত শত স্ত্রী-পুত্রগণকে অনাথ করিয়াছিল, তাহার সংখ্যা নাই। সে সাক্ষাৎ কৃতান্তের সারথি বা মহাপাপের মূর্ত্তিরূপে বিচরণ করিত। তাহার নামমাত্রে সে প্রদেশের নর-নারী আতঙ্কে চমকিত হইত।

ঘটনাক্রমে একদা দেবর্ষি ভগবান্ নারদ সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন। সেই মহাযোগী মূর্ত্তিমান্ ব্রহ্মানন্দ, তাঁহার হস্তে দিব্য বীণাযন্ত্র। সে বীণাটী যেন মূর্ত্তিমতী তদীয় তপঃসিদ্ধি। সেই ব্রহ্মযোগীর প্রেমপীযূষপূর্ণ দৃষ্টিপাতে দিঙ্মণ্ডল যেন অমৃত-ধারায় প্লাবিত হইতেছিল। তাদৃশ মহাযোগিগণের ত্রিভুবনে ঐহিক বা পারত্রিক কোনও কামনা নাই। কারণ, তাঁহারা আত্মারাম, স্বানন্দভাবেই পরিতৃপ্ত। তাঁহারা নির্দ্বন্দ্ব—শীতোষ্ণ, তিক্ত-মধুর, সুখ-দুঃখ, যৌবন-জরা, জীবন-মরণ, এ সকল ভৌতিক ভাবের অতীত। এই সকল মুক্ত যোগীরাই পরব্রহ্মে অহেতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন।

দস্যু রত্নাকর তাঁহাকে আসিতে দেখিয়াই, ভীষণ দণ্ড সমুদ্যত করিয়া বৃক্ষান্তরাল হইতে বহির্গত হইল, এবং মহাবেগে তদভিমুখে উৎপতিত হইল। দস্যু দেবর্ষির মস্তকে সেই সাংঘাতিক দণ্ড যেমন পাতিত করিবে, অমনি দেবর্ষি জলদগম্ভীর নির্ঘোষে—'তিষ্ঠ তিষ্ঠ' বলিয়া হুঙ্কার করিলেন। তৎক্ষণাৎ উদ্যত-মুগদর-সহিত তদীয় হস্তদ্বয় ও পদদ্বয় স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে স্পন্দন-শূন্য হইয়া চিত্রার্পিতবৎ নিশ্চল ভাবে দণ্ডায়মান রহিল। রুদ্ধ-শক্তি ও বিস্ময়ান্বিত সেই দস্যুর প্রকাণ্ড দেহ রোষে ও ক্ষোভে স্ফীত হইতে লাগিল। জ্ঞান হইল, যেন, দংশনোদ্যত ভুজঙ্গ মন্ত্রশক্তিপ্রভাবে হঠাৎ স্তম্ভিত হইয়া সম্মুখে ফণা তুলিয়া ফুলিতেছে।

সম্মুখে দস্যুপতিকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, দেবর্ষি বিশ্বরোম-হর্ষণ গম্ভীর স্বরে তাহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—অরে রে

পাতকিন্! নরকপশো! দস্যো! তুমি যে ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছ, ঘোর নরকেও যে তোমার দাঁড়াইবার স্থান নাই। অহো! কি ভীষণ তোমার পরিণাম! তুমি কি শোচনীয় জীব! তুচ্ছ অর্থের জন্য প্রতিদিন তুমি অসংখ্য মহাপ্রাণীর প্রাণ সংহার করিতেছ, কিন্তু হায়! এ লোমহর্ষণ মহাপাপে অনন্তকালের জন্য তুমি যে, নিজ আত্মাকেই হত্যা করিতেছ,সে উদ্বোধ তোমার নাই! মানব যখন মোহবশে অবশ হইয়া নানা পাপাচরণ করত, ঘোর হইতে ঘোরতর নরকে নিমগ্ন হইতে থাকে, তখন মাতা-পিতা,ভাই-বন্ধু, স্ত্রী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন কেহই তাহার সঙ্গের সাথী হয় না।

দিব্যতেজঃপুঞ্জ, নির্ভীকমূর্ত্তি নারদের সে তেজস্বিনী বাণী শ্রবণ করিয়া দস্যুপতি কহিল, -তুমি নিশ্চয় আমাকে চেন না, আমি দস্যুরাজ রত্নাকর, এ প্রদেশের বিভীষিকা। অকস্মাৎ আমার দেহ বিবশ হওয়ায়, তুমি এখনও জীবিত আছ। নহিলে, এতক্ষণ তোমার দেহ বিচূর্ণিত ও ধূলিসাৎ হইত। তুমি আমাকে পাপ-পুণ্যের কথা বলিতেছ, তাহা আমি বুঝি না, আমি পাপই করি বা পুণ্যই করি, সকলি জীবিকার জন্য। যাহার যে ব্যবসায়, সে তাহা করিবে, তাহাতে পাপ-পুণ্যের সম্পর্ক কি? আমি কি কেবল নিজের জন্যই নিত্য নরহত্যা করি, আমি যে ইহার দ্বারা আমার বৃদ্ধ পিতা-মাতা, স্ত্রী-পুত্র-কন্যা, সকলের ভরণপোষণ করিয়া থাকি। যদি একার্য্যে পাপ হয়, তবে যাহাদের জন্য এ কার্য্য করিয়া থাকি, তাহারাও ইহার ফলভাগী। যদি আমাকে নরকেই যাইতে হয়, তবে সপরিবার যাইব। প্রাণাধিক পরিবারগণের সহিত ঘোর নরকে যাইতেও আমার দুঃখ নাই।

দস্যুর সেই কথা শুনিয়া নারদ ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন, রে মূঢ়! ও কি কথা বলিতেছ? এ জীবলোকে জীব একাই জন্মলাভ করে, একাই লয় পায়। একাই নিজ সুকৃতের এবং একাই দুষ্কৃতের ফল ভোগ করে। সুকর্ম্ম হউক, দুষ্কর্ম্ম হউক, তৎকর্ত্তাই তাহার ফলভোগী, স্বকর্ম্মের ফলভোগী সে ভিন্ন আর কেহই নহে। দেখ! যুগে যুগে এ ভবে কোটি কোটি মাতাপিতা ও কোটি কোটি সুতদারাদি অতীত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতের গর্ভেও নিহিত আছে। বল দেখি, তাহারা তোমার কে? ইহা অবধারিত জানিও যে, আমি একা, কেহই আমার নয়, আমি কাহারও নই। স্ত্রীপুত্রাদির মায়ায় মুগ্ধ হইয়া মূঢ় লোক পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, শেষে তাহারি ফলে অশেষ নিরয়যাতনা প্রাপ্ত হয়। লোক মরিলে, তাহার আত্মীয়েরা তদীয় শব দেহকে চিতানলে নিক্ষেপ করিয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হয়, তাহার সঙ্গের সাথী কেহই হয় না। তখন তদীয় কর্ম্মফলই তাহার একমাত্র সহগামী। যে ব্যক্তি সময় থাকিতে বুঝিতে পারে, মৎকৃত কর্ম্মের ফলভোগী আমি ভিন্ন আর কেহই নহে,—সেই ন্যায়কারী, সর্ব্বসাক্ষী বিধাতা লোকের আন্তরতম সূক্ষ্মতম ভাবও দর্শন করেন। লোকের সূক্ষ্মতম পাপ-পুণ্যও তদীয় ন্যায়-দণ্ডকে অতিক্রম করিতে পারে না। ইহা বুঝিয়া সতত অপ্রমত্তভাবে আত্মাকে সাধুচিন্তায় ও সদনুষ্ঠানেই নিয়োজিত করে, তাহাকে শেষজীবনে কঠোর অনুতাপে ও দেহান্তে ঘোর নরকযাতনায় দগ্ধ হইতে হয় না! হা হতভাগ্য! দুই দিন পরেই যে, অনন্তদুঃখময় মহানরকে তোমার গতি হইবে, কেহই তোমার সঙ্গে যাইবে না, এ কথা কি কখনও ভাব নাই?

দেবর্ষির সেই কথায় দস্যুপতি যেন কোনও অজ্ঞাত আতঙ্কে চমকিত হইয়া একটু নম্রভাব ধারণ করিয়া বলিল,—আপনার কথায় আজি আমার মনে কেমন একটা সংশয় জন্মিতেছে। এ কি কথা বলিতেছেন? আমি আরাম-বিরাম ত্যাগ করিয়া, নিজের সর্ব্বসুখ বিসর্জ্জন করিয়া, অহোরাত্র হিংস্রসমাকীর্ণ বনে, প্রান্তরে নদীতটে, গিরিসঙ্কটে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক, দয়া-মায়ায় জলাঞ্জলি দিয়া নরহত্যা করিয়া, যাহাদের জীবিকা সংগ্রহ করিতেছি, তাহারাই ত আমার জীবনে-মরণে, ইহলোকে-পরলোকে, সুখে-দুঃখে, পাপ-পুণ্যে, স্বর্গে-নরকে অভেদ্য সহচর। আপনি এ কি কথা বলিতে-ছেন?—তাহারা পরকালে কেহই আমার সঙ্গী হইবে না! কেহই আমার কাছে থাকিবে না! কেহই আমার দুঃখে সান্ত্বনা দিবে না! পরলোকে আমার প্রিয়তমগণের কাহারও সাহায্য পাইব না! আমি কি তবে ভস্মে ঘৃত ঢালিতেছি? এ অতি অসম্ভব কথা। আপনি জানেন না, আমার প্রাণাধিক স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদিগের আমার প্রতি কত ভক্তি, কতই দয়া-মায়া, কতই সহানুভূতি। তাহারা আমার জন্য সকলি করিতে পারে।

দেবর্ষি দস্যুকে বলিলেন,—দেখিতেছি, তুমি আমার কথায় বিশ্বাস করিতেছ না। বরং তুমি স্বগৃহে গিয়া তোমার সে প্রাণাধিক পরিবারদিগকে স্বয়ং জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, তাহারা কি উত্তর দেয়, জানিয়া আইস।

দস্যু কহিল,—আপনি অগ্রে শপথ করুন, আপনি আমার জন্য এইস্থানে অপেক্ষা করিবেন। নারদ কহিলেন, তাহার অন্যথা হইবে না। দস্যু কহিল, যদি আপনি পলায়ন করেন? নারদ

ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, হে দীনবুদ্ধে! কাহার ভয়ে পলাইব? ত্রৈলোক্যে কোথাও কাহাকেও আমরা ভয় করি না। ব্রহ্মসমাহিত ব্রহ্মযোগীরা সর্ব্বত্রই অভয়, তাহার প্রমাণ ত প্রত্যক্ষ করিলে, আমাকে প্রহার করিতে গিয়া তোমার কি দশা ঘটিল! পুনরায় তোমার সঙ্গে দেখা না করিয়া আমি কোথাও যাইব না। দস্যু তখন ঘোরতর সংশয়ে উদ্‌ভ্রান্ত চিত্ত হইয়া দ্রুতপদে গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিল। সে গৃহে উপস্থিত হইয়াই সমস্ত পরিবারবর্গকে সম্মুখে আহ্বান করিল, এবং একান্ত আগ্রহ সহকারে সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিল, হে প্রেমময়জীবিতে জননি! হে পুত্র-সর্ব্বস্ব পিতঃ! হে পতিপ্রাণে গৃহিণি! হে জীবনসর্ব্বস্ব পুত্র! তোমরাই আমার প্রাণ—তোমরাই আমার সর্ব্বস্বধন। আমি তোমাদেরি জীবিকার ও সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য প্রতিদিন যে নর-হত্যাদি মহাপাপ করিতেছি, তোমরা কি এ পাপের ভাগী নহ? বল! বল! সত্য করিয়া বল। আজি এ বিষয়ে আমার ঘোর সংশয় উপস্থিত। শীঘ্র এ সংশয় দূর কর। আজি দৈবঘটনায় আমার চিত্তে বিষম সংশয় ও ঘোর আতঙ্কের উদয় হইয়াছে। অকস্মাৎ আমার মর্ম্মে যেন শত শত বিষদিগ্ধ শল্য বিদ্ধ হইতেছে। এ সংশয়-শল্যের নিরাকরণ না করিলে, অতি অসহ্য যাতনায় আমার প্রাণ বহির্গত হইবে।

সেই কথা শুনিয়া তাহার পিতা মাতা উত্তর করিল,—বৎস! শৈশবে যখন তুমি আত্মপোষণে ও আত্মরক্ষণে অক্ষম ছিলে, তখন আমরা প্রাণপণে তোমাকে লালনপালন করিয়াছি। তুমি পীড়িত হইলে, আমরা উভয়ে আহার-নিদ্রা ও সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া,

নিজ জীবনে বিন্দুমাত্র মমতা না করিয়া, অহোরাত্র অবিরাম তোমার শুশ্রূষা করিয়াছি। তোমার আরোগ্য--তোমার সুখশান্তিই আমাদের ধ্যান, জ্ঞান ও সাধনা ছিল, ভগবানের চরণে উহাই আমাদের অদ্বৈত প্রার্থনা ছিল। বাত, বর্ষ, হিম, আতপ, অগ্নি, কোনও বাধাই মানি নাই। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, অনশন কিছুই গ্রাহ্য করি নাই। তোমার জন্য সকল বাধা ও সকল ক্লেশ অম্লানমুখে সহ্য করিয়াছি। সহস্র মৃত্যুকেও তৃণজ্ঞান করিয়াছি। বলিতে কি, তোমার আরোগ্যকামনায় আমরা বুক চিরিয়া রক্ত দিতে কুণ্ঠিত হই নাই,—তোমার জন্য প্রাণনাড়ী ছিন্ন করিয়া দিতে পরাঙ্মুখ হই নাই,—আমাদের মন-প্রাণ-আত্মা নির্গলিত করিয়া দিতে কাতর হই নাই। হা বৎস! আমাদের, বিশেষতঃ তোমার জননীর সে শবসাধনার--সে অতুলনীয় মহোপকারের একটী কণিকারও ঋণ তুমি শত শত জন্ম সেবা করিয়াও পরিশোধ করিতে পার না (১)। বৎস! আমরা এক্ষণে জরাজীর্ণ ও কার্য্যাক্ষম। আমাদের শেষ দিন আগতপ্রায়। এ সময় তুমি আমাদিগকে একমুষ্টি অন্ন দিতেছ বলিয়া আমরা তোমার কৃত পাপের ভাগী হইব? কেহ কি কাহারও পাপ-পুণ্যের ভাগ লইতে পারে? বৎস! এ যে অতি অসম্ভব কথা! জানিও, এ সংসারে জীবমাত্রেই স্বকর্ম্মফলভোগী।

পুত্র! শিশু সন্তান যেমন মাতাপিতার অবশ্যপালনীয়, বৃদ্ধ পিতামাতাও তেমনি বয়স্থ সন্তানের অবশ্যপালনীয়। এরূপে যাহা যাহার কর্ত্তব্য সে তাহা স্বয়ং বুঝিয়া করিবে। কেন না,

---

(১) "যম্মাতাপিতরৌ ক্লেশান্ সহেতে পুত্রকারণাৎ।
ন তেষাং নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং জন্মশতৈরপি॥" (মনুঃ)

তাহার শুভাশুভ ফল তাহাকেই ভোগ করিতে হয়। এ জগতে জীবমাত্রেই আপন কর্ম্মের ফলভোগী। বিনা ভোগে কোটিকল্পেও কর্ম্মফলের ক্ষয় হয় না। মাতা-পিতা বা অন্য কেহই কাহারও গতি নহে। কারণ, জীবকে একাকী নিজ কর্ম্মফলমাত্র সহায় করিয়া এ সংসার হইতে প্রস্থান করিতে হয়। আপনার জন্যই করুক বা অন্যের জন্যই করুক, স্বকৃত কর্ম্মের ফলভাক্ সে স্বয়ং। তাহাতে আর কাহারও অণুমাত্র অংশ বা লেশমাত্র সংস্রব নাই। ইহা অবধারিত সত্য।

অনন্তর দস্যুপতি প্রাণাধিকা ভার্য্যার বদনে সাগ্রহ দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক অতি কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিল,—প্রিয়ে! তুমি কি আমার পাপের অংশভাগিনী নহ? আমি তোমার সুখের জন্য কি না করিয়াছি এবং কি না করিতে পারি? বল-বল? শীঘ্র বল? আমার চিত্ত বড়ই ব্যাকুল হইয়াছে, আমার মর্ম্মস্থান বিদীর্ণ হইতেছে। স্বামীর সেই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া, ভার্য্যা কিয়ৎকাল মৌনভাবে অধোবদনে রহিল। অনন্তর অতি ব্যাকুলভাবে কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল,—হে নাথ! এ জগতে তোমার ন্যায় সুহৃদ্—তোমার ন্যায় আশ্রয় ও তোমার ন্যায় প্রীতিভাজন-বিশ্রম্ভাস্পদ এ অবলার আর কেহ নাই। আমি প্রাণপণযত্নে একান্তভাবে তোমার সেবা করিয়া থাকি। পতিসেবাই যেমন নারীর পরম ধর্ম্ম, ধর্ম্মপত্নীকে গ্রাসাচ্ছাদনাদি দিয়া ভরণপোষণ করাও তেমনি পতির একান্ত কর্ত্তব্য। ইহা ভিন্ন আর কিছুই জানি না; তোমার কর্ম্মের ও কর্ম্মফলের সহিত আমার সম্পর্ক কি? আমি ত নাথ! তোমাকে কখনও এমন কথা বলি নাই, যে তুমি নরহত্যাদি

করিয়া ধনোপার্জ্জন কর। বরং তোমাকে কতবার এ নৃশংস কার্য্যে ক্ষান্ত হইতেই উপদেশ দিয়াছি। সাংসারিক অভাব, গৃহিণী পতিকে বিনা কাহাকে জানাইবে? তাই আমি এ গৃহে প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব ঘটিলে তোমাকে জানাইয়াছি। আমার কার্য্য আমি করিয়াছি। তোমার কার্য্যের জন্য আমি কেন দণ্ডভাগিনী হইব? একের অপরাধে অন্যের দণ্ড, এ অতি বিচিত্র কথা!

দস্যুপতি ক্রমে সকলের নিকট ভগ্নাশ হইয়া শেষে সর্ব্বাধিক আদরের পুত্রটীকে ক্রোড়ে তুলিয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিল,—অয়ি বৎস! আমি প্রধানতঃ তোমারি মায়ায় মুগ্ধ হইয়া তোমার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবিকার সংস্থান জন্যই এ নৃশংস দস্যুবৃত্তি করিতেছি। বাবা আমার! সর্ব্বস্ব আমার! তুমিও কি ত্বদ্গতপ্রাণ এ পিতার পাপ-পুণ্যের ভাগী নহ?

পুত্র বিনীতভাবে কহিল,—আমি অদ্যাপি বালক, নিজ পোষণে অক্ষম। অশরণ শিশুসন্তানগণকে সর্ব্বপ্রযত্নে লালনপালন করা পিতার অবশ্যকর্ত্তব্য। আপনি আমার শৈশবে যেমন পরম যত্নে আমার ভরণপোষণের ভার লইয়াছেন, আপনি বার্দ্ধক্যে উপার্জ্জনে অক্ষম হইলে, আমিও আপনাকে সর্ব্বপ্রযত্নে ভরণ-পোষণ করিব। যথাকালে যাহার যাহা কর্ত্তব্য, সে তাহা অবশ্য পালন করিবে, এবং সে কর্ম্মের ফলভোগী সেই হইবে, তাহার কর্ম্মের জন্য অন্যে কেন দায়ী হইবে?

প্রাণাধিক পরিবারবর্গের প্রত্যেকের নিকট এইরূপ উত্তর পাইয়া সেই আজন্ম-পাপী মস্তকে হস্ত দিয়া বহুক্ষণ হতবুদ্ধি, স্তম্ভিত ও

নির্ব্বাক্ হইয়া রহিল। চিরদিনের পর আজি তাহার নয়নপ্রান্তে অশ্রু দেখা দিল। সে থাকিয়া থাকিয়া চমকিত ও আতঙ্কে কম্পিত হইতে লাগিল! বুঝি এতদিনের পর আজি তাহার চমক ভাঙ্গিল। যাহার ঘাত যেরূপ প্রবল, তাহার প্রতিঘাতও তদনুরূপ। এ প্রতিঘাত—এ অনুতাপ একদিন সকলেরি জীবনে আসিয়া থাকে, তবে, কাহারও বিলম্বে। শীঘ্র বা বিলম্ব মানুষের আয়ত্ত নহে; সেই সর্ব্বদর্শী ন্যায়কারী বিভুর বিবেচনাধীন। তিনি যথাকালে স্বকার্য্য করিবেনই। মানব ভীষণ মহাপাপের প্রতিফল দেখিতে ব্যস্ত হয়, এবং মনে করে, ঈশ্বরের কি অবিচার! এখনও এ দুরাত্মা এ পাপের প্রতিফল পাইল না। বাইবেলে লেখা আছে,—ঈশ্বর নিজ প্রতিকৃতি হইতেই মানবসৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু মনুষ্যচরিত আলোচনা করিলে জ্ঞান হয়, ঠিক্ ইহার বিপরীত,—অর্থাৎ প্রায়ই মানুষেরা আপনাপন আদর্শমতই ঈশ্বর-কল্পনা করিয়া থাকে। অর্থাৎ আমি ব্যগ্র ও অধীর বলিয়া আমার কল্পিত ঈশ্বরকেও সেইরূপ হইতে হইবে। ফল কথা,—ঈশ্বর অনন্ত, কাল অনন্ত, আত্মা অনন্ত। এ অনন্ত পরিমণ্ডলমধ্যে দুই এক জন্ম বা দুই এক যুগ—মহাসিন্ধুর বিন্দুও নহে। সেই সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর যখন যাহা করেন, তাহাই 'যথাকাল', এবং তাহাই সম্পূর্ণ মঙ্গল, এ বিশ্বাস মানবের বহু অশান্তির প্রশমন।

প্রিয়তম পরিবারবর্গের প্রত্যেকের নিকট এইরূপে ভগ্ন-মনোরথ হইয়া, সে মস্তকে হস্ত দিয়া বহুক্ষণ স্তম্ভিতভাবে অবস্থান করিল। কোনও অজ্ঞাত আতঙ্কে তাহার চিত্ত অভিভূত ও প্রাণ আকুল হইতে লাগিল। এক দিন পাপি-

মাত্রেরি যাহা অপরিহার্য্য [illegible]ক দণ্ড, আজি সে দুর্ব্বিষহ অনুতাপ তাহার হৃদয়কে আক্রমণ করিল। তখন তাহার সে লোমহর্ষণ পাপপরম্পরা একে একে চিত্তে উদিত হওয়ায়, সে নিজ হৃদয়মর্ম্মে যুগপৎ শত শত বৃশ্চিকের দংশন অনুভব করিল। যেন, শত শত অলা[illegible] তাহার নাড়ীচক্র বিদীর্ণ হইতে লাগিল, যেন ক্রকচ দ্বারা তাহার মর্ম্মস্থান নিকৃত্ত হইতে লাগিল, যেন তুষাগ্নিকুণ্ডে তাহার অন্তরাত্মা সিদ্ধ হইতে লাগিল।

যাহার ইন্দ্রিয়গ্রাম যত প্রবল, তাহার পাপের মাত্রা তত অধিক, এবং শেষে অনুতাপজ্বালাও তদনুরূপ হইয়া থাকে। অনুতাপের গভীরতা আয়তন ও তীব্রতা চরম সীমায় উপস্থিত হইলে, স্বল্পকালমধ্যে কল্পনাতীত বিপ্লব সংঘটিত হয়। মানবজীবনে ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হয়। কথিত আছে, কোনও যুবাপুরুষ রাজদণ্ডে কারারুদ্ধ হওয়ায়, সুতীব্র মর্ম্মপীড়ায় এক রাত্রিতেই তাহার মস্তকের সুকৃষ্ণ কেশকলাপ সমস্তই কাশপুষ্পের ন্যায় শুক্ল হইয়া গিয়াছিল। আজি সেই দুর্জ্জয় দস্যু রত্নাকরের মূর্ত্তি সুতীব্র অনুতাপে দগ্ধ হইয়া সদ্যই বীভৎস শবাকারে পরিণত হইল, সে থর থর কাঁপিতে কাঁপিতে উন্মত্তবৎ দেবর্ষির নিকট আসিয়া তাঁহার পদতলে নিপতিত ও মূর্চ্ছিত হইল।

অনুতাপে জ্বলিতহৃদয়, অনাথবৎ বিহ্বলভাবে রোরুদ্যমান, মুহুর্মুহুঃ মূর্চ্ছাপন্ন, সেই দস্যুকে দেখিয়া, পরমকারুণিক মুনিবরের অন্তরাত্মা দয়ারসে দ্রবীভূত হইল। তখন তিনি মহাযোগে নিমগ্ন হইলেন। তিনি দস্যুর সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া,

তন্ময় হৃদয়ে শিবশক্তিময় সঙ্গীতরাগের অলৌকিক স্বরূপ ধ্যান করিতে লাগিলেন। সে রাগব্রহ্ম পরম প্রেমের সিন্ধু। কথিত আছে, সর্ব্বপ্রথম নারদের দিব্য বীণাযন্ত্রে সে রাগের ঝঙ্কার শুনিয়া মহাপ্রেমে বিষ্ণু দ্রব হইয়া যান। তাহাতেই ধরাতলে দ্রবময়ী গঙ্গার আবির্ভাব। দ্রবময়ী গঙ্গার অভ্যন্তরে ঈশ্বরের প্রেমময়ী করুণা-নদী গূঢ়ভাবে প্রবাহিতা।

মহাযোগী নারদ তখন ভগবদ্ধ্যানে স্তিমিতলোচন, যেন গম্ভীর, নিস্তরঙ্গ প্রশান্ত সাগর। অকস্মাৎ তাঁহার যোগলব্ধা, অমৃতালাপিনী ব্রহ্মবীণা (১) ভেদ করিয়া তারকব্রহ্মনামের অপূর্ব্ব রাগ সমুত্থিত হইল। সে রাগ শ্রবণমাত্র চরাচর প্রেমানন্দে ঢলিয়া পড়িল। তন্ত্রীঝঙ্কার-মিলিত সেই অপার্থিব সঙ্গীত যখন লহরে লহরে দশদিকে ছুটিল, তখন দিঙ্মণ্ডল যেন ভূরি ভূরি অমৃতধারায় প্লাবিত হইতে লাগিল। তাহার প্রভাবে স্থাবর-জঙ্গম বিশ্ব নিঃশব্দ ও নিস্পন্দ হইল। জ্ঞান হইল যেন, এ বিশ্বমণ্ডল একখানি প্রকাণ্ড চিত্রপটে অঙ্কিত। তৎকালে মহাসিন্ধুর গর্জ্জন স্থগিত হইল। তরঙ্গিণীর কল্লোলকোলাহল শান্ত হইল। পবনের গতি নিরুদ্ধ ও জীবগণের স্পন্দন স্থগিত হইল। পাষাণও দ্রব হইল, সূর্য্যরশ্মিও শীতল হইল। অপূর্ব্ব দিব্য পরিমলে দশদিক্ আমোদিত হইল। বজ্রপ্রাণ নিষ্ঠুরেরও

(১) বীণা বহুবিধ। তন্মধ্যে নারদীয় ব্রহ্মবীণাই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য বীণার মধ্যে বিপঞ্চী, বল্লকী, জ্যেষ্ঠা, চিত্রা, ঘোষবতী, জয়া, হস্তিকা, কূর্ম্মিকা, কুব্জা, সারঙ্গী, পরিবাদিনী, ত্রিসরী, শ্বেততন্ত্রী প্রভৃতি প্রধান। ব্রহ্মমহিমা উপগীত হওয়ায় নারদ-বীণার নাম ব্রহ্মবীণা।

পাষাণ-চিত্ত যেন শত শত খণ্ডে বিদীর্ণ হইয়া গেল। সে সঙ্গীত-ধারা বায়ুসাগরে মিলিত হইয়া অনন্তে প্রসারিত হইয়াছিল। যে নাদব্রহ্ম ভক্তের অনাহত চক্র ভেদিয়া উত্থিত হয়, তাহার প্রভাব অত্যাশ্চর্য্য। শান্ত-পাবন, অচিন্ত্যবৈভব, মহাযোগমগ্ন দেবর্ষির সে ভগবৎসঙ্গীত চতুর্দ্দশ ভুবন ভেদ করিয়া, ব্রহ্মলোকে উত্থিত হইয়াছিল। তাই ব্রহ্মের আসন টলিল। দস্যুপতি দেবর্ষির সম্মুখে তখন পাষাণময়ী মূর্ত্তির ন্যায় দণ্ডায়মান। দেবর্ষিও তখন বাহ্যজ্ঞানপরিশূন্য।

যাহার প্রভাবে স্বল্পক্ষণে এরূপ অচিন্তনীয় একটী মহাবিপ্লব সংঘটিত হয়, বিশুষ্ক মরুক্ষেত্রেও স্বর্গমন্দাকিনী তর-তর প্রবাহিতা হয়, সে সাধুসঙ্গ ও ভক্তহৃদয়নিষ্ঠ্যূত ভগবৎসঙ্গীত কি অনির্ব্বচনীয় পদার্থ! ভারতীয় ঋষিগণের প্রণীত সঙ্গীতশাস্ত্রে নাদব্রহ্মের যেরূপ অলৌকিক প্রভাব ও মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে অবাক্ হইতে হয়। এস্থলে সঙ্ক্ষেপে তাহার মৌলিক-তত্ত্বের কিঞ্চিৎ আভাসমাত্র প্রদত্ত হইতেছে। তাহাতে পার্থিব আবিলতার নাম-গন্ধ নাই। তাহা মহাযোগের এক অদ্ভুত সিদ্ধিক্ষেত্র। স্বয়ং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি সুরেশ্বরগণ, নারদ, ভরত, বাল্মীকি প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ, এবং হাহা,হুহু, বিশ্বা-বসু, তুম্বুরু প্রমুখ গন্ধর্ব্বগণ নাদব্রহ্মের প্রবর্ত্তক ও সাধক বলিয়া কীর্ত্তিত। তাঁহাদের প্রণীত বহুবিধ সঙ্গীতসংহিতা (১) প্রচলিত

(১) দুঃখের বিষয়, রাজ্যবিপ্লবাদি নানা দুর্ঘটনায় এবং লোকের যত্ন ও সাবধানতার অভাবে অসংখ্য আর্য্যসঙ্গীতশাস্ত্র লয় পাইয়াছে। এখনও যাহা আছে, তাহার সংখ্যা হয় না।

আছে। নারদসংহিতায় রাগের উৎপত্তি বিষয়ে এইরূপ কথিত আছে ;---

"শিবশক্তিময়ো রাগঃ পরমপ্রেমসাগরঃ।
যস্য শ্রবণমাত্রেণ বিষ্ণুরার্দ্রতরোঽভবৎ।
তেনৈব গঙ্গা সম্ভূতা জগত্ত্রিতয়তারিণী॥"

—সঙ্গীতরাগ সাক্ষাৎ শিব-শক্তি, পরম-প্রেমসাগর। দেবর্ষি নারদের মুখ হইতে উহার উৎপত্তি। ভগবান্ নারায়ণ, দেবর্ষির মুখে প্রথমে উহা শ্রবণমাত্রেই দ্রবীভূত হইয়াছিলেন। তাহাতেই ত্রিলোকতারিণী দ্রবময়ী সুরধুনীর উৎপত্তি হয়। এ রূপকের অন্তরালে অপূর্ব্ব তত্ত্ব নিহিত। ফলতঃ সঙ্গীতের শক্তি যে অত্যদ্ভুত ও অনির্ব্বচনীয়, তাহাতে সংশয় নাই। ভগবৎপ্রাণ ভক্তের বদন-চন্দ্রনিষ্ঠ্যূত সঙ্গীতসুধা শ্রোতৃগণকে ধূতপাপ করিয়া, তাহাদের হৃদয়ে যে আনন্দসন্দোহ দান করে, তাহা ব্রহ্মানন্দের সহোদর। আমরা সচরাচর যে সঙ্গীত শ্রবণ করি, তাহা প্রকৃত সঙ্গীত নহে, সঙ্গীতের ব্যভিচারমাত্র। প্রকৃত সঙ্গীত মহাযোগীর ব্রহ্মসমাধির আনন্দময় ফল। সে ফলের স্বরূপতত্ত্ব নির্ণয় করিতে যোগিগণেরও বাক্য-মন হারি মানে। নারদসংহিতার একটীমাত্র বচন অনুধাবন করিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে, প্রাচীন সাধকগণ কাহাকে সঙ্গীত বলিতেন এবং তাহার প্রভাবই বা কিরূপ।

নারদ বলিতেছেন ; —

"জপকোটিগুণং ধ্যানং ধ্যানকোটিগুণো লয়ঃ।
লয়কোটিগুণং গানং গানাৎ পরতরং নহি॥"

—পরম ব্রহ্মের জপ অপেক্ষা ধ্যানের প্রভাব কোটিগুণ অধিক।

ধ্যান অপেক্ষা লয়ের প্রভাব কোটিগুণ অধিক। লয় অপেক্ষা গানের প্রভাব কোটিগুণ অধিক। অতএব, গান অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধনা আর নাই। 'লয়' অর্থাৎ ব্রহ্মে বিলীন হওয়া; তাহা হইতেও গানের শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করা আপাততঃ প্রলাপ বলিযাই বোধ হইবে। কিন্তু গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়, যে, ইহা ভক্তিতত্ত্বের সার কথা। ভক্ত স্বয়ং আনন্দ হইতে চায় না, সে অহর্নিশ অবিরাম ভূমানন্দ উপভোগ করিতেই চায়। এজন্য ভক্তকুলতিলক বৈষ্ণবেরা বলিয়া থাকেন,—"আমি চিনি হইতে চাই না, চিনির মাধুর্য্যই ভোগ করিতে চাই।" প্রথমতঃ জপকার্য্যে সাধকের নাসা, কণ্ঠ, উর, তালু, জিহ্বা, দন্ত প্রভৃতি বহিরিন্দ্রিয়ের সংযোগ আছে। কিন্তু ধ্যানে তাহা নাই। ধ্যানে শুধু অন্তরিন্দ্রিয় মনের যোগ। বহিরিন্দ্রিয় অপেক্ষা অন্তরিন্দ্রিয় মন প্রধান। এজন্য জপ অপেক্ষা ধ্যানের অর্থাৎ ব্রহ্মচিন্তার উৎকর্ষ অধিক। লয় অর্থাৎ ব্রহ্মে লীন হওয়া বা ব্রহ্মের সহিত একত্ব-ভাব, ইহাতে ধ্যাতা ও ধ্যেয়, ভোক্তা ও ভোজ্য, জীব ও ব্রহ্ম, এ উভয়ে পার্থক্য থাকে না। কিন্তু গানে, গেয় ও গায়কে বা গেয় ও শ্রোতায় পার্থক্য থাকে। একটী সেই নাদরূপী ব্রহ্মা-নন্দ, অপরটী সেই ব্রহ্মানন্দের ভোক্তা। ব্রহ্মানন্দ ভিন্ন তুমি জগতে আর যাহা কিছু ভোগ করিবে, ভোগ করিতে করিতে ক্রমেই তোমার ভোগলালসা নিস্তেজ হইবে। ক্রমে তাহা আর রুচিকর হইবে না। মন আবার নূতন চাহিবে, বিরাম চাহিবে, বৈচিত্র চাহিবে। কথায় বলে, ক্রমাগত খাইতে খাইতে অমৃতেও বিতৃষ্ণা হয়। কিন্তু প্রকৃত সাধকের ভগবৎসঙ্গীত যে আনন্দ

দান করে, তাহা অনন্তকাল অবিরাম উপভোগ করিলেও, সে বুভুক্ষার নিবৃত্তি নাই, প্রত্যুত ক্ষণে ক্ষণে, পদে পদে, পলকে পলকে, লহরে লহরে, অপূর্ব্ব অপূর্ব্ব রসাস্বাদ দান করিয়া ভোক্তাকে চিদানন্দসাগরের গভীর হইতে গভীরতর স্তরে নিমজ্জিত করে। সে ভূমানন্দের স্তর-পরম্পরার সীমা নাই। তাহা অনন্তকাল অবিচ্ছিন্ন ভোগেও, প্রতিক্ষণে নব-নব-নব।

জীবন্মুক্ত যোগীশ্বর এইরূপে সেই ভক্তি-সঙ্গীতে ত্রিলোকী-হৃদয় বিমুগ্ধ করিয়া দেখিলেন, দস্যুপতি তদীয় পদতলে নিপতিত ও মূর্চ্ছিত। তাহার যুগল নয়নে ধারা বহিতেছে, ঘন ঘন তাহার বক্ষ স্ফীত ও স্পন্দিত হইতেছে, যেন তাহার হৃদয় ও নাড়ীচক্র ভেদ করিয়া অনুতাপ উচ্ছ্বসিত হইতেছে। তাহার সে আকার নাই। সে ভীষণতা তিরোহিত। সে হৃদয় ও সে মূর্ত্তি এক্ষণে নবনীতকোমল, সরল, সুন্দর শিশুটার ন্যায়। সে বহুক্ষণ স্তব্ধ ও নিঃশব্দ থাকিয়া হাহাকারপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিল,—হা নাথ! হা দয়াময়! —হা পতিতপাবন! হা অগতির গতি! হা সর্ব্বপরিত্যক্ত মহাপাপীর আশ্রয়!—এ দীনহীন অশরণে দয়া কর!—দয়া কর!—তুমি জগজ্জননী; জননীর যেমন অধমতম পুত্রে অত্যধিক স্নেহ, মহাপাপীর প্রতি তোমারও তদপেক্ষা কোটিগুণ স্নেহ। বলিতে বলিতে তাহার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইল। সে আর কিছুই বলিতে পারিল না। বাতাহত কদলীর ন্যায় সে দেবর্ষির পদতলে পতিত ও মূর্চ্ছিত হইল। দেবর্ষিও তাহার গাত্রে কমণ্ডলু-জল সেচন পূর্ব্বক তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিলেন।

অনন্তর বালারুণকান্তি, তেজ, ক্ষমা ও করুণার আধার দেবর্ষি দস্যুপতিকে পদতল হইতে তুলিয়া জিজ্ঞাসিলেন,—অহো দস্যুরাজ! তোমার গৃহের সংবাদ কি? কেহ কি তোমার কর্ম্ম-ফলের ভাগী হইতে চাহিল? অথবা আর তোমাকে বলিতে হইবে না। তোমার আকার দেখিয়াই বুঝিয়াছি। তোমার সে মহাবল-শালী, সুগঠিত, হৃষ্টপুষ্ট দেহের অকস্মাৎ এ কি দুর্গতি! অহো! তোমার সে দেহ হঠাৎ বিকৃত শবাকারে পরিণত। বৎস! যে দিন যখন তুমি প্রথমে পাপচিন্তা করিয়াছিলে, সেই দিন তখনি অলক্ষ্যভাবে ভীষণ মৃত্যু আসিয়া তোমাকে আক্রমণ করিয়াছে। এ আধ্যাত্মিক মৃত্যুর পরিণাম ভয়ানক! ইহা তপ্ত কটাহে আমিষপিণ্ডের ন্যায জীবন্ত দেহীকে সিদ্ধ করে। তুমি এক্ষণে অন্তরে মৃত, বাহিরে জীবিতের ন্যায় দৃশ্যমান। তোমাব নিদ্রা বা জাগবণ সকলি যাতনাময়। অহো। তোমার পাপোপহত জীবন দাবাগ্নিদগ্ধ অরণ্যের ন্যায় শোচনীয়।

দস্যু কাঁপিতে কাঁপিতে অতি দীনভাবে কহিতে লাগিল,—হে দেব! আপনি যাহা বলিতেছেন, সকলি সত্য। এ নারকীর আদ্যোপান্ত সমস্ত জীবন ঘোর পাপময়। হায়! আজি আমি নিজ দুষ্কৃত পরম্পরা স্মরণ করিয়া যেন তুষানলে দগ্ধ হইতেছি। আমার সে বল-বীর্য্য-সাহস সকলি অন্তর্হিত। বলিতে কি, এক ঘোরতর বিভীষিকায় আমি দশ দিক্ আতঙ্কময় দেখিতেছি। হায়! আমার কি গতি হইবে? আমি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ করিয়া, কোথাও শান্তি পাইব না। বুঝিতেছি, মাদৃশ পাতকীর জন্য স্থান ভুবনের কুত্রাপি নাই। আমাকে অনন্তকাল দীনহীন ও

নিরাশ্রয় হইয়া, কঠোরতম বেদনায় হাহাকার করিতে হইবে। অহহ! স্বকৃত সে সকল লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড আজি আমার স্মৃতিপথে একে একে উদিত হওয়ায়, আমার দেহবন্ধন বিশ্লথ ও হৃদয়মর্ম্ম স্ফুটিত হইতেছে। হে ভগবন্! আমার কি গতি হইবে? আমার অন্তরাত্মা বিহ্বল হইয়া যেন ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইতেছে। আমার চৈতন্য উদ্‌ভ্রান্ত; আমার সম্মুখে সমস্ত জগৎ বিঘূর্ণিত। হায় রে! পাপের অনুতাপ কি এতই ভয়ানক!—হে দীনদয়াময় ভগবন্! এ অশরণ মহাপাপী আজি আপনার চরণে শরণাপন্ন। হে পতিতপাবন! ব্রহ্মর্ষিঠাকুর! এ পতিত মহাপাতকীকে উদ্ধার করুন' বলিতে বলিতে সে পুনর্বার মূর্চ্ছিত হইয়া তাঁহার পদতলে পতিত হইল।

করুণার্দ্রচিত্ত দেবর্ষি সেই পতিত পাতকীকে সযত্নে তুলিয়া নিজ ক্রোড়ে বসাইয়া স্বহস্তে তাহার অশ্রু মুছাইলেন। অনন্তর সান্ত্বনা ও অভয় দিয়া অমৃতায়মান বাক্যে কহিলেন,—হে বৎস! এই বিশ্বমণ্ডল একটা সুবিশাল ক্ষেত্রস্বরূপ। জীবগণ ইহার কৃষক। আমাদের স্বকর্ম্মরূপ কৃষিকার্য্যই আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক আশা-ভরসা। মানবমাত্রেই ঐহিক ও পারত্রিক উভয় সুখেরই প্রত্যাশী। কিন্তু মোহবশতঃ অধিকাংশ মানব পারত্রিক মঙ্গলের দিক্‌টা ভুলিয়া যায়। ঐহিকী সুখলালসার আকর্ষণ উহাদের নিকট অত্যধিক। অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দুর্ঘটনায় শস্যহানি হইলে, প্রকৃত কৃষিজীবী তাহাতে চিরনিরাশ হয় না, সে কৃষিকার্য্য হইতে কদাচ ক্ষান্ত হয় না। সে ভাবী বর্ষের সুফলের আশায় নিজ ক্ষেত্রকে যথাবিধি কর্ষণাদি দ্বারা

সর্ব্বথা প্রস্তুত করিয়া রাখে। সে অতি সাবধানে ও সন্তর্পণে নিজ ক্ষেত্রের আগাছা-কুগাছা প্রভৃতি প্রতিকূল কারণসমষ্টিকে অপসারিত করে। অনন্তর আশায় উন্মুখ হইয়া, একান্তভাবে জীবরূপ চাতকের নবঘনরূপী সেই দয়াময় বিভুর কৃপা ভিক্ষা করে। যথাকালে ক্ষেত্র যথাবিধি কর্ষিত ও উপ্তবীজ হইলে, এ বর্ষে না হয়, আগামী বর্ষে এক দিন অবশ্যই তাহাতে ধারাপাত হইবেই। পরিপূত, ভক্তিময় জীবহৃদয়েই ভগবানের প্রিয়তম পীঠ। জীবকে অহরহঃ অণুক্ষণ সেই হৃদয়দেবতার শুভাগমনের প্রতীক্ষায় উন্মুখ থাকিতে হয়। আসন ও অধিবাসের আয়োজন যথাবিধি প্রস্তুত থাকিলে, তাহাতে একদিন তাঁহার বিশেষভাবে অধিষ্ঠান হইবেই, এবং তাঁহার অধিষ্ঠানমাত্রেই সে সাধকের শত শত জন্মের সাধনা আশাধিক ফলে পরিণত হইবে। অতএব বৎস! নিরাশ হইও না। আজি যে, এ ঘটনায় অকস্মাৎ তোমার এ পরিবর্ত্তন, ইহার অন্তরালে কি সেই করুণাময়ের জাজ্বল্যমান মঙ্গলহস্তের চিহ্ন দেখিতেছ না? তুমি মহাপাপী বলিয়া ভগবানের করুণায় নিরাশ হইতেছ! বল দেখি, —নিজ সন্তান গলিতকুষ্ঠী হইলেও, জগতের হেয়তম অস্পৃশ্য হইলেও, কোন্ জননী তাহাকে ঘৃণা করিয়া পরিত্যাগ করে। যেমন আতুর সন্তানে জননীর অধিক টান, তেমনি পাপীর প্রতি ভগবানের বিশেষ কৃপা। তিনি নিকৃষ্টতম মহাপাতকীকেও সদ্গতিদানে মুক্তহস্ত। পথভ্রষ্ট পতিত সন্তানকে কোন্ সময় কিরূপ অবস্থায় পতিত করিলে, তাহার স্থায়ী সুমঙ্গল হইবে, তাহা তিনিই বুঝেন। পতিত পাতকীর মতিগতি কিরূপে ফিরিতে পারে, তাহা সেই সর্ব্বজ্ঞ,

সর্ব্বসাক্ষী, দয়াসাগর ঈশ্বর যেমন বুঝেন, অন্যের তেমন বুঝিবার শক্তি নাই। ধেনু যেমন নিজ বৎসের পিছু পিছু ফিরে, ঈশ্বর তেমনি প্রত্যেক জীবের সঙ্গে সঙ্গেই আছেন।

হে বৎস! মহাপাপের বিশুদ্ধিসাধন, একমাত্র স্বদোষানুসন্ধানজনিত অনুতাপ ও সাধুসঙ্গ। অগ্নিসংযোগে অঙ্গার যেমন সদ্যই মালিন্যনির্ম্মুক্ত হইয়া অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ ধারণ করে, মানবাত্মাও তেমনি অনুশয়দহনে দগ্ধ হইয়া ধৃতপাপ হয়। যাহাকে সদ্যোদাহক জ্বলদনল জানিয়া শিহরিয়া উঠিতে, তাহাই আবার পূত-স্নিগ্ধ, স্পর্শশীতল রত্নে, এবং যাহাকে কালসর্প জানিয়া আতঙ্কিত হইতে, তাহাই আবার হৃদয়ভূষণ, প্রাণারাম মুক্তাহারে পরিণত হয়।

দেখ বৎস! বীভৎস নালায় নিবদ্ধ, কীটাকীর্ণ, নরকতুল্য যে জলের সুতীব্র পূতিগন্ধে লোকের বমন উপস্থিত হয়, তাহাই আবার বিমলসলিলা গঙ্গার গর্ভে মিলিত হইয়া বিমলগঙ্গোদকে পরিণত হয়। সেই জল সাধুভক্তেরা লইয়া ভক্তিভরে দেব-ঋষি-পিতৃলোকের তর্পণ করিয়া থাকেন। যে যতই মহাপাপে কলুষিত হউক, ঈশ্বরকৃপায় ও সাধুসঙ্গলাভে তাহার পুনরুদ্ধার অবশ্যম্ভাবী। অতএব, এ জগতে কাহারও নিরাশ হইবার কারণ নাই।

পতিতপাবন যোগিবরের সে অভয়বাণী বারংবার শ্রবণ করিয়া, সে ভগ্নহৃদয় দস্যুর নৈরাশ্যতিমিরাচ্ছন্ন হৃদয়ে অপূর্ব্ব আশালোক উদিত হইল। সে বুঝিল, ইনি সামান্য ব্যক্তি নহেন। ইনি সাক্ষাৎ ব্রহ্মমূর্ত্তি, ইহাঁর আত্মা ব্রহ্মময়। প্রলয়েও ইহাঁর বাণীর অন্যথা নাই। তখন আশায় উৎফুল্ল হইয়া,—হে পাতকীর

প্রাণবন্ধো! হে দেব! হে কৃপানিধে! এ পতিতাধমে দয়া করুন, এ দীনহীন শরণাগতকে আপনার শ্রীচরণে চিরদাস করিয়া রাখুন! হে ভগবন্! বুঝিয়াছি, স্বয়ং ঈশ্বর আজি এ মহা-পাপীর প্রতি কৃপা করিয়া, ভবাদৃশ অভয়ানন্দ ব্রহ্মর্ষির দিব্যরূপে আমাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছেন। বলিতে বলিতে সে পুন-বায় দেবর্ষির চরণতলে পতিত হইল। তখন পরমকারুণিক নারদ প্রেমনির্ভরে তাহাকে তুলিয়া নিজ ক্রোড়ে লইলেন, এবং মৃতসঞ্জীবনী-সুধারূপ পতিতপাবন-তারকব্রহ্ম-নাম-মন্ত্রে তাহাকে দীক্ষিত করিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহার অপূর্ব্ব তেজোময়, জ্ঞান-ময়, কল্পনাতীত-প্রতিভাজ্যোতিঃ—আর্য্য চক্ষু উন্মীলিত হইল। যে দেহে পূর্ব্বক্ষণে নরঘাতকের দূষিত শোণিত বহিতেছিল, পরক্ষণেই আবার তাহারি শিরায় শিরায় করুণারূপ পবিত্র শোণিত বহিতে লাগিল। ঈশ্বরের এমনি করুণা! সাধুসঙ্গের এমনি মহিমা!

অনন্তর করুণাসিন্ধু দেবর্ষি কারুণ্যপূর্ণ হৃদয়ে সুমধুর কণ্ঠে তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া কহিলেন,—বৎস! উঠ-উঠ! আমি তোমাকে এই শুভ মুহূর্ত্তে দিব্য চক্ষু দান করিয়াছি, অপার্থিব মহামন্ত্র তোমাকে দান করিয়াছি। ভগবৎকৃপায় ও সেই সিদ্ধ যোগীর প্রভাবে সত্যসত্যই সে তখন এক তেজোময় অপূর্ব্ব রূপ ধারণ করিল। সুদীর্ঘকালব্যাপী কঠোর সাধনা বিনা যে দুরধিগম জ্ঞানমার্গে সিদ্ধি লাভ হয় না, আজি ভগবৎকৃপায় ও সাধুসঙ্গে এক মুহূর্ত্তেই তাহা সম্পন্ন হইল।

তখন দেবর্ষি কহিলেন,—'বৎস'! এক্ষণে ভগবৎকৃপালব্ধ দিব্য নেত্রে দর্শন কর!—এ বিশ্ব প্রেমময়। এ বিশ্বের কর্ত্তা ও গোপ্তা

বিভু প্রেমময়। জীবের ভুক্তি ও মুক্তি বিশ্বপ্রেমে প্রতিষ্ঠিত। অতঃপর তুমি অনন্যকর্ম্মা হইয়া একতান চিত্তে বিশ্বপ্রেমের সাধনা কর; ইহাতেই জগৎপতি তোমার প্রতি প্রীত হইবেন। তুমিও সর্ব্বপাপ-নির্ম্মুক্ত হইয়া, অন্তে অমৃতপদ লাভ করিবে। কঠোরতপা ঋষিগণ যাহা শত জন্মের সাধনায় লাভ করিতে পারেন না, তুমি তাহা এ দেহেই লাভ করিবে। হে বৎস! যে জীবন বিশ্বপ্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত, প্রলয়েও তাহার বিলয় নাই। বিশ্বপ্রেমিকের জীবন নিত্য-সত্য-মঙ্গলময়ের অঙ্গীভূত, এজন্য তাহা নিত্য-সত্য-মঙ্গলময়। বিশুদ্ধ সত্ত্বময় প্রেমিকহৃদয়ই প্রেমরাজ্যের সিংহাসন। বিশুদ্ধ হৃদয় অপেক্ষা পবিত্রতম অমূল্য পদার্থ আর কিছুই নাই।

"তীর্থানাং গুরবস্তীর্থং চোক্ষাণাং হৃদয়ং শুচি।
দৃশ্যানাং পরমং জ্ঞানং সন্তোষঃ পরমং সুখম্॥"

(মহাভারত।)

—সদ্‌গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ, হৃদয় অপেক্ষা সুপবিত্র নির্ম্মল বস্তু, জ্ঞান অপেক্ষা দর্শনীয় পদার্থ এবং সন্তোষ অপেক্ষা উৎকৃষ্টতম সুখ আর নাই।

বৎস! আমার হস্তে যে এই বীণা দেখিতেছ, ইহার নাম 'অমৃতবীণা'। অমৃতালাপিনী মৃতসঞ্জীবনী শক্তি দ্বারা ইহা অনুপ্রাণিতা। তুমি বিশ্বপ্রেম-মহাসাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়া এ বীণা লাভ করিবে। এ বীণায় তুমি ভুবনপাবন শ্রীরাম-চরিত গান করিয়া ত্রিলোকীকে বিমুগ্ধ করিবে। তুমি 'বাল্মীকি' নামে বীণাপাণির বরপুত্ররূপে পূজিত হইয়া, ব্রহ্মাণ্ডবাসীর নিকট

অনন্তকাল আছ্য কবির শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করিবে।” ইহা বলিয়া, সে দিব্যতেজঃপুঞ্জ দেবর্ষিমূর্ত্তি অন্তরীক্ষে বিলীন হইল। কেবল তৎকৃপালব্ধ সেই অক্ষয় আর্য্য-জ্যোতিঃ রত্নাকরের অমরাত্মায় অমর হইয়া রহিল।

সাধুসঙ্গ-মহিমা।

নারদ।

যিনি ব্রহ্মর্ষিগণের অগ্রণী, দেব-দানব-মানবাদি ত্রিলোক-বাসীর বরণীয়, যাঁহার দর্শনমাত্র, ইন্দ্রাদি দেবগণও সসম্ভ্রমে যদীয় পদতলে পতিত হইয়া দিব্যকিরীটোদ্ভাসিত মস্তককে বিলুণ্ঠিত করেন, যাঁহার আজ্ঞা পালন করিয়া লোকপালগণ নিজ নিজ আত্মাকে ধন্য জ্ঞান করেন, যাঁহার প্রভাব সর্ব্বোপরি অপ্রতিহতভাবে প্রতিষ্ঠিত, সেই দেবর্ষিবর, ত্রিলোকপাবন, পাতকিতারণ, প্রাতঃস্মরণীয়, মুক্তযোগী ভগবান্ নারদের জন্ম দাসীগর্ভে। ভুবনপ্রখ্যাত, অনন্তরত্নাকর-মহাভারতাদি ইতিহাস, অষ্টাদশ মহাপুরাণ, শ্রুতিশীর্ষ বেদান্তসংহিতা প্রভৃতির প্রণেতা, নারায়ণাবতার মহর্ষি বেদব্যাসের জন্ম ধীবরকন্যার গর্ভে। মহর্ষি-পূজ্যা সিদ্ধশবরী শ্রমণার জন্ম চণ্ডাল-কুলে। এইরূপ কত শত নর-নারী হীনতম কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ধরণীকে নিজ নিজ গুণে ধন্যা করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। শ্রমণা ও গুহক

চণ্ডালকুলে প্রসূত বলিয়া কি তাঁহারা প্রাতঃস্মরণীয় পুণ্যশ্লোকের অগ্রণী নহেন? মলিনতম মৃদঙ্গার-খনি-গর্ভে যেমন অমূল্য মহারত্ন হীরক জন্ম গ্রহণ করে, এ জগতে অসংখ্য মহাত্মারাও তেমনি, হীনবংশে প্রসূত। অতএব জন্ম গণনীয় নহে, কর্ম্ম বা পুরুষকারই গণনীয়। হীনযোনি-সমুদ্ভূত বলিয়া লোকে আজি যাহাকে ঘৃণা করিতেছে, সেই হীনজন্মাই আবার ঈশ্বরকৃপায় ও স্বপৌরুষে ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত হইবে, সকল লোক তাহাকেই চিরস্মরণীয় ও চিববরণীয় মহাত্মার বরাসনে বসাইয়া, তদীয় চরণে ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি দান করিয়া নিজ নিজ আত্মাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে। এ জগতে স্ত্রী-পুরুষ, বিপ্র-চণ্ডাল, বালক-বৃদ্ধ, এ সকল পূজাস্থান নহে, একমাত্র চরিত্রই পূজাস্থান। হীনজন্মা ও সহায়সাধনবিহীন হইয়াও, যিনি ভুবনপাবন চরিত্রবলে ধন্য, তিনিই সর্ব্বলোকের অনুকরণীয় আদর্শ-চবিত্র। একমাত্র সাধুসঙ্গই এ আদর্শ-চরিত্রের জন্মদাতা।

'সাধুসঙ্গ' বলিলে, কেবল কোনও ব্যক্তিবিশেষেব সঙ্গ বুঝায় না। বস্তুই হউক, ব্যক্তিই হউক, জড় হউক, চেতন হউক, দেশ, কাল বা পাত্রই হউক, দৃশ্য, অদৃশ্য, পরোক্ষ, প্রত্যক্ষ, যাহাই হউক না কেন, যাহার সংস্রবে আসিলে স্বভাব ধৃতপাপ হয়, অরুণোদয়ে নৈশ তিমিররাশির ন্যায় চিত্তের অশেষ মলিনতা তিরোহিত হয়, হৃদয়েব চিবসঞ্চিত পাপতাপ দূরে যায়, আত্মায় এক অপূর্ব্ব সত্ত্বগুণের উদ্রেকে কৃপাপীযূষসাগর ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিরস উদ্বেলিত হয়, নিরন্তর ভূতকরুণা ও নিষ্কাম পরোপকার বিনা বিষয়ান্তরে মতিগতি আবদ্ধ হয় না, প্রকৃতপক্ষে তাহাই সাধুসঙ্গ।

ভগবদ্ভক্ত মহাত্মারা এ সাধুসঙ্গকে জঙ্গম তীর্থরাজ(১) বলিয়াছেন। অন্য তীর্থে স্নান করিলে, দৈহিক মালিন্যমাত্র দূর হয়, কিন্তু এ তীর্থরাজে গাঢ়রূপে অবগাহন করিলে, আত্মার শতজন্ম-পুঞ্জীভূত অশেষ মালিন্যরাশি নির্ধৌত হয়। এইজন্যই জগতের সর্ব্বস্থানের সমস্ত জ্ঞানীরা সমপ্রাণে ও সমস্বরে সাধুসঙ্গের অসীম মহিমা উৎকীর্ত্তন করিয়াছেন। মহাভারতকর্ত্তা, বিশ্বহিতৈষী মহর্ষি দ্বৈপায়ন মুক্তকণ্ঠে বলিয়াছেন,—"নিত্যমেব চরিত্রাণি শ্রোতব্যানি মহাত্মনাম্।" ভুবনপাবন পুণ্যশ্লোকগণের চরিত্রানুশীলনে এককালে শত শত সাধুসঙ্গের ও শত শত শাস্ত্রপাঠের ফল লব্ধ হয়।

হিন্দুজাতির চিরপূজিত মহাপুরাণ ভাগবতে দেবর্ষি নারদ নিজ পূর্ব্বকথা ব্যাসের নিকট এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ;—

হে মহমে! পুরাকল্পে ও পূর্ব্বজন্মে আমি এক দাসীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলাম। বাল্যেই আমি পিতৃহীন হইলাম। আমার দুঃখিনী জননী এককালে নিরাশ্রয়া হইলেন। আমাকে ভরণপোষণ করিবার সম্বল তাঁহার কিছুই ছিল না। তিনি শিশু-সন্তানটীকে লইয়া ঘোর বিপদে পড়িলেন। কেহ কোনও দিন দয়া করিয়া কিঞ্চিৎ ভিক্ষাদান করিলে, তাঁহার আহার হইত। এজন্য প্রায়ই তাঁহাকে অনশনে থাকিতে হইত। এরূপে অশেষ ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিয়া তিনি প্রাণপণ প্রযত্নে আমাকে পালন করিতে লাগিলেন।

(১) "মুদমঙ্গলময় সন্তসমাজূ জো জগ জঙ্গম তীরথরাজূ"। (তুলসাদাস)
—আনন্দময়-মঙ্গলময় সাধুসমাজ জগতে জঙ্গম (গতিশীল) তীর্থরাজ।

আমাদের জীর্ণ পর্ণকুটীরের কিয়দ্দূরে বিবিধ দ্রুমরাজি-শোভিত একটী বিবিক্ত প্রদেশে তপঃস্বাধ্যায়নিরত, পুণ্যশীল তাপসগণের আশ্রম ছিল। তাঁহারা আমাদের দুরবস্থা দেখিয়া কৃপা করিয়া আমার জননীকে তাঁহাদের দাসীকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। জননী তাঁহাদের ভুক্তাবশিষ্ট প্রসাদ ভক্তিপূর্ব্বক ভোজন করিতেন, এবং আমাকে ভোজন করাইতেন। জননীর আদেশে আমি শৈশবে, আমার যতটুকু সাধ্য, সেই সদাশয় সাধুগণের সেবা করিতাম। জননীদেবীর উপদেশে আমি বাল্যক্রীড়া, লোভ, চপলতা প্রভৃতি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, ইন্দ্রিয়গণকে সংযত রাখিতে চেষ্টা করিতাম। এজন্য সেই কারুণিক সাধুগণ আমার প্রতি নিরতিশয় স্নেহ প্রদর্শন করিতেন। তাঁহাদের আদেশ লইয়া তাহাদের উচ্ছিষ্টমাত্র ভোজন করিতাম। আমি সর্ব্বক্ষণ ছায়ার ন্যায় তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিতাম, তাঁহাদের মুখচন্দ্রবিনিঃসৃত অমৃতায়মান নানা ধর্ম্মকথা ও ভূরিভূরি পুণ্যশ্লোকগণের অপূর্ব্ব চরিতাবলী তন্ময়চিত্তে শ্রবণ করিতাম। ক্রমে এ সকল পুণ্যকথায় আমার এরূপ অনুরাগ জন্মিল, যে, তাঁহারা যখন সে সকল কথায় ক্ষান্ত হইয়া কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত হইতেন, তখন নিতান্ত দুঃখিত হইতাম, এবং কতক্ষণে পুনরায় সে সকল সুধাময়ী বাণী শুনিব, সে জন্য ঔৎসুক্যে আকুল হইতাম।

এরূপে সে সকল লোকপাবন সাধুগণের সহবাসে শনৈঃ-শনৈঃ আমার চিত্তশুদ্ধি হইল, দিন দিন ঈশ্বরে ও ধর্ম্মে আমার মতি-গতি গাঢ়রূপে নিবদ্ধ হইতে লাগিল।

ভক্তিভরে উৎপুলক হইয়া সেই সাধুগণ যখন অমৃতকণ্ঠে

ভগবান্ ভূতভাবন, জীবগতি, বিশ্বপতির অপার মহিমা কীর্ত্তন করিতেন, আমিও পুলকিত চিত্তে সেই সকল শ্রবণমঙ্গল স্তোত্রের প্রত্যেক পদ তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে কীর্ত্তন করিতাম। এইরূপে সেই অপাপস্পৃষ্ট, সরল-কোমল শৈশবেই অনন্তমঙ্গল জগদীশ্বরের প্রতি শনৈঃ শনৈঃ আমার প্রেমভক্তির উদ্রেক হইল, এবং দিন দিন ক্রমশই তাহা পরিবর্দ্ধিত হইতে লাগিল। তখন সমবয়স্কগণের সহিত বাল্যক্রীড়ায় বীতরাগ হইলাম, শিশুসুলভ তারল্য তিরোহিত হইল। সেই সাধুগণ ভগবৎকথায় বিরত হইলে, সতৃষ্ণহৃদয়ে ভাবিতাম, আবার কতক্ষণে তাঁহাদের বচনসুধা পান করিব।

এইরূপে সাধুসঙ্গপ্রভাবে সর্ব্বশক্তিমান্, অনাদিনিধন, অনন্তপুরুষে আমার প্রেমভক্তির উদ্রেকমাত্র, আমি তদ্দ্বারা প্রপঞ্চাতীত ব্রহ্মস্বরূপ শনৈঃ শনৈঃ আত্মমধ্যে অনুভব করিতে লাগিলাম। সেই সঙ্গে অবিদ্যাকল্পিত মায়ামোহ, অরুণোদয়ে তামসরাশির ন্যায় আমার হৃদাকাশ হইতে অন্তর্হিত হইল।

সেই লোকহিতৈষী সাধুগণ কেবল বর্ষাকালে আশ্রমে বাস করিতেন। বর্ষাবসানে দিঙ্মণ্ডল সুনির্ম্মল হইলে, প্রকৃতি-সুন্দরী যখন বিশুভ্র কাশ-বসন পরিধান করিয়া, কমলকুলের বিকাসছলে অপূর্ব্ব স্মিতসুধামাধুরী বিস্তার পূর্ব্বক, জলকেলিকুতূহলী মরালকুলের কলনাদরূপ অমৃতস্বরে জগৎপতির গুণগানে প্রমত্ত হইত, যখন রথ্যা, বনভূমি, প্রান্তর প্রভৃতি জলকর্দ্দমাদিপরিশূন্য হইয়া জীবগণের সুখসঞ্চার হইত, যখন নিশাকালে নভোমণ্ডলে অগণ্য-জ্যোতিষ্কপুঞ্জের প্রভায় দিঙ্নিরূপণ সুকর হইত, সেই সর্ব্বপ্রাণীর প্রাণারাম মধুর শরৎকালে মদীয় উপজীব্য

জীবমঙ্গলব্রত তাপসগণ আশ্রম ত্যাগ করিয়া, নানা তীর্থাশ্রম-সরিৎ-সাগর-কানন-ভূধরাদি রমণীয় স্থানসকল পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেন। নানালোকালয়ে প্রবেশ করিয়া, আধি-ব্যাধি-দৈন্য-নিপীড়িত লোকগণের হৃদয়ে শান্তিধারা বর্ষণ করিতেন। তাঁহারা যখন যে স্থানে পদার্পণ করিতেন, তাঁহাদের পীযূষ-নিস্যন্দিনী ধর্ম্মকথায় লোকমণ্ডলী দ্রবীভূত হইয়া একটী আনন্দময় পবিত্র প্রবাহে পরিণত হইত। অহো! তাঁহাদের আনন্দময় ভাবে তন্ময় হইয়া, জননী পুত্রশোক, শিশু ক্রন্দন, মুমূর্ষু মৃত্যুভয় ভুলিত। তাঁহাদের আবির্ভাবে তথায় যুগপৎ সর্ব্বতীর্থের আবির্ভাব হইত, সকল দেবতার অধিষ্ঠান হইত, স্বর্গীয় আনন্দের শতশত নির্ঝর উৎসারিত হইত, সত্যযুগের দিব্য পবিমল সঞ্চারিত হইত, শোক হসে ও নৈরাশ্য মহোৎসাহে পরিণত হইত। তাঁহাদের দর্শনমাত্র অক্রুবাণ শিশুও মাতৃবক্ষ ছাড়িয়া, তাঁহাদের বক্ষ আলিঙ্গনেব জন্য লালায়িত হইত। তাঁহাদের আলাপনে ইন্দ্রিয়মদোম্মত্ত উদ্দাম যুবকেরাও যৌবনোন্মাদ পরিহার করিয়া ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত হইত। জরাজীর্ণ, আসন্নমৃত্যু বৃদ্ধও পুলকে প্রফুল্ল হইয়া, মৃত্যুশয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিত। সেই সকল পূতপাপ, দিব্যপ্রভাব, সদানন্দমূর্ত্তি পুণ্যশ্লোকগণের সমাগমে সকল স্থান উৎসবময়, মধুময়, আলোকময় ও পুলকময় বলিয়া জ্ঞান হইত। তাঁহাদের নিকটে ক্ষণকাল অবস্থান করিলে, হিংস্র, শঠ, নিষ্ঠুর পাষণ্ডেরাও আত্মপ্রকৃতি বিস্মৃত হইত। তাঁহারা মধুময় হৃদয়ে বিশ্ব মধুময় দেখিতেন। তাঁহারা আত্মানন্দে বিহ্বল হইয়া, কি গলিতদন্ত বৃদ্ধ, কি অজাতদন্ত বালক, সকলেরি সহিত

অভিন্নভাবে মিশিতেন। তাঁহাদের নির্ব্বিকার হৃদয়ে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল, পুণ্যবান্, পাপী, স্ত্রী, পুরুষ, বালক, বৃদ্ধ, মণি, লোষ্ট, সকলেরি সমাধিকার। সংসারাঙ্গারে দহ্যমান প্রাণিগণের প্রাণে সর্ব্বতাপহরণ ধর্ম্মামৃত সেচন করাই তাঁহাদের জন্মের ও কর্ম্মের চরম উদ্দেশ্য।

সেই সকল বিশ্বজনীনচরিত্র সাধুগণ বর্ষাবসানে আশ্রম ত্যাগ করিয়া, লোকহিতার্থে প্রবাসবাস আশ্রয় করিলে, সে আশ্রমে আমার জননী একাকিনী আমাকে লইয়া বাস করিতেন। তাঁহাদের অনুপস্থিতিকালে, আশ্রয়ার্থী অতিথি-অভ্যাগতদিগের পরিচর্য্যার ভার আমার মাতার উপর অর্পিত হইত। দুঃখিনী জননী পরাধীনা বলিয়া, ইচ্ছানুরূপ মদীয় ভরণপোষণে অক্ষমা ছিলেন। এজন্য সর্ব্বদা মনস্তাপ প্রকাশ করিতেন। আমিও ভাবিতাম,—হায়! এ হতভাগ্যের জন্যই মার আমার এত কষ্ট! মার এ কষ্ট আর দেখিতে পারি না। তখন আমি মনোবেদনায় বিহ্বল হইয়া ভাবিতাম, এ অবস্থায় বরং মার দেহত্যাগ হউক। নতুবা তাঁহার এ কষ্টের অবসান নাই। হয়ত, বাঁচিলে এ অভাগা সন্তানকে লইয়া তাঁহাকে আরো কত কষ্ট পাইতে হইবে, কতই বা বিপদে পড়িতে হইবে। বুঝি বিধাতারও তাহাই ইচ্ছা, কেন না, একদিন সেই পরাধীনজীবিতা দুঃখিনী রাত্রিকালে শয্যাত্যাগ করিয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া গোদোহনার্থে গমন করিলেন। সে সময় আশ্রমে কোনও অতিথি আসায়, তাঁহার জন্য দুগ্ধের একান্ত প্রয়োজন। তখন নৈশ অন্ধকারে ইতস্ততঃ কোনও পদার্থ স্পষ্টরূপে লক্ষিত হইতেছিল না। পথে এক বিষধরের অঙ্গে তাঁহার চরণস্পর্শমাত্র

সে তাঁহার পদে দংশন করিল। অবিলম্বেই তাঁহার মৃত্যু হইল যদিও আমি তাঁহার কষ্ট দেখিয়া তাঁহার মৃত্যু কামনা করিতাম, কিন্তু সে সময় মাতৃশোকে অতিমাত্র কাতর হইয়াছিলাম। তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া, সেই করুণার্দ্রহৃদয় সাধুগণের প্রবোধবাক্যে ক্রমশঃ শোকাবেগ সংবরণ করিলাম। অনন্তর সেই শোকাবহ ঘটনাকে মঙ্গলময়ের কৃপা বলিয়া জ্ঞান হইল। কেন না, তখন আমি দুঃসহ মাতৃচিন্তাভার হইতে মুক্ত হইলাম।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, আমি নির্ব্বিঘ্ন চিত্তে সে স্থান ত্যাগ করিয়া, একাকী উত্তরাভিমুখে প্রস্থান করিলাম। মনের একান্ত বাসনা, কোনও বিবিক্ত প্রদেশে গিয়া একান্তভাবে সেই সর্ব্বশোকের শান্তিদাতা জগৎপাতার পাদপদ্মে আত্মাকে সমাহিত করিয়া, এ ত্রিতাপদগ্ধ আত্মাকে জন্মজরামরণসঙ্কুল-সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত করিব। তখন আকুল প্রাণে ঈশ্বরচরণে এই প্রার্থনা করিতাম,—এ অনন্তদেব! অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার-কারিন্! হে অনন্তশক্তে! নির্ব্বাণদাতঃ!—এ ভবে অবিবেকী মানবের অনিত্য বিষয়ে যেরূপ ঘোর সান্নিপাতিকী তৃষ্ণা জন্মিয়া থাকে, এ দাসাধমের তোমারি চরণে সেই তৃষ্ণা হউক। আমার মন-প্রাণ-আত্মার ও সর্ব্বেন্দ্রিয়ের পরিপূর্ণা পরিতৃপ্তি—একমাত্র তোমারি প্রীতিসাধন। যাহা কিছু তোমার প্রিয়, তাহাতেই আমার মন-প্রাণ দৃঢ়নিবদ্ধ হউক। যেন নাথ! তোমাকে ছাড়িয়া আর কোনও দিকেই আমার মতি না যায়। হে বিভো! সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের মূলাধার তোমাতেই যার ভক্তি অচলা হয়, তাহার ধর্ম্মার্থকামে কি প্রয়োজন? মুক্তি তাহার দাসী। হে বিশ্বব্যাপিন্!

বিশ্বাত্মন্! বিশ্বপতে! হে করুণাময় জগদীশ! যদি কর্ম্ম-বিপাকে আমাকে অতঃপর সহস্র সহস্র অধম যোনিতে পতিত হইতে হয়, তাহাতে আমার খেদ নাই। কিন্তু নাথ! এই করিও,—যখন যে দেহ লাভ করি, যেন তোমাতেই আমার ভক্তি অচলা থাকে।

অহোরাত্র আকুল প্রাণে সেই করুণাময়ের চরণে এইরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে, নানা গ্রাম, নগর, জনপদ, বন, উপবন, গিরি, প্রান্তর, নদ-নদী, তীর্থাশ্রম অতিক্রম করিতে লাগিলাম। ঐ সকলের অনির্ব্বচনীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমার আত্মায় ভগবৎপ্রেম উচ্ছলিত হইতে লাগিল। কোথাও অভ্র-কাঞ্চনাদি-ধাতুচূর্ণে প্রদীপ্ত বিচিত্র গিরিসানু, কোথাও অপূর্ব্বফলপুষ্পশালী, অসংখ্য কলকণ্ঠ বিহঙ্গকুলের কলরবে মুখরিত পাদপসমূহ, কোথাও সাধুহৃদয়ের ন্যায় নির্ম্মল-মধুর সলিলে পূর্ণা, জলকেলিকুতূহলী মরালসারসকুলের কলনাদে সমাকুলা সরসী, কোথাও মরকতশিলা-সদৃশী বিচিত্র-শাদ্বলভূমি, আমার আত্মায় বিভুপ্রেম উচ্ছলিত করিয়া দিত।

আমি একাকী ঐ সকল স্থান অতিক্রম পূর্ব্বক গমন করিতে করিতে, নল-বেণু-শরস্তম্ব-কুশ-কীচকাদি দ্বারা সমাকীর্ণ, উলূক-সর্প-শৃগাল প্রভৃতির ক্রীড়াস্থান, এক নিবিড়, ভীষণ ও দুর্গম অরণ্যে উপস্থিত হইলাম। তখন অতিমাত্র পথশ্রমে ও ক্ষুৎ-পিপাসায় অবসন্ন হইয়া পড়িলাম। জলাশয়ের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে একটী স্বচ্ছসলিলা সরসী দর্শন করিলাম। তখন মহোল্লাসে ভগবৎকৃপা স্মরণ করত, সেই সরসীগর্ভে অব-

গাহন করিলাম। অনন্তর আচমন পূর্ব্বক সন্ধ্যাবন্দনা ও দেবর্ষি-পিতৃলোকের যথাবিধি তর্পণ সমাপন পূর্ব্বক, সেই জল অঞ্জলি দ্বারা আকণ্ঠ পান করিলাম। অহো! সেই সরোবরের অমৃত-মধুর, নীহারশীতল সলিল পান করায় ও কমলামোদসুরভি, সুমন্দ গন্ধবহ সেবন করায়, যেন আমার শতজন্মের ক্ষুৎপিপাসা-শ্রান্তি-ক্লান্তি তিরোহিত হইল।

অনন্তর সেই কমনীয় কাননমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে এক বিশাল অশ্বত্থতরু দর্শন করিলাম। ঐ তরুবর দিগ্‌দিগন্তে বিশাল শাখা-প্রশাখা প্রসারিত করিয়া, অসংখ্য জীবকে ছায়া ও আশ্রয় দান করিতেছে। উহার প্রাণারাম সুস্নিগ্ধ ছায়ায় উপবেশন করিয়া ভাবিলাম,—অহো! এই তরুবর সার্থকজন্মা! এ স্বয়ং নিঃশব্দে অহোরাত্র অজস্র বাতবর্ষাতপাদি অশেষ ক্লেশপরম্পরা সহ্য করিয়া কতকাল ধরিয়া যে কত জীবকে শান্তিদান করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এ নিঃশব্দ ও নিঃস্বার্থ জীবমঙ্গল-সাধনা মানবের অনুকরণীয় (১)। বস্তুতঃ তৎকালে আমার হৃদয়ে অপূর্ব্ব ভগবৎ-প্রেম উচ্ছলিত হওয়ায়, আমি ভাবাবেশে বিবশ ও তন্ময় হইয়া

(১) "গৃহী যত্রাখিলক্লেশান্ লীলয়া সহতে স্বয়ম্।
হরত্যাশ্রিতসন্তাপং তত্রৈব রমতে হরিঃ॥"

—অশেষ ক্লেশের ভার গৃহী যে সদনে—
আপনি করিয়া সহ্য অম্লান বদনে,
প্রাণপণে আশ্রিতের হরে দুঃখভার,
নিত্য তথা বিশ্বপিতা করেন বিহার।

(মৎকৃত "কৃষ্ণভক্তিরসামৃত")

গেলাম। তখন আমার উপদেষ্টা ও উপজীব্য সেই সকল ভগবৎ-প্রাণ, আশ্রমবাসী সাধুগণের অমৃতময়ী উপদেশবাণী স্মরণ করত, সেই সর্ব্বভূতহৃদয়শায়ী পরমাত্মাকে হৃদয়মধ্যে একান্তভাবে ধ্যান করিতে লাগিলাম। তন্মনা ও তদ্গতাত্মা হইয়া বহুক্ষণ ধ্যান করিতে করিতে ভাবাবেশে আমার লোচনযুগল অশ্রুসলিলে পরিপ্লুত হইল। এ ভাবে কতক্ষণ ছিলাম, স্মরণ নাই।

অনন্তর শনৈঃ শনৈঃ হৃদয়কন্দরে এক অচিন্ত্যবৈভব--অনির্ব্বচনীয় জ্যোতির উদয় হইল! হে মহর্ষে! তখন আমি প্রেমভরে ও পরমানন্দে বাহ্যজ্ঞানপরিশূন্য। আমার আপাদ-মস্তক সর্ব্বশরীর কদম্বকোরকের ন্যায় কণ্টকিত হইল! অকস্মাৎ বায়ুসাগর ভেদ করিয়া এক অপূর্ব্ব দৈববাণী আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। চমকিত ও উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলাম। অহহ! সে হৃদয়োন্মাদিনী, অমৃতনির্ঝরিণী বাণী—সে দিব্য-বীণানুকারিণী স্বরলহরী অদ্যাপি আমার হৃৎকন্দরে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

শূন্য হইতে কোনও অদৃশ্য পুরুষ বলিতে লাগিলেন ;—

"অয়ি বৎস! একবার প্রেমময় হৃদয়ে জ্ঞান-নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখ! এ বিশ্বমণ্ডল বিশ্বনাথের অপরিচ্ছিন্ন মঙ্গলের মহা-সিন্ধু। মহাপ্রেমের তরঙ্গমালা উত্থিত হইয়া দিগ্দিগন্ত প্লাবিত করিতেছে। ভক্তিরূপা মহানদীর স্রোত দিয়া এ সমুদ্রে পতিত হইতে হয়। যে এ মহার্ণবে পতিত হয়, সে স্বয়ং পতিতপাবন হইয়া অগণিত পতিত পাতকীকে উদ্ধার করে।

অয়ি পুত্র! এ মানবজীবন একটী মহাযজ্ঞ। সুসংস্কৃত

আত্মা এ যজ্ঞের আহুতি। বিশ্বপ্রেমরূপী মেধ্য হোমানলকে সাধনাসমীরণে সন্ধুক্ষিত করিয়া, যজ্ঞ-পশু ইন্দ্রিয়গ্রামকে বলিদান পূর্ব্বক, যজ্ঞেশ্বর বিশ্বনাথের উদ্দেশে তাঁহারি প্রীতিকামনায়, আত্মাকে পূর্ণাহুতি দিতে হয় (১)। তাঁহাকে যাহা কিছু অর্পণ করিবে, তাহাই অক্ষয় জানিও, শেষে তাহা মহানির্ব্বাণে পরিণত হইবে। তত্ত্বদর্শী মহর্ষিরা এই যজ্ঞ দ্বারাই পরম পদ লাভ করিয়া থাকেন।

হে বৎস! তুমি সরল ও নির্ম্মল হৃদয়ে সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত, সত্যে ও ঈশ্বরে তোমার অহেতুকী ভক্তি, এজন্য তুমি সিদ্ধকাম হইবে। এই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেই তুমি সত্যজ্যোতিঃ দর্শন করিয়া পূর্ণকাম হইবে। সেই পূর্ণানন্দরূপী পরমাত্মা এই অখণ্ডমণ্ডলাকার বিরাট্ বিশ্বকে ব্যাপিয়া অবস্থিত। প্রেমিক-ভক্ত-সাধুরাই আত্মমধ্যে তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া, শোকসাগর উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন। মানবজীবন মরীচিকা বা প্রহেলিকা নহে, বিষম সমস্যাও নহে। ইহা স্বপ্নকল্পিতও নহে। ইহা অখণ্ড, শিবময়, সুন্দর, সরল, সত্যবস্তু। সৎসঙ্গ—গুরুভক্তি—পুণ্যশীলতা মানবের চরমোন্নতির সোপান।

বৎস! স্ত্রীত্ব, পুংস্ত্ব, জাতি, বর্ণ, নাম, আশ্রম, এ সকলের সহিত ভগবৎসাধনার সম্বন্ধ নাই। ইহারা ভগবৎসাধনার কারণ

(১) "যস্য বিশ্বহিতং যজ্ঞো হব্যমাত্মা সুসংস্কৃতঃ।
ইন্দ্রিয়াখ্যাশ্চ পশবো বলয়ঃ স হি যাজ্ঞিকঃ॥"
—বিশ্বহিত যাঁহার যজ্ঞ, পরিপূত আত্মা যাঁহার হবনীয় পুরোডাশ, ইন্দ্রিয়রূপী পশুগণ বলিসাধন, তিনিই প্রকৃত যাজ্ঞিক।

নহে। একমাত্র সুবিমলা প্রেমভক্তিই কারণ। ভক্তিবিমুখ হইয়া লোক কোটি কোটি যজ্ঞ, দান, তপস্যা করিলেও ঈশ্বরের কৃপা লাভ করে না। সেই সর্ব্বার্থসাধিকা ভক্তি সাধনালভ্যা। সে সাধনামার্গে উঠিবার জন্য সুন্দর সোপানপরম্পরা সজ্জিত রহিয়াছে।

সাধুসঙ্গ প্রথম সোপান। চরমোন্নতির মূলাধার এই প্রথম সোপানে উঠিলে, অন্যান্য সোপানগুলি ক্রমশঃ সুখারোহ হয়। যদীয় দর্শনে, স্পর্শনে, আলাপনে, সহবাসে হৃদয়ে ঈশ্বরভক্তির ও পুণ্যশীলতার উদ্রেক হয়, কুমতিকলাপ দূরে যায়, তিনিই প্রকৃত সাধু, তিনিই গুরুপদবাচ্য। সেই আচার্য্যদেবকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরজ্ঞানে অকৈতব চিত্তে সেবা করিতে হয়। দ্বিতীয় সোপান—পরোপকার বা পুণ্যশীলতা। বহিরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় উভয়কে সংযত রাখিয়া পরিপূত হৃদয়ে পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠেয়। এই অমূল্য ও অতুল্য সোপান পুণ্যশীলতা দ্বারাই ভগবৎপূজায় নিষ্ঠারূপ পরবর্ত্তী তৃতীয় সোপানে আরোহণ করা যায়। তখন অন্তরাত্মায় অপূর্ব্ব প্রসাদ অনুভূত হয়; যাঁহারা ভগবদ্ভক্ত, তাঁহাদের প্রতি হৃদয়ের অনির্ব্বচনীয় প্রীতি উদ্ভূত হয়। ক্রমে সর্ব্বত্র সর্ব্বভূতেই ঈশ্বর-বুদ্ধি জন্মে। তখন কাহাকেও কোনও বস্তু দান করিয়া মনে হয়, ঈশ্বরই দাতা—ঈশ্বরই গৃহীতা—ঈশ্বরেরি বস্তু। সে সাধকের তখন ব্রহ্মাণ্ডই নিজ গৃহ, বিশ্ববাসী নিখিল জীবমণ্ডল নিজ পরিবার। তখন সকলি ব্রহ্মময় একার্ণবে একাকার। এ সোপানে আরোহণ করিলে, সাধকের বাহ্য পদার্থে বৈরাগ্য জন্মে ক্রমে তাঁহার হৃদয়-কন্দরে অশোকা,

জ্যোতির্ম্ময়ী, শান্তিময়ী অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। হে বৎস! এ জগতে স্ত্রী হউক, পুরুষ হউক, বিপ্র হউক, চণ্ডাল হউক, বালক, যুবক বা স্থবির হউক, মানব, দানব বা পশু হউক, যে সময়ে—যে অবস্থায়—যে মুহূর্ত্তে যাহার আত্মায় এ তত্ত্ব স্ফুরিত হইবে, তখনি সে প্রেমলক্ষণ ভক্তিধনের অধিকারী হইবে, এবং সেইক্ষণেই সে জ্বালাময় ত্রিতাপ হইতে মুক্ত হইয়া সচ্চিদানন্দরূপ অনপায়ী অমৃত-পদ লাভ করিবে। অহহ! দেখ বৎস! ঈশ্বরের কত দয়া! যে যতই মহাপাপী, পতিতাধম, ঘৃণ্যতম হউক, কেহই তাঁহার পরিত্যাজ্য নহে। সকলের জন্যই তিনি অনন্ত মঙ্গলের দ্বার উন্মুক্ত রাখিয়াছেন।”

নারদ ব্যাসদেবের নিকট এরূপে সংক্ষেপে আত্মবিবরণ বর্ণনা করিয়া কহিলেন,—“হে ব্যাস! আমি ভগবৎকৃপায় সেই প্রত্যাদেশ লাভ করিয়া অখণ্ডিত ব্রহ্মচর্য্য ধারণ পূর্ব্বক, ভগবৎপ্রেমে বিহ্বল হইয়া, অহর্নিশ জীবকল্যাণসাধনার্থে সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকি। ভগবৎপ্রসাদে ত্রিলোকীর সর্ব্বত্রই জলে-স্থলে-রসাতলে-অন্তরীক্ষে আমার গতি অপ্রতিহতা। বিভুর কৃপায়, দেব-দানব-মানব-রাক্ষস-ভূত-প্রেত-পিশাচ-শ্বাপদ-সরীসৃপ, কেহই আমার শত্রু নহে। আমি সমভাবে সকলেরি প্রেমাস্পদ। সর্ব্বপ্রাণীকে অভয়দান, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনাদান, রোগার্ত্তের রোগশমন, পাপিগণকে পুণ্য-পথে আনয়ন, উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত, দ্রোহবুদ্ধি, উৎপথপ্রতিপন্ন ব্যক্তি-গণকে প্রেমভরে ক্রোড়ে লইয়া তাহাদের মতিগতিকে সনাতন ন্যায়মার্গে প্রবর্ত্তন, আব্রহ্ম-চণ্ডাল সকলকেই সমপ্রেমে দর্শন ও সকলেরি ঐহিক-পারত্রিক, আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক শ্রেয়ঃ-

সাধন, ইহাই জীবনের অদ্বৈত মহাব্রত ও সর্ব্বধর্ম্মের সার বলিয়া জ্ঞান করিয়াছি। মদীয় মহাসাধনার পুরস্কাররূপে ভগবৎ-প্রসাদীকৃতা এই 'অমৃতা'-নাম্নী ব্রহ্মবীণা লাভ করিয়াছি। এ বিপঞ্চীর ঝঙ্কার-মিলিত মদীয় প্রেমসঙ্গীতে দারু-শৈল দ্রব হয়, বজ্রও বিদীর্ণ হয়, ব্রহ্মাণ্ড স্তব্ধ হইয়া যায়।" এই কথা বলিয়া, দেবর্ষি সেই বীণাঝঙ্কারের সহ প্রেমসঙ্গীত মিলিত করিয়া বিশ্ব-বাসীকে চমকিত করত অসীম শূন্যপথে অদৃশ্য হইলেন।

ভীষ্মের শরশয্যা ও ভীষ্মতর্পণ।

ভগবান্ ভীষ্মদেব নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। যিনি উপনয়ন হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত অস্খলিতভাবে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করেন, তাঁহাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী বলা যায়। ভীষ্ম পরমগুরু পিতৃদেবের মনোব্যথা নিরাকরণমানসে বিমাতা সত্যবতীর নিকট প্রতিজ্ঞা করেন,--"আমি বিবাহ না করিয়া, আমরণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব।" কথায় বলে,—"ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা"। সেই ভীষ্ম অর্থাৎ ভয়ানক প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াই তিনি জগতে 'ভীষ্ম' নামে খ্যাত। কিন্তু আর্য্য মহর্ষিগণের ধর্ম্মশাস্ত্রে আত্মার পারত্রিক তৃপ্তিসাধনার্থে দারপরিগ্রহ ও অপত্যোৎপাদন একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট। পুত্রকৃত শ্রাদ্ধতর্পণাদি দ্বারা পিতৃলোকের প্রেতাত্মার অক্ষয়া তৃপ্তি সাধিত হয়। ভীষ্ম অকৃতদার, সুতরাং অপুত্রক। তাঁহার প্রেতাত্মাকে সে

তৃপ্তিদান কে করিবে? "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ"—পুত্রার্থে দারপরিগ্রহ কর্ত্তব্য, পরেত পিতৃলোকের জলপিণ্ডদানই পুত্রজন্মের মুখ্য উদ্দেশ্য। মানিলাম,- ভীষ্মের পুত্র হইলে, তাঁহার শ্রাদ্ধতর্পণাদির উপায় হইত। কিন্তু পুত্র যেমন সুসন্তান হইতে পারে, তেমনি কুসন্তানও হইতে পারে। কুসন্তান দ্বারা পিতৃলোকের সন্তর্পণ হওয়া দূরে থাক, বরং তাঁহার বংশ, নাম ও যশ কলঙ্কিত হয়। বিশেষতঃ এ নশ্বর জগতে কোনও বংশই অনপায়ী নহে। পার্থিব বিষয়মাত্রই নশ্বর। কেবল পুণ্যব্রতের পুণ্যকীর্ত্তি অনপায়িনী। এ ধরায় কোটি কোটি রাজর্ষি, মহর্ষি প্রভৃতির বংশ ধ্বংস পাইয়াছে, তাঁহাদের বিয়োগসাক্ষিণী ধরণী, অনিত্যতার সাক্ষিণী রূপে অদ্যাপি বিদ্যমানা (১)। কোনও ভাগ্যবানের বংশ চির-স্থায়ী হইলেও, তদীয় বংশধরেরা যে চিরকাল ধর্ম্মপ্রাণ থাকিবে এবং শ্রাদ্ধাদি দ্বারা তাঁহার প্রীতিসাধন করিবে, তাহার প্রমাণ কি? অতএব নিজ বংশপরম্পরা দ্বারা কাহারও অনন্তকালব্যাপী পারলৌকিক তর্পণের আশা করা যায় না। কিন্তু ভক্তের বোঝা স্বয়ং ভগবান্ বহন করেন। তাই দয়াময় জগৎপিতা,—সেই

(১) "ক গতাঃ পৃথিবীপালাঃ সসৈন্যবলবাহনাঃ।
বিয়োগসাক্ষিণী যেষাং ভূমিরদ্যাপি তিষ্ঠতি॥"
—কোথা গেল সে সকল মহীপালগণ!
কোথা সে বিপুল সৈন্য? কোথা সে বাহন?
যথায় আছিল তারা, সে সকল স্থান—
অদ্যাপি ধ্বংসের সাক্ষ্য করিছে প্রদান।

ঈশ্বরপ্রাণ, ভক্ততম সন্তান, অপুত্রক ভীষ্মদেবের তর্পণের ভার অনন্তকালের জন্য তদীয় ভক্তসম্প্রদায়-হস্তে বিন্যস্ত করিয়াছেন। অদ্যাপি কোটি কোটি আর্য্যসন্তান, যুগপৎ পূত গঙ্গাজলে ও ভক্তিবিগলিত নয়নসলিলে অভিষিক্ত হইয়া ভীষ্মার্ঘ্যদান ও ভীষ্মতর্পণ করিয়া থাকেন, যথা ;—

"বসূনামবতারায় শান্তনোরাত্মজায় চ।
অর্ঘ্যং দদামি ভীষ্মায় আজন্মব্রহ্মচারিণে॥"

বসুগণের অবতার, শান্তনুতনয়, আজন্মব্রহ্মচারী ভীষ্মকে তর্পণাদি পূজোপহার প্রদান করিতেছি।

ধর্ম্মশাস্ত্রে "ভীষ্মপঞ্চক" নামে মহাব্রতের উল্লেখ ও অনুষ্ঠান-বিধি বিবৃত আছে। সেই পবিত্র ব্রতবাসরে ভারতীয় আর্য্য-নরনারীগণ, পূতজলে স্নাত ও অনুলিপ্ত হইয়া, অতীব সংযম সহকারে এ মহাব্রত পালন করেন। ব্রতান্তে অনাথ দীনদরিদ্র-গণকে অকাতরে অন্ন-জল-বস্ত্রাদি বিতরণ করেন। কার্ত্তিক মাসের একাদশী তিথির প্রারম্ভ হইতে এই ব্রত আরব্ধ হয়, এবং পূর্ণচন্দ্রা পঞ্চদশীতে ইহার উদ্‌যাপন হয়। কথিত আছে, ভীষ্ম-তৃপ্তিকামনায় এ ব্রতের অনুষ্ঠান করিয়া নরনারীরা সর্ব্বপাপতাপ হইতে বিমুক্ত হন। এ ফলশ্রুতিতে কেহ শ্রদ্ধা করুন, বা নাই করুন, কিন্তু পুণ্যশ্লোক নরদেবতাগণের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি যে, মানবাত্মাকে ধূতপাপ করিয়া মহোৎকর্ষে উন্নীত করে, এ বিষয়ে সন্দেহ কি ?

ঘোরতর নিষ্ঠুর-নির্ম্মম, বজ্রাধিক কঠোরচিত্ত নররূপী পিশাচ-গণের পাপে সংঘটিত লোমহর্ষণ ঘটনাসকল দেখিয়া, শুনিয়া,

বা ইতিহাসে পড়িয়া অনেকে উদ্‌ভ্রান্তচিত্ত হইয়া ভগবানে দোষারোপ করেন। কিন্তু, যিনি সর্ব্বসাক্ষী ও সর্ব্বেশ্বর, চরাচর সমস্ত পদার্থে, মানব হইতে কীটাণু পর্য্যন্ত সমস্ত জীবে যাঁহার জ্বলন্ত দৃষ্টি আতত, যাঁহার ইচ্ছা বিনা একটী ক্ষোদীয়ান্ পরমাণুরও কার্য্য হয় না, সেই ন্যায়কারী, দয়ানিধি বিশ্ববিধির বিরাট্ বিশ্ব-সাম্রাজ্যে যখন যাহা কিছু ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে বা ঘটিবে, সকলি মঙ্গল। ভৌতিক জড়চক্ষু নিমীলনপূর্ব্বক প্রজ্ঞারূপ দিব্য নেত্রে অতীত ও বর্ত্তমান ঘটনাপরম্পরা পর্য্যালোচনা করিলে বুঝা যায় যে,—

"আশঙ্কসে যদগ্নিং
তদিদং স্পর্শক্ষমং রত্নম্"

—একদা যাহাকে অগ্নি ভাবিয়া ভীত হইয়াছিলে, তাহাই এখন সুখস্পর্শ-প্রাণারাম মণি। যাহাকে কালসর্প ভাবিয়া শিহরিয়াছিলে, তাহাই আজি হৃদয়ভূষণ মুক্তাহার।

অহো! গাণ্ডীবীর জ্বলদনলোদগারী ভীষণ নারাচজালে ছিন্ন-ভিন্ন, খণ্ডবিখণ্ডীকৃত, রক্তাক্ত মাংসরাশিবৎ দুর্নিরীক্ষ্য সে বিশাল ভীষ্মদেহ—সে শরশয্যাশয়ান মহাবীরের বর কলেবর যখন বিশ্ব-পাবন বিরাট্ "শান্তিধর্ম্মের" আধারে পরিণত হইল, যখন তাহা বিশ্ববাসীর শ্রেষ্ঠ সাধনার উপাদানসম্ভার শনৈঃ শনৈঃ উদ্ঘাটিত করিল, তখন তাহাই ঈশ্বরের উন্মুক্ত দানভাণ্ডার বলিয়া প্রতীয়-মান হইল। সে অক্ষয় রত্নভাণ্ডার হইতে অমূল্য জ্ঞানরত্ন লাভ করিয়া, কত শত বিজ্ঞানভিক্ষু নিজ নিজ হৃদয়মঞ্জুষা পূর্ণ করিয়াছেন, কত শত শান্তিপিপাসু নিজ নিজ শোকতাপদগ্ধ

প্রাণকে শীতল করিয়াছেন, কত শত মুমূর্ষু বা মৃত প্রাণী অমৃতময় নবজীবন লাভ করিয়াছেন, কত শত প৺ ৮ মানব পুনরুত্থান লাভ করিয়াছেন, কত শত অজ্ঞানান্ধ মহাপ্রাণী দিব্যনেত্র লাভ করিয়াছেন, কত শত মানববংশ ধন্য হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে, তাহার ইয়ত্তা কে করিতে পারে?

ভীষ্মমহিমার জয়বৈজয়ন্তী—মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্ব। ইহা ভগবান্ ভীষ্মদেবের বিরাট্ জ্ঞানগরিমার অপূর্ব্ব প্রদর্শনী। এই শান্তিপর্ব্ব তিন ভাগে বিভক্ত, যথা;—রাজধর্ম্ম, আপদ্ধর্ম্ম, মোক্ষধর্ম্ম। ১ম—রাজধর্ম্ম মানবের বিশাল পৌরুষক্ষেত্র। মনুষ্যই জীবজগতের প্রধান, কেননা, ধর্ম্মে অর্থাৎ জ্ঞান-কর্ম্ম-প্রেম-ভক্তিময়ী মহাসাধনায় মানবের অধিকার। ধর্ম্মজ্ঞানবিহীন মানব পশু-তুল্য (১)। সাধনা দ্বারাই মানব দেবত্বে বা অমরত্বে উন্নীত হয়। অপরীক্ষিত পৌরুষে বিশ্বাস কি? এজন্য আপদ্ধর্ম্ম সে পৌরুষের কঠোর পরীক্ষাস্থল। নিজ বীর্য্যবলে এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে

---

(১) "আহারনিদ্রাভয়মৈথুনানি
সমানি চৈতানি নৃণাং পশূনাম্।
ধর্ম্মোহি তেষামধিকো বিশেষো
ধর্ম্মেণ হীনাঃ পশুভিঃ সমানাঃ॥"
—এ জগতে নিদ্রা, ভয়, ভোজন, মৈথুন,
পশু আর নরে ইহা সাধারণ গুণ;
ধর্ম্মেই মনুষ্য হয় পশু হ'তে ভিন্ন,
ধর্ম্মপরিহীন নর পশুমধ্যে গণ্য।
(মৎপ্রকাশিত হিতোপদেশ।)

পারিলে, তবে তাহার মোক্ষধর্ম্মে অধিকার হয়। ঈশ্বরবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত ও ব্রহ্মার্পিত নিষ্কাম কর্ম্মই মোক্ষের নিদান (১)। ক্রম-সাধনাবলে মানব রাজধর্ম্মে ও আপদ্ধর্ম্মে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়া, শেষে মোক্ষধর্ম্মাধিকারে উপনীত হয়। এই মোক্ষধর্ম্মই শান্তি-পর্ব্বের নিষ্ঠা বা পরিসমাপ্তি।

শরশয্যায় বিততকায়, আপাদমস্তক ছিন্ন-ভিন্ন-বিদীর্ণ, ঘনীভূত রুধিরপঙ্কে প্রলিপ্ত, যে ক্ষমামূর্ত্তি বিশ্ব-প্রেমিকের শান্তিসুধাসমু-চ্ছলিত আননচন্দ্র হইতে ক্ষমার ও করুণার অশ্রুতপূর্ব্ব গাথা উত্থিত হইয়া সমস্ত জীবলোককে স্তম্ভিত করিয়াছে, এস! এস!

(১) ব্রহ্মার্পণের স্বরূপলক্ষণ যথা;—

"ব্রহ্মণা দীয়তে দেয়ং ব্রহ্মণে চ প্রদীয়তে।
ব্রহ্মৈব দেয়মিত্যাহুর্ব্রহ্মার্পণমনুত্তমম্॥"
"প্রীণাতু ভগবানীশঃ কর্ম্মণানেন শাশ্বতঃ।
করোতি সততং বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণমিদং পরম্॥
যদ্বা ফলানাং সংন্যাসং প্রকুর্য্যাৎ পরমেশ্বরে।
কর্ম্মণামেতদপ্যাহুর্ব্রহ্মার্পণমনুত্তমম্॥"

—অর্থাৎ যাহা কিছু দিবার, তাহা আমাকে ব্রহ্মই দিতেছেন, আমিও ব্রহ্মকেই প্রদান করিতেছি, আমি যাহা কিছু দিতেছি, সে সকলই ব্রহ্মে। এইরূপ জ্ঞানকে 'ব্রহ্মার্পণ' বলে। আমি কিছুই করি না, সকলই ব্রহ্ম করিতেছেন, এইরূপ জ্ঞানকে তত্ত্বদর্শী ঋষিরা 'ব্রহ্মার্পণ' বলিয়া থাকেন। এই কর্ম্ম দ্বারা সেই শাশ্বত অনন্তদেব প্রীত হউন,—সদাই এইরূপ বুদ্ধিতে কর্ম্ম করাকে 'ব্রহ্মার্পণ' বলে। সমস্ত কর্ম্মফল ব্রহ্মেই সমর্পণ করিলাম,—ইহাকে সর্ব্বোত্তম 'ব্রহ্মার্পণ' বলা যায়।

(ইতি কূর্ম্মপুরাণে ৪র্থ অধ্যায়ে।)

আমার প্রাণাধিক ছাত্রগণ! আমরা ভক্তিকণ্টকিত গাত্রে ও কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে সেই পতিতপাবন ভীষ্মদেবকে কোটি কোটি প্রণাম করি। যেন আমরা প্রতিদিন প্রাতে উঠিয়া ঐ পুণ্য-শ্লোকের কথা স্মরণ করত, প্রেমানন্দে ও মহোৎসাহে কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হই।

দূরীকরোতি দুরিতং বিমলীকরোতি
চেতশ্চিরন্তনমঘশ্চুলুকীকরোতি।
ভক্তিং বিভৌ গুরুষু রাজ্ঞি দৃঢ়ীকরোতি
পুণ্যাত্মনাং সুচরিতামৃতভূরিপানম্॥

—চিরচিত পাপতাপ হয় নিবারিত,
হৃদয়ে নির্ম্মলা শান্তি হয় উপচিত,
বিশ্বেশ্বরে, রাজ্যেশ্বরে, সর্ব্বগুরুজনে
ভক্তি, প্রীতি, কৃতজ্ঞতা দৃঢ় হয় মনে;
সাধুর চরিতামৃত পিয়া ভক্তিভবে,
অনন্ত মঙ্গল লাভ করে সর্ব্ব নরে।

সম্পূর্ণ